অমিয়ভূষণ মজুমদার

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ
পৌষ ১৩৬১, জানুআরি ১৯৫৫

দাম : পাঁচ টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

এই বইখানির রচনাকাল ১৯৫৩-র অগস্ট-অক্টোবর। ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার চারটি সংখ্যায় 'নয়নতারা' নামে পর্বে-পর্বে প্রকাশিত উপন্যাস থেকে এটি অভিন্ন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে 'নীল ভুঁইয়া' নাম দেওয়ায় কোনো মৌল পরিবর্তন সূচিত হয় নি।

'নীল ভুঁইয়া' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কারণ এর সবগুলি চরিত্রই কাল্পনিক। আবার, এটি ঐতিহাসিকও, যেহেতু তৎকালীন নীলাক্ত সমাজকে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।

গ্রন্থকার

আমার সব গল্পের দিদিমা কালোদি-কে

উৎসর্গ ক'রে ধন্য হলাম।

আঠারো শ' পঞ্চান্ন খ্রীস্টাব্দ। শীতকাল। শীতটা খ্রীস্ট বৎসরের আদি এবং অন্তে থাকে। ইতিহাস লেখার চেষ্টা ক'রে যে-সব অনুসন্ধান করা গেছে তাতে নির্দিষ্ট ভাবে স্থির করা যায় নি মাসটা কি ছিলো। আঠারো শ' পঞ্চান্ন বটে, জানুআরি কিংবা ডিসেম্বর তা স্থির করা যায় নি। অর্থাৎ রাজচন্দ্রর বয়স তখন সতেরো কিংবা আঠারো বলা সম্ভব হবে না।

সকালে উঠেই সে শিকার করতে গিয়েছিলো নতুন-কেনা হাতিটার পিঠে চেপে। খবরটা এনেছিলো বুজরুক। বুজরুক ঘোড়ায় চেপে এসেছিলো, মস্ত বড়ো তাজিয়া ঘোড়া। তার মাথায় কুল্লাযুক্ত পাগড়ি, আচকান সেরোয়ানির উপরে ওয়েস্টকোট, কোমরে তলোয়ার, পিঠে বন্দুক। চোখে সুর্মা ছিলো, গোঁফের কোণ দুটিতে মোম।

রাজচন্দ্রর উপনয়ন হয়েছে কিছুদিন আগে। মাথার চুলগুলো তখনও ছোটো-ছোটো। আদুড় গায়ে খড়ম পায়ে সে তখন ঠাকুরবাড়ি থেকে আহ্নিক শেষ ক'রে ফিরছে। পায়ের খড়ম হাতির দাঁতের, নরসুন্দর ভৃত্য চলেছে কোশাকুশি নিয়ে—সে-দুটি সোনার। নরসুন্দরের গায়ে পশমের লোকড়। শীতে রাজুর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দে রাজু দাঁড়িয়েছিলো। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকে সদরটা চোখে পড়ে। দেখতে পেলো, ঘোড়া থেকে বুজরুক লাফিয়ে নামলো, লাগামটা অবহেলা ভরে ছুঁড়ে দিলো দরজার-পাশে-দাঁড়ানো একজন পথচারীর হাতে। রাজু এক দৌড়ে, তার পায়ের খড়ম খুলে প'ড়ে গেল, বুজরুকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

বুজরুক পাথরের মতো অবিচল। খাপ থেকে তরোয়াল রীতিমাফিক বার ক'রে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলো, 'জনাব, জাঁ পিয়েত্রোর সেলাম হুজুর বরাবর পঁহুছে। পরে সমাচার, শিকার খেলবার শওখ পিয়েত্রোর।

বিলের উত্তরতীরের খাস-জঙ্গলে শের ; পিয়েত্রোর আরজ হাওদানশিন হুজুর ফৌরন খাস-জঙ্গলের পথে পিয়েত্রোর গরিবখানায় পঁহুছেন।'

'বলো কি, বুজরুকসাহেব, শিকার ব'লে বাঘ শিকার! আমার কি বন্দুক আছে, না আমি বন্দুক চালাতে জানি? তার চাইতে তোমার ঘোড়াটা দাও, আমি একটু ছুটিয়ে আসি।'

রাজচন্দ্র বুজরুকের পাশ দিয়ে ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। বুজরুক বাহু বিস্তৃত ক'রে পথ আটকালো।

রাজচন্দ্র একটু দাঁড়িয়ে বুজরুকের প্রসারিত বাহুর বাইরে দিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজতে-খুঁজতে বললো, 'খাঁ-সাহেব, শিকার আমার দ্বারা হবে না। বাঘ আমি জীবনেও দেখিনি। বন্দুক তুলতেই জানি না।'

বুজরুক খান্ বললে, 'তিনটে বন্দুক কাল কলকোত্তা থেকে এসেছে পিয়েত্রোসাহেবের। তার মধ্যে যেটা সব চাইতে চকচকে সেটা আপনার জন্য তোলা আছে। আপনি গেলেই সেটা আপনার হাতে আসবে।'

খবরটা পেয়ে রাজচন্দ্র স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'নতুন বন্দুক?'

'হাঁ।'

'কাল এসেছে কলকাতা থেকে?'

'জী।'

কথা বলার সময়ে দু-জনের চোখই আয়ত ও আকুঞ্চিত হ'য়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আদানপ্রদান করলো।

'তা হ'লে আমার বোধ হয় যাওয়াই উচিত, না খাঁ-সাহেব? হাওদা-নশিন হ'য়ে যেতে হবে? তুমি একটু দাঁড়াও ভাই, আমি পোশাক প'রে আসি।'

অন্দরের দিকে খানিকটা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে রাজচন্দ্র বললো, 'রূপচাদ, খাঁ-সাহেবকে বসতে দাও গে। আর পিলখানায় একটু ব'লে দাও হাওদা বেঁধে রামপিয়ারিকে ঠিক রাখে।'

রূপচাঁদ কোশাকুশি নিয়ে, খড়ম জোড়া কুড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলো; মনিবের হুকুম তামিল করার চেষ্টায় খাঁ-সাহেবকে কাছারিতে যাবার আমন্ত্রণ করলো; কিন্তু ব্যাপারটা যে তার আদৌ পছন্দ মতো হ'লো না তা তার চলার ভঙ্গিতে প্রকাশ পেলো, বলার ভঙ্গিতেও। রূপচাঁদ বললে, 'খাঁ-সাহেব, আপনি কাছারির দিকে যান, আমি রানিমার কাছে যাই। তাঁকে না জানিয়ে তো পিলখানায় খবর দেওয়া যাবে না।'

বুজরুক বললে, 'কিন্তু কোনো গোলমাল ক'রো না রূপচাঁদ, গোলমেলে কথা ব'লো না।'

রূপচাঁদ লোকটির সহজ হবার কথা নয়, সহজ নয়ও সে। কিছুক্ষণ পরেই একজন দাসী এসে বুজরুক খানকে ডেকে বললো, 'রানিমা ডাকছেন।'

দাসীর পেছনে বুজরুক অন্দরের দরজা পার হ'য়েই প্রথম ঘরখানায় গিয়ে পৌছলো। ঘরের মেঝেতে কার্পেট, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আসন, বাঁ-দিকের দেয়ালটার কাছে খুব শৌখিন কাজ করা আবলুস কাঠের মস্ত একখানা চেয়ার। চেয়ারের পাশে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা প্রকাণ্ড পর্দা। পর্দার গায়ে দু-তিনটি শিকার-ক্ষিপ্ত হাতির ও অনেক লোকজনের ছবি। পর্দাটা হাওয়ায় মৃদু-মৃদু দুলছে।

আসন নিয়ে বুজরুক ভাবলো, এইবার বোধ হয় রানিমা আসবেন এবং ওই বড়ো আসনটায় বসবেন। কিন্তু রানিমা এলেন না। পর্দাটা মৃদুমন্দ দুলছিলো, তার পেছন থেকে পরিষ্কার, একটু-বা ভারী কিন্তু মৃদু গলায় কে-একজন কথা বললো। বুজরুক বুঝলো, এই রানিমা।

রানিমা বললেন, 'রাজু কি তোমাদের সঙ্গে শিকারে যেতে রাজী হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, তিনি আপত্তি করেন নি, আপনার অমত যদি না থাকে তবেই যাই।'

'আমার আপত্তি নেই। ওকে একটু চোখে-চোখে রাখতে হবে।'

'তা রাখবো।'

'পিয়েত্রোর শখ যখন, তখন সেও নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকবে শেষ পর্যন্ত ?'

'তা থাকবেন।'

'রাজুর পোশাক কি রকম হবে ?'

'যে-কোনো পোশাকেই ওঁকে চমৎকার মানায়, রানিমা।'

'তা মানায়। কিন্তু ওর গত জন্মদিনে পিয়েত্রো যে ইংরেজি পোশাক দিয়েছিলো সেটা প'রে গেলেই আমি খুশি হই।'

'তা হ'লে তাই হবে।'

কিছুক্ষণ পরে রাজু এল, তার পেছনে ছোটোখাটো পোর্টম্যাণ্টো নিয়ে রূপচাঁদ। রূপচাঁদ মাথায় ক'রে আনে নি, তার তদারকে অন্য লোক এনেছে। পোর্টম্যাণ্টোর চাবি খুলে দিয়ে রূপচাঁদ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বুজরুক কৌপীনবস্ত রাজুকে আণ্ডারউয়্যার থেকে শুরু ক'রে টাই পর্যন্ত পরিয়ে দিলো নিজের হাতে। প্রথম দিকটায় লজ্জিত রাজু দু-হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকেছিলো, পরে অবশ্য এদিক-ওদিক চাইতেই দেখতে পেলো, রূপচাঁদ হাতে একখানা বড়ো আয়না ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে।

ততক্ষণে নতুন হাওদা-আঁটা রামপিয়ারি এসে গেছে, জানলা দিয়ে চোখে পড়লো। রামপিয়ারির নব যৌবন, সারা গায়ে চা-খড়ি ও

সিঁদুরের পত্রলেখা। হাওদায় রুপোর আর জরির কাজ। হাওদার ছাতা থেকে মুক্তার অনুকরণে বড়ো-বড়ো রঙিন পুঁথির ঝালর দুলছে।

বুজরুকের সামনের পর্দাটা আবার দুলে উঠলো। ওদিক থেকে রানিমা নিজেই ডাকলেন, 'রাজু।'

বুজরুক বাইরে হাতিটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

সাহেবি পোশাক পরা রাজুকে দেখে রানিমা কিছুটা সময় অবাক হ'য়ে রইলেন। ও যদি এখনই হ্যাট্‌ম্যাট্‌ ক'রে ইংরিজিতে বলে, আমি তোমার ছেলে নই, তা হ'লে অবাক হবার কিছু থাকবে না। কত বড়ো ও বলিষ্ঠ দেখাচ্ছে রাজুকে! রানিমা রাজুর বাঁ-হাতের ক'ড়ে আঙুলে নিজের দাঁত ছুঁইয়ে দিলেন, কিন্তু অন্য সময়ের মতো বুকে জড়িয়ে ধরতে পারলেন না তাকে। বিদেশী পোশাক প'রে অন্য একটি লোক যেন রাজু।

তারপর হাতি সওয়ার নিয়ে চলতে লাগলো। দু-তিন জন লোক ইতিমধ্যেই সদর-দরজার মাথায় উঠে তারও উপরের দরজাটা খুলে ধরেছে। প্রাচীন কেল্লার কায়দায় দরজা। দরজার দুটি ভাগ। নিচের অংশটা দৈনিক খোলা ও বন্ধ হয়। উপরের দরজাটা খোলা হয় দুর্গা-প্রতিমার বিসর্জনের সময়, কিংবা চৌ-দোলায় চেপে যখন নতুন বউ আসে। তখন দুটি দরজা খুলে দিলে মাটি থেকে খিলান অবধি বিশ হাত উঁচু ফটক তৈরি হয়।

বুজরুক হাতি থেকে দূরে থাকবার জন্য আগে-আগে তার ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে চলেছে। ঘোড়াটার চাল দেখবার মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এগোচ্ছে না, এক জায়গাতেই নাচছে।

রাজবাড়ির দোতলার শাদা দেয়ালের গায়ে জানলা ছাড়াও পাথরের ঝিলমিল বসানো ঝরোকা ছিলো, তার গায়ে চোখ রেখে রানিমা

অনেকক্ষণ হাতিটার চলন দেখলেন। দেখতে পেলেন, কে-একজন হাতিটার পেছনে দৌড়চ্ছে, কতকটা রূপচাঁদের মতো চেহারা।

জাঁ পিয়েত্রো প্রৌঢ়ত্ব পার হয়েছে। মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ইংরেজিতে যাকে গোটি বলে, তেমনি। কিন্তু মুখ-চোখের বয়স আর তার চুল-দাড়ির বয়সে যেন পার্থক্য আছে। মুখের কোন দিকটা ঠিক বলা কঠিন, বোধ হয় কপালটুকুতে পঁচিশের ছায়া এখনও লেগে আছে। কিন্তু ঠোঁটের কোণের বয়স দু-হাজার বছর হবে, পৃথিবীর সব খেলা দেখবার পর মানুষকে অত্যন্ত বোকা বলতে শিখলে যে-রকম হয় তেমনটি। চুল-দাড়ি দিয়ে বয়স নির্ণয় করতে গেলে পিয়েত্রোকে ষাটের কোঠায় নিয়ে যাওয়া যায়।

সওয়ার নিয়ে রামপিয়ারি যখন পিয়েত্রোসাহেবের কুঠির কাছাকাছি পৌঁছলো তখন সে তার আটচালার হাওয়াঘরে ব'সে গড়গড়া টানছে।

আটচালাটির ভিত্ চারিদিকের জমি থেকে প্রায় দশ হাত উঁচু। চারদিকে চারটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে তবে পথে আসতে হয়। আটচালাটি চতুষ্কোণ, ত্রিশ হাত লম্বা-চওড়া। ঘরের ছাদ খড়ের। মোটা-মোটা শাল কাঠের তীর-বরগার কাঠামোর উপরে খড়ের ছাদ। আটচালাটির হাত পঞ্চাশ দূরে পদ্মা।

পদ্মার বুক থেকে সোজা দেয়াল গেঁথে তোলা, ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। পদ্মার বুকে নৌকোয় যেতে-যেতে বাঁধের দিকে তাকিয়ে মনে হবে যেন কেল্লার প্রাচীর উঠেছে। বাঁধের উপরের পথে যখন লোকজন চলাচল করে তখন মনে হয় কেল্লার প্রাচীরে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে বুজরুক আলি এসে গিয়েছিলো। রাজু ও বুজরুক উভয়েই বাহন থেকে নেমে আটচালায় প্রবেশ করলো।

পিয়েত্রোসাহেবের সম্মুখে একটি ছোট্টো টেবিল, তার উপর মদের গ্লাস ও মদ। তার হাতে একটা, টেবিলের উপর একটা, চেয়ারের হাতলে ঠেসিয়ে রাখা তৃতীয় একটা বন্দুক। বন্দুকগুলোর ঝকঝকে চেহারা দেখে বোঝা যায় সেগুলো নতুন। তার মধ্যে একটি সবিশেষ। সেটার নল রুপোর মতো ঝকঝক করছে, অন্য দুটোর মতো নীল ইস্পাতি রঙের নয়। সেটার কাঠের বাঁটের গায়ে চাঁদির মসৃণ কাজ। কাজের জিনিস ব'লে মনে হয় না, শখের জিনিস। তরোয়ালের বাঁটে হীরা বসানো হ'তো সেকালে। পিয়েত্রোর হাতে এই বন্দুকটিই ছিলো, নলটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করছিলো সে।

রাজু উঠে এসে কাছাকাছি দাঁড়াতেই পিয়েত্রো দাঁড়িয়ে উঠে তাকে অভ্যর্থনা করলো। টেবিলের ওপাশের একটা চেয়ারে রাজু বসলো। বুজরুক আলি রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছলো, সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত আটচালাটা খোশবুতে ভ'রে গেল। পিয়েত্রো হাসিমুখে টেবিলের উপরে রাখা ঝকঝকে কাঁচের গ্লাসটিতে বুজরুককে ইঙ্গিত করলো। বুজরুক পাত্র থেকে পুরো গ্লাসটা ভ'রে ঢকঢক ক'রে গলায় ঢেলে দিলো। পেগের হিসাবে সে চলে না।

পিয়েত্রোসাহেব একটু ইতস্তত ক'রে এবার কথা বললো। কথা শুনে বুঝবার উপায় নেই তার নাম জ্যঁা পিয়েত্রো। পরিষ্কার স্থানীয় বাংলায় সে বললে, 'রাজচন্দ্র, এখন তোমার যোলো পার হয়েছে। নানা কারণে লম্বা তরোয়ালের শিক্ষা তোমাকে দিতে পারলাম না। আমার নিজের ধারণা, কাজের সময়ে লম্বা তরোয়াল যত প্রয়োজন বাঁকা ছোটো তরোয়াল তত নয়। যাক, তোমার জন্য এই বন্দুকটি আনানো হয়েছে। যদি পছন্দ হয় নাও, নতুবা অন্য যে-কোনো একটা নিতে পারো।'

'কিন্তু আমি তো ওর ব্যবহার জানি না।'

'ব্যবহার আজই শিখবে। চিতা শিকারের ব্যবস্থা আছে। বনে বাঘ আছে। তার উপরে চালাতে হবে। অবশ্য যাত্রার আগেই বুজরুক-সাহেব তোমাকে কল টিপবার কৌশল দেখিয়ে দেবে।'

রাজু এবার একটা বন্দুক হাতে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলো। পিয়েত্রোর একজন লোক এসে ছিলিম বদলে দিয়ে গেল। পিয়েত্রো গড়গড়ায় মন দিলো। বুজরুক রাজুকে ডাকলো, 'চলুন, কল টেপা শিখিয়ে দিই।'

বন্দুক-হাতে রাজু বুজরুকের সঙ্গে আটচালার এক কোণে পদ্মার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালো। সেখানে দাঁড়িয়ে বজরুক রাজুকে বন্দুক চালানোর প্রাথমিক কৌশলগুলো শিখিয়ে দিয়ে বললো, 'এবার জলের দিকে দু-চারটে গুলি ছুঁড়ুন।'

প্রথম গুলিটা যখন প্রচণ্ড স্বাভাবিক শব্দ ক'রে বেরিয়ে গেল রাজু হকচকিয়ে বন্দুকটা প্রায় ফেলে দিয়েছিলো আর কি! বুজরুক তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'ঠিক আছে।'

তারপর দু-চারটে গুলি রাজু নিজে-নিজেই ছুঁড়লো।

বুজরুক বললে, 'এবার নিশানা ঠিক করতে হয়।'

'কি ক'রে করে?'

বুজরুক কৌশলটা দেখিয়ে দিলো।

'কিন্তু নিশানা করবো কি?'

বুজরুক জলের উপরে উড়ন্ত গাংশালিকের ছোটো একটি দলকে দেখিয়ে দিলো।

'ওরা তো নড়ছে, নিশানা হবে কি ক'রে?'

'হবে।' বলতে-বলতে বুজরুক নিজের বন্দুকটি তুলে নিলো এবং বাঁ-এরটা ব'লে গুলি ছাড়লো।

শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে দলের বাইরে বাঁ-দিকের শালিকটা জলে প'ড়ে গেল।

কিন্তু বুজরুক পারলো ব'লেই রাজু পারবে এমন কথা নেই। শালিকের দলটি ফিরে আসতেই রাজু পর-পর তিন-চারটি গুলি করলো কিন্তু একটিও শালিক ছুঁতে পারলো না।

রাজু লজ্জিত হ'লো। বুজরুক বললো, 'ভালো হয়েছে ছোঁড়া, বন্দুক ধরার ভঙ্গিটাও ভালো। চলুন, কিছু খেয়ে নিয়ে এবার রওনা হওয়া যাক।'

রাজু ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলো, পিয়েত্রোর টেবিলের কাছাকাছি আর-একটা বড়ো টেবিল পাতা হয়েছে এবং তার উপরে আহার্য সাজানো হয়েছে। রং-করা একটা বেতের ঝুড়িতে কতকগুলি নারাঙি, একটা রুপোর পরাতে ধোঁয়ায় খোশবু ছড়ানো বিরিয়ানি, একটা ছোটো রুপোর গামলায় ডিমসিদ্ধ। একটা ঝকঝকে কাঁচের বাটিতে ননি, আর তার পরে এল মেটে রং ক'রে ভাজা একটা দুম্বার প্রায় আধখানা।

'এসো রাজু। চটপট কিছু খেয়ে নাও। অবশ্য সঙ্গেও খাবার থাকবে।'

সার্টের নিচে পৈতার গোছাটি মোটা হ'য়ে উঠে রাজুর বুকে লাগতে লাগলো। রাজু বললো, 'পৈতের আগে দু-একবার খেয়েছি বটে, কিন্তু এখন আর পারি না, মঁসিয়ে পিয়েত্রো।'

পিয়েত্রো জিদ করলো না, যুক্তির অবতারণা করলো না। পরিচারককে ডেকে চাপা গলায় কি ব'লে দিলো।

রাজু ততক্ষণে আবার তার সেই চাঁদমারির কাছে ফিরে গিয়েছে। গাংশালিকরা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিলো, কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকায় সেদিকে সে নজর দিলো না। খানিকটা সময় চড়বড় ক'রে বন্দুক ফুটিয়ে সে পদ্মার হাতখানেক জল বিক্ষুব্ধ ক'রে তুললো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটা নৌকো আসছে। বড়ো নৌকো, শাদা পালের বুক

ফুলিয়ে মাথায় একটা লাল নিশানের ঝুঁটি উড়িয়ে— ঠিক যেন একটা দৈত্যমার্কা চীনে হাঁস। পালটি নড়ছে বটে তবু গাংশালিকের শাদা বুকের চাইতে পালটির বুক প্রশস্ততর। কিছু চিন্তা না ক'রেই রাজু পালটি লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লো। শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে পালটি তিন-চার হাত লম্বালম্বি ছিঁড়ে গেল। অত বড়ো নৌকোটা টাল সামলাতে না পেরে পাক খেয়ে টলতে লাগলো। রাজু প্রথমে চমকে উঠলো। সে ভাবতেও পারে নি তার গুলিতে এমন ব্যাপারটা হ'তে পারে। আটচালার রেলিং টপ্‌কে সে যেন তখনই নৌকোটার সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে।

রাজু আকুল হ'য়ে ডাকলো, 'আলি খাঁ, আলি খাঁ।'

বুজরুক নৌকোটা লক্ষ্য ক'রে প্রথমে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলো। নৌকোটা টাল সামলাতে না পেরে একটা চড়ার উপরে উঠে পড়েছে। মাঝিমাল্লারা কিলবিল ক'রে হাত-পা নাড়ছে। হঠাৎ বুজরুক প্রচণ্ড শব্দে হা-হা ক'রে হেসে উঠলো।

পিয়েত্রো বললো, 'কি ব্যাপার?'

'মরেলগঞ্জের দেওয়ানের কোষা—'

'ও!' পিয়েত্রো ওই একটি মাত্র অব্যয় প্রয়োগে তাচ্ছিল্যের শেষ কথা উচ্চারণ করলো।

'মাথায়, দেওয়ানের মাথায় নয়, মাস্তুলের মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক।' বললো বুজরুক।

পিয়েত্রো কথা না ব'লে বড়ো ছুরিটা অতিরিক্ত জোরে মাংসের চাংড়ায় বসিয়ে এক টানে বড়ো এক টুকরো মাংস কেটে নিলো।

বুজরুক বললো, 'বেশ নিশানা করেছেন, আমি কিন্তু ওই পতাকাটিকে নিশানা করতাম, নৌকোর পালটা মস্ত বড়ো, নিশানা দুরস্ত হয় না ওতে।'

রাজু এইটুকুমাত্র প্ররোচনাতেই আবার বন্দুক তুলে নিলো এবং

পতাকাটা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লো। পতাকাটার খানিকটা ছিঁড়লো কি না-ছিঁড়লো, গুলির শব্দে মাঝিমাল্লারা নৌকোর পাটাতনের উপর শুয়ে পড়লো।

বুজরুক আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলো।

পিয়েত্রোর একজন ব্রাহ্মণ পরিচারক ছিলো। সে ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলো, দুধ, সন্দেশ, ছানা, নারকেল, কিছু ফলমূল সমেত আহার্য সাজিয়ে উপস্থিত করেছে। সঙ্গে জল, আসন ইত্যাদি নিয়ে আরও দু-জন ব্রাহ্মণ।

বুজরুক ও পিয়েত্রোর থেকে কিছুদূরে জল ছিটিয়ে আসন ক'রে আহার্য সাজিয়ে দিলো তারা। পিয়েত্রো বললে, 'এবার বোসো রাজু। আমি আমার মামার কাছে শুনেছি, এ রকম খেতে দোষ নেই।'

একটু দ্বিধা ক'রে রাজু এবার বসলো। বুজরুক ও পিয়েত্রো তাদের টেবিলে মন দিলো। খেতে-খেতে এটা-ওটা গল্প হ'লো।

এদের প্রাতরাশ শেষ হ'তে-হ'তে পিয়েত্রোর হাতিও সেজে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

মাহুতরা শিকারের সরঞ্জাম তুলে নিচ্ছে হাওদায়। পিয়েত্রো আট-চালার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছে এমন সময়ে রাজু প্রশ্ন করলো, 'মঁসিয়ে পিয়েত্রো, প্রায়ই আপনি আপনার মামার কথা বলেন। আজকের উল্লেখ শুনে মনে হচ্ছে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পাঁতি দিতেন।'

'তা দিতে পারতেন কিন্তু তাঁর পাঁতি কেউ নিতো না।'

'যদি আপত্তি না থাকে আমাকে আজ আপনার মামার গল্প বলবেন?'

'তা বলা যাবে। ব'লে রাখা ভালো। কোন দিন টুপ ক'রে খ'সে পড়বো, এ-সব গল্প একেবারে অজানা থেকে যাবে। তুমি বরং আমার

হাওদাতেই চলো। যেতে-যেতে গল্পটা বলা যাবে। এখন তোমার শোনার বয়েস হয়েছে।'

হাতি দুটি পাশাপাশি বসেছে। হাওদা পর্যন্ত মই লাগিয়ে প্রথমে পিয়েত্রো, তার পরে রাজু উঠলো পিয়েত্রোর বুড়ো হাতিটায়। বুজরুক বিনা মইয়ে মাহুতদের কায়দায় শুঁড়ের সাহায্যে রামপিয়ারির পিঠে চেপে বসলো।

মাহুতের ইঙ্গিতে হাতি দুটি যখন উঠছে তখন রাজু দেখে বিস্মিত হ'লো, বুজরুকের পেছনে হাওদা চেপে ধ'রে রামপিয়ারির পিঠে দাঁড়িয়ে আছে রূপচাঁদ। চোখে চোখ পড়ায় রূপচাঁদ হেসে ফেললো। রূপচাঁদের মাথায় লাল গামছা বাঁধা, গায়ে পিরান, পায়ে খোট্টাই জুতোও আছে।

হাতি পদ্মার তীর ধ'রে উত্তরমুখে চলতে লাগলো।

চলতে-চলতে রাজুকে পিয়েত্রো তার মামার গল্প যা বলেছিলো তার সারমর্ম এই : ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের কথা। এখন যাকে মরেলগঞ্জ বলা হয়, তখন তাকে কোনো গঞ্জই বলা হ'তো না। চারদিকে জঙ্গল, মাঝখানে দু-তিন শ' একর জমি সাফ ক'রে চাষ-আবাদ করা হচ্ছে। জঙ্গল এমন যে যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিলো পদ্মা। লোকে উল্লেখ করতে হ'লে বলতো পিয়েত্রোর আবাদ। কখনো-কখনো বলতো ফরাসডাঙা।

বর্তমান জঁা পিয়েত্রোর পিতার নামও ছিলো জঁা পিয়েত্রো এবং তিনি ছিলেন এই ফরাসডাঙার মালিক।

পিয়েত্রোদের আবাদে যে-নীলের চাষ হ'তো সেটা বিদেশে চালান যেতো না। পঞ্চাশ ঘর তাঁতী ছিলো আবাদে। তারা মসলিন বুনতো। সেই সব মসলিন রঙানো হ'তো নীল দিয়ে। ক্রমে পিয়েত্রোর আবাদে তাঁতীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। আর সেই সঙ্গে নীলের চাহিদাও বাড়তে লাগলো, কিন্তু তার চাইতে আরও চাহিদা বাড়লো ধানচালের।

পিয়েত্রোদের আবাদের চাল বাইরে যেতো না। দু-তিন মাস পর-পর 'পিয়েত্রো নৌকোর বহর সাজিয়ে ফরাসডাঙায় যেতো, যে-ফরাসডাঙার নাম চন্দনগড়। সেখান থেকে আবাদের মসলিন ফরাসী জাহাজে চেপে যাত্রা করতো য়ুরোপে। এমন এক-সময় এসেছিলো যখন মসলিন বলতে পিয়েত্রোর নামের ছাপ দেওয়া মসলিনকেই বুঝাতো। ইংরেজদের কলে মলমল তৈরি হ'তে আরম্ভ করেছে, এ-দেশের লোকের জন্য সেই মলমল চালান আসতে শুরু হয়েছে। ফলে এ-দেশের মসলিনের মহাজনরা মার খেয়ে ব'সে যেতে লাগলো। কিন্তু স্পেন ও ইটালীর কাউণ্টেসরা তখনো মসলিন চায়। সেই মসলিন নিয়ে যেতো ফরাসী জাহাজ। তখন ইংরেজরা তাদের দেশের মলমল এ-দেশে আনিয়ে এ-দেশী কারিগর দিয়ে ফুল তুলিয়ে রং করিয়ে ফের য়ুরোপে নিয়ে যেতো। কিন্তু এই জালিয়াতী সাধারণ লোকরা বুঝতে না পারলেও সেভিল-ক্যাষ্টিলের মহিলারা বুঝতে পারতো, তেমনি বুঝতে পারতো ফ্লোরেন্সের নাগরিকারা। সে অন্য-এক গল্প।

এই মসলিনের চালান নিয়ে পদ্মা দিয়ে যাওয়া-আসা করতো পিয়েত্রোর নৌকো।

একদিন ঝোড়ো-সন্ধ্যার মুখে নৌকোর মাঝিরা পরস্পর ডাকাডাকি ক'রে বললো— নৌকো বাঁধা দরকার।

পিয়েত্রো তার কেবিন থেকে মুখ বার ক'রে বললো— আর এক-বাঁক এগিয়ে বাঁধো।

আর এক-বাঁক এগিয়ে পাওয়া গেল একটা শ্মশান। নৌকো তখন জলঙ্গী ছাড়িয়ে ভাগীরথী ধ'রে চলছিলো। নৌকো বাঁধতে গিয়ে যাত্রী-দের কানে এল বহু কণ্ঠের চিৎকার এবং রামশিঙা ও জয়ঢাকের সম্মিলিত শব্দ। নৌকো থেকে কয়েকজন লোক নেমেছিলো রসদ কিনতে যাবে

ব'লে, চিৎকারের শব্দে তারা পিছিয়ে এল। খুব বড়ো রকমের কোনো উৎসব হচ্ছে, বোধ হয় হিংস্র ধরনের উৎসব। পিয়েত্রো কাঁধে বন্দুক, কোমরে কিরিচ বেঁধে নামলো ডাঙায়, সঙ্গে বুজরুকের পিতা উসমান খাঁ। তার কোমরেও দু-খানা লম্বা তলোয়ার, পিঠে দেশী বন্দুক ঝোলানো।

খানিকটা দূরে গিয়েই যা দেখতে পাওয়া গেল তাতে পিয়েত্রোর বুক হিম হ'য়ে গেছে। ডিফোর রবিন্সন ক্রুশোতে তেমনি বর্ণনা পাওয়া যায়। মাঝখানে একটা অগ্নিকুণ্ড, তার চারদিকে অসংখ্য লোক ধেই-ধেই ক'রে নাচছে, বীভৎস আনন্দে চিৎকার করছে, রামশিঙা, ঢোল, জগঝম্প বাজাচ্ছে। পিয়েত্রো হাত দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার দেখলো— অবিশ্বাস্য! এ কি আফ্রিকা? একটা মানুষকে ওরা ধ'রে রেখেছে। তার গলায় ফুলের মালা, পরনে দামি শাড়ি। শাড়ি দেখে পিয়েত্রো বুঝতে পারলো, এরা স্ত্রীলোকটিকে দাহ করবে, পুড়িয়ে খাবে না। কিন্তু তাই-বা কেন। হঠাৎ কি ক'রে কি হ'য়ে গেল, ব্যাপারটা শুরু করলো উসমান খাঁ। আকাশের দিকে চোঙ পেতে সে বন্দুক ছাড়লো দু-দু-বার। একটা কলরব উঠলো। কলরব থেমে একেবারে নিস্তব্ধ হ'লো পৃথিবী, তারপর সমস্বরে ওরা কথা ব'লে উঠলো। তারা কি বলছে শুনবার আগেই পিয়েত্রোরা দেখতে পেলো স্ত্রীলোকটি ছুটতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু শুধু সে-ই নয়, যারা তাকে ধ'রে রেখেছিলো শিকার পালায় দেখে তারাও ছুটতে লাগলো। স্ত্রীলোকটি ছুটতে-ছুটতে— বোধ হয় তার লক্ষ্য ছিলো নদীর জল, আগুনে জ্ব'লে মরার চাইতে নদীর জলে ডুবে মরা কম বীভৎস— পিয়েত্রোদের কাছে এসে পড়েছিলো। কিন্তু সে স্ত্রীলোক, দৌড়ে পারবে কেন শ্মশানের বালির উপরে। প্রতি পদক্ষেপে তার পেছনের লোকরা তার দিকে এগিয়ে আসছিলো। একজন বল্লমের মতো একটা চোখা বাঁশ তাকে বিঁধবার

জন্য ডাক করলো, ঠিক এমনি সময়ে উসমান খাঁর বন্দুক আবার ছুটলো। লোকটা প'ড়ে গেল। স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, তারপর আবার ছুটতে আরম্ভ করলো এবং জলের কাছাকাছি পিয়েত্রোর কাছে পৌঁছে মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছিলো, কিংবা শাড়িতে পা জড়িয়ে। পিয়েত্রো বাহু প্রসারিত ক'রে ধ'রে ফেললো তাকে। স্ত্রীলোকটি চমকালো না, পালাবার চেষ্টাও করলো না। আর-একটু আশ্রয় দেবার জন্য পিয়েত্রো তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে ঘুমন্ত শিশুর মতো পিয়েত্রোর গলা জড়িয়ে ধ'রে যেন ঘুমিয়ে পড়লো।

'এই মহিলাটি আমার মা। তখন আমার মা-র বয়স ষোলো-সতেরো হবে হয়তো। আমার জন্মের সাথেই আমার মায়ের মৃত্যু হয়। লোকের মুখে শুনেছি আমার মায়ের দেহবর্ণ আমার পিতার দেহবর্ণের চাইতেও উজ্জ্বল ছিলো। আর পুরানো চিঠিপত্রে জেনেছি মাকে নিয়ে বাবা যখন প্যারিতে গিয়েছিলেন, শুধু পিয়েত্রোদের পরিবারে ও পাড়ায় নয়—সালঁ, কাফে, রেস্তোঁরা, থিয়েটার, যেখানেই কপালে সিঁদুর, চোখে কাজল আর মসলিনের শাড়ি প'রে আমার মা গিয়েছেন ধন্য-ধন্য করেছে লোকে। যাক, এখন মামার গল্প শোনো :

নৌকো চলছে, পরের দিন সকালে একটা ছোটো নৌকো পিয়েত্রোর বড়ো নৌকোটাকে ইশারা করলো। উসমান খাঁর নৌকোটা ছিলো সেই ছোটো নৌকোটার কাছে। পিয়েত্রো ডেকে বললো উসমান খাঁকে, উসমান খাঁ হাঁক দিয়ে ছোটো নৌকোর সওয়ারিকে সামাল ক'রে দিলো। অনেক হাঁক-ডাকের পর যে-লোকটি পিয়েত্রোর নৌকোয় উঠলেন, তিনি আমার মামা।

ঠিক কি-কি কথাবার্তা হয়েছিলো তা বলা সম্ভব নয়। মামার রূপের বর্ণনা শুনেছি, নামও শুনেছি। নবদ্বীপের কাছে কোথায় এক টোলের

পণ্ডিত তিনি। জায়গীর-টায়গীরও ছিলো। খাজনা আদায়-টাদায় করার ব্যাপারে দুঃসাহসের কাজও কিছু-কিছু করতে হ'তো। কাজেই পেশীবহুল ছিলো তাঁর দীর্ঘ ঋজু দেহ। ন্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন তিনি। তিনি তাঁর ভগ্নীকে সংস্কৃতে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, সেগুলির উত্তর পেয়ে পিয়েত্রোকে জিগ্যেস করলেন— তুমি কি একে বিবাহ করবে?

—এ কি খ্রীস্টান হবে?

—না।

—তা হ'লে কি ক'রে বিবাহ হবে?

—গান্ধর্বমতে হ'তে পারে।

—সেটা কি তোমাদের সমাজে চলে?

—না। শাস্ত্রে অচল নয়। তুমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক কিনা তাই বলো।

—যদি না করি?

মাতুল হেসে বলেছিলেন— ব্রাহ্মণের মেয়েকে তো আর নষ্ট হ'তে দেওয়া যায় না। আমার কাছে বিষের নাড়ু আছে। ওকে মানুষ ক'রে আদর দিয়ে মাথা খেয়েছে ওর বৌদি, সে-ই নিজের হাতে ওর জন্যে তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাঁচের গুঁড়ো আর গোখ্‌রোর বিষ সমান অংশে মিশিয়ে ছানা ও খইচুর দিয়ে তৈরি। এই নাড়ু অমোঘ।

সেই ব্রাহ্মণকন্যা সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলো দাদার হাত থেকে নাড়ু নেবার জন্য।

তখন পিয়েত্রো বলেছিলো— দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার ভগ্নী কি আমাকে ভালোবাসবে?

ব্রাহ্মণকন্যা এ-কথায় নিরুত্তর হ'য়ে মুখ নামালো। তার গণ্ড দুটি নিশ্চয় লাল হ'য়ে উঠেছিলো। কারণ তার অবনত মুখের দিকে চেয়ে থেকে,

শুনেছি উসমান খাঁকে বলতে, পিয়েত্রো হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বিশুদ্ধ ফরাসীতে চিৎকার ক'রে কি সব ব'লে উঠেছিলো। তার পরে জানু পেতে ব'সে আর কি সব বলেছিলো প্রার্থনা করার মতো।

পিয়েত্রো অতঃপর বললো— নবদ্বীপে কি আমাদের বিবাহ হ'তে পারে ?

—পারে।

—সেখানে কি ব্রাহ্মণ-বিধবার বিবাহ হবে ?

—হবে। আমি দেবো।

—তারপর আপনার সমাজ ?

আমার পক্ষে সমাজে বাস করা আর সম্ভব হ'বে না। কাশীবাসই বিধেয় হবে।

—তা হ'লে ?

—দুটি মানুষ যদি তার জন্য সুখী হয়···

বিবাহ কি মতে হয়েছিলো আমি জানি না। আমার মায়ের মৃত্যুর পর বাবা মনমরা হ'য়ে থাকতেন।

আঠারো শ' পনেরো খ্রীস্টাব্দ। তখন আমার বয়েস বছর পনেরো হবে। ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীর যুদ্ধ। পৃথিবীর সব জায়গাতেই ইংরেজ ফরাসী পরস্পরের বিরুদ্ধে মারমুখী হ'য়ে দাঁড়ালো। বাবা আমাকে তখন মামাবাড়িতে রেখে এসেছিলেন। তোমাদের মতো ধুতি চাদর প'রে থাকতাম। বাংলা আগেও কিছু শিখেছিলাম, সে-সময়ে পুরোপুরি শিখলাম।'

'তারপর ?' রাজু চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে শুনছিলো।

'তারপর আর কি।'

'আপনার মামা বেঁচে আছেন ? এখনো কাশীতেই আছেন ?'

'এ-সব খবর আজ নয়। আরও কিছুদিন পরে। বলবো বৈকি, এক-সময়ে বলবো তোমাকে।'

'আপনার বাবা কি করলেন আঠারো শ' পনেরো খ্রীস্টাব্দে ?'

'কিছু করবার আগেই ইংরেজদের হাতে বন্দী হলেন। প্রায় এক বছর পরে ছাড়া পেয়েছিলেন। তারও বছর দু-এক পরে পিয়েত্রো-আবাদে ফিরে এসেছিলেন। আমাকে আনিয়ে নিলেন কাছে। উসমান খাঁ আর বুজরুক আলি দু-জনে আমাকে নিয়ে এসেছিলো। তখন বোধ হয় তোমার মতোই বয়েস ছিলো আমার।'

'তারপর থেকে এখানেই আছেন ?'

'আর-কোথাও না গিয়েই বলতে পারি, যদি আর-একবার কিছুদিনের জন্য কাশী যাবার কথা ছেড়ে দিই।'

খুব সামান্য একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে পিয়েত্রো কথা শেষ করলো।

হাতি দুটো ততক্ষণে পদ্মার তীর ছেড়ে ক্রমশ দূরে চ'লে যাওয়ার রাস্তা ধ'রে পশ্চিমমুখে চলছে। পথটির পাশে কোথাও কৃষকদের ছোটো-ছোটো খামার, কোথাও ধানের জমি, খড়ের ঘর। কোথাও দু-পাশ থেকে বড়ো-বড়ো গাছ ডাল ছড়াতে-ছড়াতে বীথিকার মতো ছায়া করেছে। অন্য কোথাও মানুষ-সমান ঘাসের ঝোপ বাতাসে শিরশির করছে। হাতি দুটো বারংবার গাছের ডাল ভাঙবার চেষ্টা ক'রে শুঁড় উঁচু করে, কোথাও পথের ধারের কলাগাছ ধরার জন্য শুঁড় বাড়িয়ে দেয় কিন্তু মাহুতের তাড়নায় ছুটছেই, আর হাওদা দুলছে।

আধ ঘণ্টা পরে বন শুরু হ'লো। এবার মাহুতরা হাতি দুটিকে শুঁড়-চালনায় প্ররোচিত করতে লাগলো। গাছের ডাল ভাঙতে লাগলো হাতি দুটো, কোথাও পথ ক'রে নেওয়ার জন্য, কোথাও-বা মাথার উপরের ডালের আঘাত থেকে হাওদার সওয়ারিদের বাঁচানোর জন্য।

কখনও বা মাহুত নিজেই ছোটো-ছোটো ডালপালা লতা দা দিয়ে কেটে দিতে লাগলো। হাতির গতি মন্থর হ'য়ে এল।

কিন্তু মাঝে-মাঝে শুধু ঘাসের জঙ্গল। এ-রকমটা কি ক'রে হয় বোঝা কঠিন। জায়গাগুলো একটু নিচু। ঘাসগুলো সেখানে হাতিগুলোর পেট অবধি উঁচু। হাতি দুটি যেন এই ঘাসের বন্যায় অবগাহনের জন্য তীর থেকে নিচে নামে, তারপর ঘাসের তরঙ্গে সাঁতার দিয়ে অন্যদিকের জঙ্গলে গিয়ে ওঠে। ঘাসের জঙ্গলগুলো আয়তনে খুব কম নয়। মাঝে-মাঝে এক-আধটা মাঝারি চেহারার গাছ ছাড়া শুধু ঘাস আর ঘাস।

সহসা হাতি দুটির পায়ের তলায় শব্দ হ'তে লাগলো। তাদের গতি আরও মন্থর হ'লো। জলের ছপ্‌ছপ্ শব্দ। পথটা পিয়েত্রোর হাতির সম্ভবত পরিচিত— সেটা আগে-আগে চলেছে। রামপিয়ারি তাকে সন্তর্পণে অনুসরণ করছে। কিন্তু পিয়েত্রোর চাইতে পথের সঙ্গে বুজরুকের পরিচয় বেশি। সে-ই রামপিয়ারির পিঠ থেকে হাতি দুটিকে ডাইনের দিকে চালাতে বললো।

ঘাসের বনের তলায় এখানে-ওখানে এখনো মাটি ভিজে-ভিজে, কোথাও বা জল ছলছল করছে।

সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে রাজু চিৎকার ক'রে উঠলো, 'পদ্মা, পদ্মা।' তার বক্তব্য অবশ্য পদ্মা নয়, বক্তব্য বনের অজস্র পল্লবের ভিতর থেকে দেখা পদ্মার অপরিমেয় সৌন্দর্য।

'পদ্মা নয়। পদ্মা বিশ ক্রোশ পেছনে।' বুজরুক বললো।

বুজরুকের ইঙ্গিতে হাতি দুটি বিলের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো, রাজুকে বিলের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। এটা পাখিদের রাজ্য। মানুষের সাড়া পেয়ে ডাহুক, পানকৌড়ি, বক, সারস, বুনোহাঁস প্রভৃতি একসঙ্গে সহস্র কলরব ক'রে উঠলো। পাখার ছায়ায়, ডানার রঙে কিছু-

ক্ষণের জন্য দৃশ্যের স্বাভাবিক রং বদ্‌লে গেল। ঐকতান বললে তুলনাটা ঠিক হয় না। এ-অর্কেস্ট্রায় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আপাতবিরোধী ধ্বনি-উচ্ছ্বাসগুলো একান্ত অদ্ভুত একটি হারমনির ইঙ্গিত দিতে লাগলো।

পাখিরা একটু প্রবোধ পেয়ে স্থির হ'লে রাজু লক্ষ্য করলো হাতি দুটির পায়ের কাছে জল। স্থির কালো জল। আধ ক্রোশ পরিমাণ জলের বুকে সংখ্যাহীন পদ্ম। পদ্মপাতার সবুজ গালিচায় লাল পদ্মের নক্‌শা। বাতাসে পদ্মের ডাঁটগুলো দুলছে। অবারিত প্রসারিত দৃষ্টির সীমায় আকাশ ও বিলের রং পরস্পরকে প্রভাবিত ক'রে অবশেষে এক হ'য়ে গেছে। সেখান দিয়ে একটা নৌকো যাচ্ছে, তার গলুই-এর দু-ধারে কালো জল শাদা হ'য়ে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে।

রাজু চিরকালের জন্য বিলকে ভালোবেসে ফেললো।

কিছুক্ষণ বিলের পাশ দিয়ে জল বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলার পর হাতি দুটি বিল থেকে দূরে স'রে যেতে লাগলো। নীরব হ'য়ে এল পাখিদের ডাকাডাকি। শুধু একজোড়া ডাহুকের প্রশ্নোত্তরের পালা তখনও শেষ হয় নি বোঝা গেল।

হাতি দুটির এখন পা মেপে-মেপে চলতে হচ্ছে, পথ ক'রে-ক'রে এগুতে হচ্ছে। এক-সময়ে পিয়েত্রো বললো, 'এবার আমরা পৌঁছে গেছি। এখন শিকারের খোঁজ শুরু হবে। রাজু, তুমি তোমার হাওদায় যাবে? অবশ্য বুজরুক সঙ্গে থাকবে। কারণ দুটো হাতি থেকেই সমান আক্রমণ হওয়া চাই।'

মাহুতরা হাতি দুটিকে পাশাপাশি গায়ে-গায়ে দাঁড় করালো। রাজু নিজের হাতিতে গিয়ে বুজরুকের পাশে বসলো।

শিকারের জায়গাটি যেন পূর্বস্থিরীকৃত। চারদিকে ছোটো-ছোটো গাছের প্রাচীরের মধ্যে খানিকটা ঘাসের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে

দিয়ে ঝিরঝির ক'রে একটা স্বল্পপরিসর ধারা মন্থর গতিতে বিলের দিকেই এগিয়ে চলেছে। ঘাসের জঙ্গলটির উত্তর দিকের খানিকটা অংশ বড়ো গাছের জঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত, একটা ক্রীড়াক্ষেত্রের যেন প্রবেশ-দ্বার। বুজরুকের হাতি সেই প্রবেশদ্বার দিয়েই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলো।

কিছুদূর যাবার পর হাতি দুটির গতি মন্থর হ'য়ে এল। পিয়েত্রোর হাতি অত্যন্ত শিক্ষিত, তার চাল দেখে মনে হ'লো তার মাথায় কিছু-একটা ফন্দি ঘুরছে। শুঁড়টাকে গুটিয়ে নিয়ে সে বাঁ-দিকের দাঁতের উপরে অকেজো কিছু-একটার মতো রেখেছে, তারই মধ্যে থেকে-থেকে ফোঁস-ফোঁস ক'রে ঘ্রাণ নিচ্ছে। রামপিয়ারিও মাহুতের নির্দেশে শুঁড় তুলে একটা দীর্ঘস্থায়ী সেলামের ভঙ্গিতে এগোচ্ছে।

বড়ো ঘাসের একটানা জঙ্গলের পরিবর্তে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ছোটো-ছোটো ঝোপের মধ্য দিয়ে হাতি দুটি এগিয়ে চলেছে। অভিযাত্রীরা ক্রমশ একেবারে নির্বাক হ'য়ে গেল।

ইতস্তত ছড়ানো মৃত প্রাণীর কঙ্কালও চোখে পড়ছে মাঝে-মাঝে। সদ্যমৃত নয়। কঙ্কালগুলোর কোনো-কোনোটা বর্ষায় ধুয়ে, রোদে পুড়ে চিনে মাটির তৈরি ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু আর বেশি দূর যাবার আগেই বুজরুক বললে, 'এখান থেকেই পায়ে হেঁটে যেতে হবে।'

'পায়ে হেঁটে?' রাজু বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলো।

হাতি থেকে নেমে পিয়েত্রো, বুজরুক এবং রাজু পাশাপাশি অগ্রসর হ'তে লাগলো। বন্দুকের নলগুলো সামনের দিকে বাগিয়ে ধ'রে তারা পা টিপে-টিপে চলছে।

শিকারের চিত্র রাজু দেখেছে : উন্মত্ত হাতি তীব্র বেগে ছুটছে, আর্ত বন্যপ্রাণীরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কোথাও বা শার্দূলরাজ হাতির মাথা কামড়ে ধরেছে। রাজু ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো, 'কিন্তু কারো ঘুম ভাঙবার

ভয়ে যেন পা টিপে-টিপে যাচ্ছি। পাখি কিংবা হরিণ হ'লে হ'তো, শুনলাম বাঘ—'

পিয়েত্রো এই প্রথম তার নস্যদানিটা বার ক'রে নস্য নিলো।

বুজরুক বললো, 'বাঘ যখন বহুদূর থেকে শিকার লক্ষ্য করতে-করতে এগুতে থাকে তখন সে-ও এমনি পা টিপে-টিপে চলে।'

পিয়েত্রো হাসিমুখে চাপা-গলায় বললে, 'বুজরুক, তুমি কি বাঘদের আফিম খাইয়েছো?'

কিন্তু বেশি দূর তাদের যেতে হ'লো না। বুজরুকের খবরাখবর কতদূর নির্ভরযোগ্য তারই একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। একটা বড়ো ঘাসের ঝোপের ডান দিক দিয়ে ঘুরতেই দৃশ্যটা চোখে পড়লো। তাদের থেকে একশ' গজ দূরে আতপ্ত ঘাসের বুকে বাঘের সংসার। বাঘিনী তার দু-তিনটি শিশুকে স্তন্য দিচ্ছে, আর তাদের থেকে গজ দশ-বারো আগে বাঘ নিজে ব'সে। কান দুটো খাড়া, দৃষ্টি স্থির, লাঙ্গুল ঈষৎ আন্দোলিত। বড়ো বাঘ নয়, চিতা। হলদে ঘাসের উপর প্রাণী কয়টির কী মধুর চিক্কণ রূপ! শরীরের কী অপূর্ব গঠন! রাজুর বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক্‌ করতে লাগলো।

রাজু বন্দুক তুলতে যাচ্ছিলো, পিয়েত্রো নিষেধ করলো। বললো, 'আমার মামা বলেছেন, রাজু, পাণ্ডু রাজা হরিণকে তার সংসারের গণ্ডির মধ্যে বধ ক'রে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছিলেন।'

'তা হ'লে! আমরা কি ফিরে যাবো?'

'না রাজু। আক্রমণটা ওদের দিক থেকে আসুক। আমরা তিনজন, ওরা তো দুই। তার উপরে ওদের সম্বল সামান্য কিছু প্রকৃতিদত্ত অভিজ্ঞতা, কিছু ধারালো নখ। আর আমাদের সঙ্গে কত অস্ত্রশস্ত্র।' পিয়েত্রো হাসলো।

বুজরুক তার তরোয়াল কোষমুক্ত ক'রে আরও দু-এক পা অগ্রসর হয়েছিলো এদের আলাপের অবসরে। এবার বাঘটা উঠে দাঁড়ালো। মৃদু একটা গর্জন ক'রে, সবগুলো দাঁত বার ক'রে মানুষদের দেখতে পেলো। বাচ্চাগুলো তখনও স্তন্য পাবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে। বাঘিনীও উঠে দাঁড়ালো। নিজের উদরে লাঙ্গুলের আঘাত ক'রে নিজের শক্তি সম্বন্ধে মানুষদের যথেষ্ট জ্ঞান দেবার চেষ্টা করলো, তারপর আরও কিছুদূর পিছিয়ে অপেক্ষাকৃত বড়ো-বড়ো ঘাসের মধ্যে বাচ্চাগুলোকে লুকিয়ে ফেললো। শুধু তার নিজের মুখটা দেখা যেতে লাগলো। বাঘটাও ধীরে-ধীরে পিছিয়ে গিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়ালো।

এবার বুজরুক তার তরোয়াল খাপে রেখে পিঠ থেকে বন্দুকটা হাতে নিলো এবং বাঘটার দিকে লক্ষ্য ক'রে বন্দুকের আওয়াজ করলো। বাঘটা আহত হ'য়ে গর্জন ক'রে উঠলো এবং মুহূর্তমধ্যে তার মূর্তি মৃত্যুর মতো ভয়াল হ'লো এবং রাজুর আশৈশব কল্পনার বীভৎসতাকে ছাড়িয়ে গেল। রাজুর হাত থেকে বন্দুক প'ড়ে গেল না, কিন্তু তার হাত কাঁপছে। ওদিকে বাঘ তখন তীব্র গতিতে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে। ছোটো-ছোটো গুলির কয়েকটা বাঘের গায়ে বিঁধেছে, তার হলদে মখমল-মসৃণ দেহ রক্তে লাল হ'য়ে যাচ্ছে। একশ' হাত থেকে ক'মে দূরত্ব পঞ্চাশে এসেছে, এমন সময় পিয়েত্রো বন্দুক তুললো। এমন বাঘকে গুলি করা কঠিন, কিন্তু পিয়েত্রোর গুলি বাঘকে ভীষণভাবে আহত করলো। তার গতি স্তম্ভিত হ'য়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য। হাহাকারের মতো একটা তীব্র গর্জন ক'রে উঠলো। আবার তখনই উঠে প'ড়ে সে পালাবার চেষ্টায় পেছন ফিরে চলতে লাগলো। কিন্তু সে পালাতে পারছে না, তার বাঁ-কাঁধ থেকে ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়ছে, কিছুতেই সে সামনের বাঁ-পা ফেলতে পারছে না। ঠিক এমন সময় বুজরুক

হাতের বন্দুক মাটিতে ফেলে তরোয়াল খুলে এগিয়ে গেল বাঘটার দিকে।

রাজু চিৎকার ক'রে উঠলো, 'আলি খাঁ, আলি খাঁ!'

পিয়েত্রো বুজরুকের কাছাকাছি থাকবার জন্য সামনের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু বুজরুক বাঘটাকে এমনভাবে আড়াল করেছে যে গুলি করা যায় না।

বাঘ ফিরে দাঁড়ালো ত্রিশ হাত দূরে। এক মুহূর্তের ঝঞ্ঝার মতো ব্যাপারটা। বাঘ অপমানে বেদনায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। পিয়েত্রোর বন্দুক গর্জন ক'রে উঠলো। বুজরুকের তরোয়ালও ঝলকে উঠলো বিদ্যুতের মতো। হলুদ কালো লালে মেশানো একটা গতি বুজরুকের গা ছুঁয়ে মাটিতে প'ড়ে গেল। তিন চার হাত দূরে বুজরুকও মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিলো, তার চার পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পিয়েত্রো।

কল্পনা করা যায় না, এত তাড়াতাড়ি বুজরুক উঠে বসলো। কিন্তু বাঘটা আর উঠলো না। এবার রাজু এগিয়ে গিয়ে এদের পাশে দাঁড়ালো। বাঘটার পেটের কাছটা তখনও আক্ষেপে ওঠাপড়া করছে। কিন্তু সে আর উঠবে না তা বোঝা গেল। বাঘটার বুকের কাছে প্রকাণ্ড একটা গুলির ঘা, তার ডান-দিকের পাঁজরায় একটা যেন তীরের ফলা বিঁধে আছে। রাজু ভালো ক'রে দেখে বুঝতে পারলো বুজরুকের মাথায় তার কুল্লাযুক্ত মুরেঠা নেই, মাথায় মস্ত বড়ো একটা টাক। দেখলো, তার তরোয়ালটা মাটিতে প'ড়ে আছে এবং ডগার দিকে প্রায় আধ হাত ভেঙে গেছে।

বাঘিনীর সাড়া পাওয়া গেল না। দূর থেকে যেন একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে। এদিকে হাতি দুটিও এগিয়ে এসেছিলো। বাঘটার মৃতদেহ সেখানেই প'ড়ে রইলো। বুজরুক বা পিয়েত্রো একবারও বোধ হয় তার

কথা আর ভাবলো না। মাহুতের নির্দেশে হাতি দুটি বসলো। শিকারীরা আবার হাওদানশিন হ'লো। হাতি দুটি নীরবে ফিরে চললো। সেই পুরনো পথে আবার হাতি চলছে কখনো-বা পা মেপে-মেপে, কখনো-বা দ্রুতগতিতে।

অনেকটা বেলায় পিয়েত্রোর বাড়িতে পৌঁছে রাজু তখন-তখনই বাড়ি ফিরবার কথা তুলেছিলো। পিয়েত্রো শোনে নি। রূপচাঁদের মুখে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো রাজুর বাড়িতে। রাজু সন্ধ্যায় ফিরবে। সেই ব্রাহ্মণ পরিচারক দুটি রাজুর স্নান আহ্নিক ও সাত্বিক আহারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলো।

সন্ধ্যা নামছে। সারাদিন হাতির দোলায় দুলে রাজুর হাতিতে উঠবার ইচ্ছে ছিলো না। মাহুত হাতি নিয়ে চ'লে গেছে। কিন্তু নতুন-পাওয়া-বন্দুকটা হাতছাড়া করে নি রাজু; রূপচাঁদের সঙ্গে ধীরে-ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছে।

রাজু বলছিলো, 'বুজরুক আর পিয়েত্রোর মধ্যে কার সাহস বেশি বল তো রূপচাঁদ। বুজরুকের, না?'

'আজ্ঞে।'

'আসলে তুই বুজরুককে দেখতে পারিস নে। খোলা কিরিচ নিয়ে বাঘের দিকে অমন ক'রে ছুটে যাওয়া সোজা কথা নয়। এ তোর নিমে কামারের খাঁড়া দিয়ে হাড়িকাঠের মোষ কাটা নয়।'

'আজ্ঞে।'

'আজ্ঞে কি রে! ও, তুই তো তখন পালিয়েছিলি। আচ্ছা, চল, বাড়ি গিয়ে বলবো। কী ভালো যে লাগলো আজ আমার। আমি তো ভাবছি পাঁচ-সাত দিন পরে আবার যাবো।'

'আজ্ঞে।'

'আবার আজ্ঞে করলে গুলি করবো তোকে। আমি বলছিলাম বুজরুকের উচিত ছিলো পিয়েত্রো যেমন গুলি করলো বাঘটাকে তেমনি গুলি করা।'

'হ্যাঁ হুজুর।'

রাজু রূপচাঁদের কথা বলার কায়দায় হেসে ফেললো, 'ভারি চালাক হয়েছিস তুই। বন্দুকটা একবার হাতে ক'রে দেখবি কেমন? বাড়ি গিয়ে কিন্তু এর গায়ে সিঁদুর লাগিয়ে প্রণাম করিস নে যেন।'

আর কয়েক পা এগুলে মাঠটা শেষ হবে। মাঠের প্রায় প্রান্তে একটি অশ্বত্থ গাছ। গাছটা প্রাচীন। তার তলায় তিনটি পথ এসে মিশেছে। একটি মরেলগঞ্জ, একটি রাজুদের গ্রাম, আর-একটি গেছে পিয়েত্রোদের আবাদের দিকে।

নিজেদের গ্রামের পথে উঠে রাজু বললো, 'কিন্তু শিকারে যাবার আগে নিশানা ঠিক ক'রে নিতে হবে। আজকের শিকারে তো একটা গুলিও চালাই নি। এর পরের দিন আর তা চলবে না। আচ্ছা, পাখি কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারিস? উড়ন্ত পাখির উপরে নিশানা করা অভ্যেস করতে হবে।'

নিজের ঘরের কাছে শিকার করলে এবং সে-শিকার যদি পাখি হয় তবে বোধ হয় রূপচাঁদের খুব একটা আপত্তি ছিলো না। সে বললে, 'আমাদের পুরনো বাড়ির পুকুরে বুনো হাঁস আসে এ-সময়ে, বনে হরতেল আসে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হয় তিতির আছে কিনা।'

রূপচাঁদের পুরনো বাড়ি— রাজুদেরই পুরনো বাড়ি। প্রকাণ্ড এই জীর্ণ ধ্বংসস্তূপটা এরা দু-পুরুষ আগে ত্যাগ ক'রে এই নতুন বাড়িতে এসে বাস করছে।

কথাটা শুনে রাজু খানিকটা সময় ভাবলো। পরে বললো, 'আজ

নিশানা নিয়ে ভারি এক মজার ব্যাপার হয়েছে। ময়েলগঞ্জের দেওয়ানের নৌকো আসছিলো। আমি কি আর তাই জানি। মস্ত বড়ো পাল। বুজরুক উড়ন্ত গাংশালিক মারলো বন্দুক দিয়ে। আমি কি আর তাই পারি, আমি পালটা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তেই একশ' হাত দূরে পালটা চড়চড় ক'রে ফেঁসে গেল গুলি লেগে। নৌকোটা কাত হ'য়ে পাশের ডুবো চড়ায় আটকে গেল। ও-নৌকো তুলতে দেরি আছে। কিন্তু নিশানা আমার খুব খারাপ নয়। ওদের মাস্তুলে বাঁধা নিশানটায় একটু নিশানা ক'রে গুলি মারতেই সেটাও প'ড়ে গেল।'

রাজু দৃশ্যটা স্মরণ ক'রে হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে বললে, 'কিন্তু যে-ক'টা গুলি পিয়েত্রোর কাছে পেয়েছি, এতে আর ক'বার নিশানা করা যাবে! গুলি কোথায় পাওয়া যায় জানিস?'

'পিয়েত্রোসাহেবের কাছে।'

'বার-বার তার কাছে চাওয়া যাবে না। সেটা লজ্জার ব্যাপার। বরং তার কাছে জেনে নিতে হবে কোথায় পাওয়া যায়।'

'কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি।'—কথাটা রূপচাঁদ বলে নি। পেছন থেকে কে যেন বললো। তখন প্রায় অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। পথের ধারে এ-জায়গাটাতেই অন্ধকার একটু বেশি হয়। পুরনো একটা শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে ঘিরে লতা ও আগাছায় রাস্তার বাঁ-দিকটাতে খানিকটা জায়গা অন্ধকার ক'রে রেখেছে। ডান-দিকে দু-তিনটি অত্যন্ত প্রাচীন বকুলগাছ। বকুলগাছ আর মন্দির বোধ করি সমবয়সী।

রাজু বিরক্ত হ'লো পথচারীর ব্যবহারে, কিন্তু আগ্রহও তার কম ছিলো না। সে বললো, 'কোথায় পাওয়া যায়?'

'ময়েলগঞ্জে। সেখানে গেলেই পাবেন। চলুন।'

'খবরটা জানা থাকলো।'—ব'লে রাজু ফিরে আবার পথ ধরলো।

কিন্তু লোকটির আগ্রহ রাজুর চাইতেও বেশি।

'আজ্ঞে না, শুধু খবর জানা নয়, যেতে একটু হবেই।'

'তা যাওয়া যাবে একদিন।'

'একদিন নয়, এখনই একবার যেতে হয়।'

রাজু মনে-মনে স্থির করলো, লোকটার বোধ হয় ছিট আছে। আর কথা না ব'লে রাজু পথ চলতে লাগলো।

কিন্তু লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়। সে বললে, 'কই, শুনলেন না? এখনই একবার যেতে হবে মরেলগঞ্জে।'

'তুমি কি পাগল?'

'যারা চলন্ত নৌকোর পালে গুলি ছুঁড়ে নৌকো বানচাল ক'রে দেয় তাদের চাইতে কম পাগল।'

'কি বললে কথাটা?'

'এমন কিছু নয়, আপনাকে এখনি একবার মরেলগঞ্জে যেতে হবে। নিশান দাগার গল্পটা সেখানে সবাই শুনতে চায়।'

লোকটির কথা বলার ধরন ভালো নয়। রাজু বিস্মিত হ'লো।

'তুমি বোধ হয় কার সঙ্গে কথা বলছো তা জানো না।'

'খুব জানা আছে। আপনি বোধ হয় জানেন না আমি কে। আমি মরেলগঞ্জের সদর-তহশীলদার চন্দ্রকান্ত সেন।'

রাগে রাজুর গা রি-রি করতে লাগলো।

'ভাব দেখে মনে হয় এখানেও তুমি তহশীলদারী করতে এসেছো। আমার সামনে থেকে স'রে যাও।'

'স'রে যেতে কি এসেছি! মরেলগঞ্জের দেওয়ানসাহেবের হুকুমে এসেছি। ভালো কথায় না যান তো যেতে বাধ্য করা হবে। কৈফিয়ত দিয়ে আসবেন মরেলগঞ্জের নৌকো বানচাল করার।'

'বদমাস কোথাকার!' রাজু দাঁতে দাঁত চেপে বললো।

'বদমাস আমি? না বদমাস—'

রাজু আর কথা বললো না। বন্দুকে গুলি ভ'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, 'তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তহশীলদার।'

'বাজে কথা বলবেন না।'

তহশীলদারের কথা শেষ হবার আগেই রাজু গুলি করলো। বন্দুকের শব্দ, আগুনের হল্‌কা, একটা অব্যক্ত আর্তনাদ। তহশীলদার মাটিতে প'ড়ে মাটি কামড়াতে লাগলো, মুঠ-মুঠ ক'রে মাটি চেপে ধরতে লাগলো। অতি সামান্য সময়। তারপর তার সেই বোবা কান্না স্তব্ধ হ'য়ে গেল। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় রক্ত বোঝা গেল না।

রূপচাঁদ ফিসফিস ক'রে বললো, 'খুন করলেন হুজুর, লোকটাকে!'

রাজু কথা বললে না।

রূপচাঁদ আবার বললো, 'শেষ হ'য়ে গেল যে!'

রাজুর মুখ দিয়ে বার হ'লো, 'মরেলগু।'

তারপর রাজু দ্রুত হাঁটতে লাগলো। রূপচাঁদ খানিকটা পথ রাজুর পেছন-পেছন গেল, তারপর হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পিয়েত্রোর আবাদের উদ্দেশ্যে ছুটলো।

রাজচন্দ্রর বাড়ির দরজায় তখন আলো জ্বলছে। কিছুদূর যাবার পরই আলো-হাতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে তার দেখা হ'লো। তারা রাজবাড়ি থেকে রাজচন্দ্রকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তাকে দেখে স'রে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু ক'রে তারা সম্মান জানালো, তারপর পথ আলোকিত ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে যেতে লাগলো। বন্দুকটা মুঠো ক'রে চেপে ধ'রে মাথা নিচু ক'রে রাজু নিঃশব্দে তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে চললো।

সদর-দরজা পেরিয়ে বাইরের চত্বর পার হ'তে-হ'তে রাজু দেখতে পেলো বাঁ-দিকের কাছারিঘরগুলি বন্ধ। আমলারা বাড়ি চ'লে গেছে। ডান-দিকে টবে সাজানো বিলেতি গাছ-গাছড়ার একটা ছোটো বাগান। বাগানটুকু পার হ'লে রাজুদের দেওয়ানের বাসা। রাজু দেখতে পেলো বাসার ঘেরা-বারান্দায় আলোর কাছে দেওয়ান ব'সে আছে।

কি মনে ক'রে সে দেওয়ানের কাছে যাবার জন্য বাগানটুকু পার হ'তে লাগলো। রোজ যে-জিনিসগুলো চোখে প'ড়েও পড়ে না, এখন সেগুলো খুব যেন স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়তে লাগলো।

তার মনে হ'লো, তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বললে, দেওয়ানের নাম হরদয়াল। লোকের মুখে-মুখে সে-নামটা কি ক'রে হৃদলাল হ'য়ে গেছে।

হরদয়াল একখানা আরামকেদারায় অর্ধশায়িত। তার গায়ে কাশ্মিরী শাদা পশমের চীনা কোট। পায়ের উপরে শাল ভাঁজ ক'রে রাখা। পাশে ছোটো একটা বিচিত্র কাজ করা টেবিলের উপরে ইংরেজি আলো। সেই উজ্জ্বল আলোতে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে সে।

রাজু আরও লক্ষ্য করলো, হরদয়ালের কানের পাশে আরও কিছু চুল পেকেছে, তার হাতের আংটির পাথরটা থেকে নীল রঙের একটা আলো দেখা দিচ্ছে। তার শালের পাড়ে যে-কল্কাগুলো আছে সেগুলো ঠিক কল্কা নয়, বল্লমের ফলার মতো দেখতে।

পায়ের শব্দে চোখ তুলে হরদয়াল বললো, 'বোসো। এ-পোশাকে তোমাকে বেশ মানায়।'

রাজু হঠাৎ জানু পেতে হরদয়ালের পাশে মাটিতে ব'সে পড়লো এবং যতদূর সম্ভব তার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ফিসফিস ক'রে বললে, 'খুন করেছি, একটা মানুষকে খুন করেছি।'

বই থেকে চোখ সরিয়ে হরদয়াল বললো, 'কি ? কি হত্যা করেছো ? মানুষ !'

কিন্তু তারপর রাজু আর দাঁড়ালো না। অন্দরের দিকে রওনা হ'য়ে গেল। হরদয়াল বই-এর উপর আবার চোখ পাতলো কিন্তু মন পাততে পারলো না। তার সন্দেহ হ'লো রাজু মদ খেয়েছে। পিয়েত্রোটা যা মাতাল তাতে তার সংস্পর্শে এলে মাতাল হ'তেই হবে। ঘৃণা হ'লো হরদয়ালের। তীব্র একটা তিরস্কার তার মনে জমা হ'লো। কিন্তু আলোটার দিকে চেয়ে ভাবতে-ভাবতে ম্লান আলোয় দেখা রাজুর বিবর্ণ মুখটা দেখতে পেলো যেন আবার।

হরদয়ালকে উঠতে হ'লো। চটিটা পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানটা পার হ'য়ে অন্দরের দিকে চললো সে।

অন্দরের পথে পা দিতেই একটি দাসীর সঙ্গে দেখা হ'লো হরদয়ালের। মোটা থান-কাপড় পরা মলিন চেহারার দাসীটিকে দেখে হরদয়াল বললো, 'রানিমা কোথায় তোদের ?'

দাসী বললো, 'দয়াল ? আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

'কি ব্যাপার রানি ? রাজুর কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সে কি নেশা করেছে ?' হরদয়াল রানিমাকে চিনতে পেরে বললো।

'ঘরে এসো, বলছি।'

ঘরে গিয়ে হরদয়াল প্রশ্ন করলো, 'এমন অবস্থায় কোথায় যাচ্ছেন ?'

'শুনেছো, রাজু একটা মানুষ খুন করেছে ? সে আবার নাকি মরেল-গঞ্জের দেওয়ান মনোহর সিং-এর লোক। কি হবে ?'

'রাজু নেশা করে নি তো ? নেশার ঝোঁকে বলছে না তো ?'

'না। নেশা করেছে ব'লে মনে হয় না। কি হবে এখন, তাই বলো। ইংরেজ দেশের রাজা।'

'উপায় এখন প্রমাণগুলো দূর করা। রাজুর যে-রকম মানসিক অবস্থা দেখলাম, সে আর-কাউকে বলেছে কিনা কে জানে।'

'রাজু বলছে, রূপচাঁদ জানে, তুমি জানো, আর আমি।'

'প্রমাণগুলো দূর করতে গেলে আরও অনেকে জানবে। তা না-জানিয়ে উপায় দেখছি না। রূপচাঁদ কোথায় ?'

'সে রাজুর সঙ্গে ফেরে নি।'

দু-জনে কিছুটা সময় চিন্তা করলেন।

হরদয়াল বললে, 'আমার প্রতি কি হুকুম ?'

'আচ্ছা, তুমি তোমার ঘরে যাও। আমি আর-একটু খোঁজ-খবর নিই। রাজুর কথাটাকে আর-একটু যাচাই করি। জেগে থেকো।'

'তাই দেখুন।'

হরদয়াল নিজের ঘরের দিকে ফিরে চললো চিন্তা করতে-করতে।

॥ দুই ॥

পিয়েত্রোর কাছে রূপচাঁদ যখন খবরটা পৌঁছে দিলো তখন বুজরুক দাদনের হিসেব নিয়ে মশগুল।

পিয়েত্রো তাকে ডেকে নিয়ে ফরাসীতে কি বললো। রূপচাঁদ এক বর্ণও বুঝলো না, কিন্তু বুজরুকের চোখ দুটিতে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো, সেটা সে লক্ষ্য করলো। আরও কিছুক্ষণ তারা রূপচাঁদের অবোধ্য ভাষায় কি আলাপ করলো, তারপর বুজরুক বললে, 'তুমি ভাঙ খেয়েছিলে রূপচাঁদ। ব্যাপারটা আর-কিছু নয়। আর কাকে-কাকে বলেছো?'

'আর কাউকে নয়।'

'বেশ করেছো। তুমি এখানে দৌড়ে এসেছো, একটু বিশ্রাম করো। আমরা দেখে আসি ব্যাপারটা কতদূর। আমরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত যেও না কোথাও।'

রাত্রির পথ। ঘোড়া নয়, হাতি অনেক বেশি নির্ভরশীল, ছোটো খানাখন্দয় পা প'ড়ে খোঁড়া হবে না। তার নিজের হাতিটায় একটা গদি বসিয়ে নিয়ে বুজরুক যখন সেটা নিজেই চালিয়ে নিয়ে উপস্থিত হ'লো তখন পিয়েত্রোরও পোশাক পরা শেষ হয়েছে।

তারপর রাত্রির অন্ধকারে হাতি তার দ্রুততম গতিতে ছুটে চললো। অঙ্কুশের আঘাতে নয়, হাতির কানের পেছনে বুজরুকের পায়ের আঙুল গতি নির্দেশ করছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দে তবু তার গতির পরিচয় পাওয়া যায়, হাতির গতি প্রায় নিঃশব্দ। একেবারে পথের ধারে না দাঁড়ালে শব্দে কেউ গতির ঠিকানা করতে পারবে না।

শিব-মন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে বুজরুক ফিসফিস ক'রে বললে, 'অনেকটা জায়গায় খুন ছড়িয়ে আছে।'

বুজরুক প্রেতে বিশ্বাস করতো না, পিয়েত্রোও নয়। কিন্তু মৃতদেহের

কাছে এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়লে অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ও ঢুলে ওঠে। পিয়েত্রো ও বুজরুক সবিস্ময়ে দেখলো, কে একজন অবগুণ্ঠনবতী দাঁড়িয়ে আছে মৃতদেহটার পাশে। অবগুণ্ঠনবতী পথের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু হাতির চলার শব্দে চকিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পিয়েত্রো ও বুজরুক হাতি থেকে নামলো। পরামর্শ আগেই করা ছিলো। মৃতদেহটাকে বুজরুক হাতির উপরে তুলে নিলো। এবং পরক্ষণেই হাতি বুজরুককে নিয়ে অস্পষ্ট পথে উধাও হ'য়ে গেল। পিয়েত্রো ধীরে-ধীরে নিজের বাড়ির পথ ধরলো।

কিন্তু তখনও এ-দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে নি। পিয়েত্রো শুনতে পেলো, কে তাকে পেছন থেকে ডাকছে।

'শুনুন।'

দ্বিতীয়বারও পিয়েত্রো আহ্বানটি শুনতে পেলো। পিয়েত্রো থামলো, ফিরে দাঁড়ালো, দেখতে পেলো একটি অবগুণ্ঠনবতী নারী তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ম্লান আলোয় অবগুণ্ঠনবতীর মুখাবয়ব বোঝা গেল না। তার দেহবর্ণ যে অত্যন্ত পরিষ্কার, তার মাথার চুল যে অজস্র এবং তার দারিদ্র্য যে দুঃসহ তা বোঝা গেল। ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, নিরাভরণ হাত, কুণ্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে সেই নারী, তবু অপ্রকৃত বোধ হ'লো পিয়েত্রোর কাছে। যেন সে কেউ নয়, শুধু দৃষ্টির বিভ্রম, কথা বলতে গেলেই মিলিয়ে যাবে।

পিয়েত্রো বললে, 'কি চাও তুমি?'

'আপনি কে তা আমি জানি, এখানে এসেছিলেন কেন তাই জানতে চাইছিলাম।'

'কেন, তা তুমি বুঝতে পেরেছো। এখন বললেও দোষ নেই। মৃতদেহটা এতক্ষণে সকলের নাগালের বাইরে পৌঁছে গেছে।'

'আপনি কি কাজটি সৎ উদ্দেশ্যে করলেন?'

পিয়েত্রো একটু হেসে বললো, 'উদ্দেশ্য একটা ছিলো, সৎ কি অসৎ কি ক'রে বলি।'

'রাজচন্দ্রকে আপনি অবশ্য স্নেহ করেন।'

'সে আমার বন্ধুর ছেলে। কিন্তু তুমি কে? আমার মনে হচ্ছে তোমার দারিদ্র্য ছদ্মবেশ। দারিদ্র্য মানুষকে এমন নিঃশঙ্ক করে না।'

'আমি একজন দরিদ্র গ্রামবাসী। আচ্ছা, আমি আসি।'

অবগুণ্ঠনবতী পেছন ফিরে চলতে শুরু করলো। পিয়েত্রো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকে খানিকটা সময় দেখলো।

রানী পিয়েত্রোর থেকে দূরে এসে দ্রুত চলতে লাগলেন। দাসীর ছদ্মবেশে নিজের বাড়ির সিংদরজার বাইরে যে-রানী অন্ধকার রাত্রির পথে এতদূর এসেছিলেন, আর যিনি এখন ফিরে চলেছেন, দু-জন যেন এক নয়। ভয় ঠিক নয়, কেমন একটা স্নায়ুপীড়া অনুভব করছেন তিনি।

কাছারি পার হ'তে-হ'তে রানী দেখতে পেলেন ঘরের বারান্দায় আলো জ্বালিয়ে হরদয়াল ব'সে-ব'সে তখনও পড়ছে।

বাগানটুকুর এ-পার থেকে রানী তাকে ডাকলেন। কাছে এলে রানী ঘটনা বর্ণনা ক'রে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয় না পিয়েত্রো প্রমাণ গোপন করার জন্যই এমন করেছে?'

'তাই তো মনে হয়। কিন্তু রানি, আপনি নিজে গিয়েছিলেন? আপনারও উদ্দেশ্য ছিলো পিয়েত্রোর মতো। অথচ আমাকে বললেন খবর নিতে হবে।'

'তুমি সঙ্গে যাও এটা আমি চাই নি।'

'এখন তা বুঝতে পারছি।'

'কাজটা কি আমি অন্যায় করলাম, হরদয়াল?'

'অনেক সময়ে আপনার কাজকে আমি অন্যায় মনে করেছি। কিন্তু আজ বোধ করি আমার বেশি রাত জাগার ফলেই একটু অদ্ভুত বোধ হচ্ছে ব্যাপারটা। নরহত্যা নতুন নয়। কিন্তু রানীর পক্ষে এই অভিযানটির তুলনা পাচ্ছি না আমি।'

'সন্তানকে রক্ষার চেষ্টা সব মাকেই কখনো-না-কখনো করতেই হয়।'

'তা হয়। কিন্তু আজ সহসা আমার একটা চরিত্রকে মনে প'ড়ে গেল যেটি কাব্যে প্রায় অবহেলিত। তিনি হচ্ছেন আমাদের কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র ঐশ্বর্যময়ী বিধবা, যিনি স্বামীর অবসানের পরও অনেকটা সময় দীপ্তিমতী ছিলেন। ভীমার্জুন আদিকে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তিনি কুন্তী। তাঁকে শোক করতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। তাঁকে শাপ-শাপান্ত করতেও শুনেছি ব'লে মনে হচ্ছে না। অথচ পঞ্চনায়কের পেছনে তাঁর ধীর মূর্তিটা চোখে পড়ে কখনো-কখনো।'

রানীর চোখে-মুখে লুকনো হাসি বিচ্ছুরিত হ'লো। (তখন তাঁর চল্লিশ হ'তে হয়তো দেরি আছে এবং তিনি স্থিতযৌবনা।)

রানী বললেন, 'স্তাবকরা এ-রকম ব'লে থাকে।'

হরদয়ালের স্বভাবস্নিগ্ধ মুখখানা ঈষৎ বিবর্ণ হ'লো।

কিন্তু রানী পরক্ষণেই শান্ত গলায় বললেন, 'এখনও কিছু কাজ আছে হরদয়াল। রূপচাঁদ এখনো ফেরে নি। তার জন্য অপেক্ষা করার বোধ হয় দরকার নেই। কিন্তু অনুসন্ধান নিশ্চয়ই হবে এবং সে-সব প্রশ্নের উত্তর তোমাকেই দিতে হবে। ভেবেচিন্তে রেখো। আমি যাই, একটু স্নানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি।'

চলার উপক্রম ক'রে রানী বললেন, 'যদি তোমার কুন্তী ব'লে রানীকে সম্মান করতে সাধ যায়, আমি আপত্তি করবো না, হরদয়াল।'

রানী চ'লে গেলেন।

॥ তিন ॥

রোহিণী শুনেছিলো তার স্বামী কার্যোপলক্ষে রাজচন্দ্রর গ্রামে এসেছে। তারপর আর তাকে পাওয়া গেল না। এ-গ্রামে এসে খোঁজ করার আগে কুঠির দেওয়ানখানায় সে খোঁজ নিয়েছিলো। তারাও অনুসন্ধান ক'রে পায় নি।

এ-গ্রামে এসে প্রথম দেখা হ'লো তার রূপচাঁদের সঙ্গে। অবশ্য উভয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

নিচু স্তরের স্ত্রীলোক নয়। অথচ এমন অকুণ্ঠিত ভাবে আলাপ করতে রূপচাঁদ কাউকে ত্যাখে নি। স্বভাবতই রূপচাঁদ স্ত্রীলোকটির প্রতি শ্রদ্ধালু হয়েছিলো। কিন্তু তার অনুসন্ধানে রূপচাঁদ ভীত হ'য়ে প্রথম সুযোগেই পালিয়ে বাঁচলো। তথাপি খবর ছড়িয়ে পড়ার আগে হরদয়ালের কাছে সে খবর দিলো স্ত্রীলোকটির।

হরদয়াল তার খাতাপত্র থেকে মুখ তুলে বললো, 'তামাক সাজ।'

অনেকক্ষণ ধ'রে তামাক খেলো হরদয়াল কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি বললো না।

সে স্থির করলো স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হ'তে দেওয়া চলবে না। তার মুখের উপর বলা যাবে না— আমি জানি না।

রূপচাঁদ ছটফট করছিলো, খবরটা হজম করার সাধ্য ছিলো না তার। অবশেষে রানিমা জানলেন। রোহিণী চোখের কাপড় সরিয়ে বললে, 'আমি আশ্রয়হীনা নই, কিন্তু কি মূল্য সে-আশ্রয়ের ? আমি কি করবো ?'

রানী বললেন, 'স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে এখানেই থাকতে দিতে পারতাম। কিন্তু জানো কি, সেই সুবাদে কুঠিয়ালদের সঙ্গে কোনো পরিচয় হয় তা আমি চাই না। আর আশ্রয়ের কথা বলছি এই জন্যে, বয়েস তোমার ভালো নয়।'

রোহিণী বললো, 'আপনি একটু খোঁজ-খবর করুন, রানিমা, আমার হ'য়ে।'

এবার রানীকে একটু ভাবতে হ'লো উত্তর দেওয়ার আগে। একটু পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'যদি খুঁজে পাওয়ার হয় খবরও পাবে তুমি। আর যদি কোনোদিন সংসার চালাতে অসুবিধে হয়, আমাকে খবর দিও।'

রোহিণী চ'লে গেলে রানী বললেন রূপচাঁদকে, 'তোমাদের কুমারের কাছে যেন মেয়েটি কখনো না যায়।'

এর পরে এল সদর থেকে ডেপুটি কালেক্টর। ছোটোখাটো রাজসূয় ব্যাপার একটা ঘ'টে গেল। ডেপুটি আসার সাতদিন আগে খবর এল ডেপুটি আসছে। নদীর ধারে গঞ্জের ঘাটের কাছে ছোটো একটি মাঠ ছিলো। তার উপরে তাঁবু পড়লো গোটা তিন-চার। কোনোটি সাহেবের খাস-কামরা, কোনোটি অফিস, কোনোটিতে রসুইখানা। মরেলগঞ্জের কুঠির তরফ থেকে স্বয়ং দেওয়ান মনোহর সিং তদ্বির তদারক করছে, সকাল-বিকেল হাতি নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। ইতিমধ্যে ডেপুটিসাহেব দু-বার কুঠিতেও গিয়েছিলো।

তৃতীয় দিনে পেয়াদা এল রাজচন্দ্রর বাড়িতে। ডেপুটিসাহেব স্মরণ করেছে।

খবরটা এসেছিলো হরদয়ালের হাতে।

'তা বটে। আশঙ্কা এ-রকমই করা গিয়েছিলো এ-ব্যাপারে।' —এই হ'লো হরদয়ালের স্বগত উক্তি।

চুনট-করা অতিসূক্ষ্ম ধুতি, জরিদার চাপকান, তার উপরে কল্কাদার শাল, মাথায় শামলা, পায়ে পাম্প-জাতীয় ঝকঝকে জুতো প'রে ষোলো

বেহারার পালকিতে চ'ড়ে হরদয়াল ডেপুটির তাঁবুর দিকে রওনা হ'লো। পেছনে দু-জন সামনে দু-জন চোপদার ছুটতে লাগলো।

তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত রেখে ডেপুটিসাহেব বায়ু গ্রহণ করছিলো। চোপদারদের ঝলমলে পোশাক ও ছটা দেখে ডেপুটি অনুমান করলো, কেউকেটা কেউ আসছেন, বোধ করি রাজকুমার।

ডেপুটি কড়া মুখ ক'রে তাঁবুতে প্রবেশ করলো।

হরদয়াল এর আগে সদরে ডেপুটিদের এজলাসে মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে গিয়েছে। কিছুদিন আগেও এক ফিরিঙ্গি ডেপুটি ছিলো এ-জেলায়। হরদয়াল ফিরিঙ্গিদের চেনে, তাদের ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে তার ধারণা আছে। সে জানতো তাদের সঙ্গে দু-রকম ব্যবহার করা যায়: পালটা ঔদ্ধত্য কিংবা বিনয়। মাঝে-মাঝে অত্যন্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন ফিরিঙ্গির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দুর্বিনীত।

হরদয়াল তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালী পেশকারকে দেখতে পেলো। বাংলায় কথা বলতে পারতো, কিন্তু তা না ব'লে ইংরেজিতে যা [illegible] তার ইডিয়মগত অর্থ— ডেপুটি-কালেক্টরকে আমার আগমন জানাও।

কিছুক্ষণ পরে ডেপুটির খাস-তাঁবুতে হরদয়াল প্রবেশ করলো।

ডেপুটি বাঙালী। হরদয়ালকে বসতে ব'লে জিগ্যেস করলো, 'আপনি কি রাজকুমার?'

'না, আমি তাঁর কর্মচারী এবং আমমোক্তার।'

'আপনি কি জানেন চন্দ্রকান্ত সেন নামে মরেলগঞ্জের কুঠির কোনো একজন কর্মচারী গুমখুন হয়েছে?'

'এ-রকম সংবাদ আমি জানি না।'

'আপনি কি জানেন রাজকুমার পিয়েত্রো নামক এক ফরাসীর সঙ্গে ঘটনার দিন শিকারে গিয়েছিলো?'

'ঘটনাটা কি, তাই যখন জানি না তখন ঘটনার দিনে আর কি ঘটেছিলো কি ক'রে বলা যাবে। তবে রাজকুমার কিছুদিন আগে শিকারে গিয়েছিলেন এ-কথা সত্য।'

'শিকারে যাবার আগে মরেলগঞ্জের একখানি স্লুপকে সে বন্দুক ছুঁড়ে দখল করার চেষ্টা করে।'

'এ-খবর রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু বলা যাবে না।'

'কিন্তু পিয়েত্রোর অনুচরদের আমি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি ব্যাপারটা ঘটেছিলো। তার বন্দুকের গুলি লেগে স্লুপের পাল ছিঁড়ে যায় এবং চলন্ত অবস্থায় নৌকোটা একটা ডুবো-চরে আটকে বানচাল হবার উপক্রম হয়েছিলো। তার পরেও ইউনিয়ন জ্যাককে গুলি ক'রে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।'

'এ-সব খবর আপনি যখন নির্ধারণ করেছেন তখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করা কি দরকার!'

ডেপুটি হুঁকাবরদারকে তামাকু দিতে বললো। তামাক সেবনের পরে সে বললো, 'আমরা দু-জনে এতক্ষণ ইংরেজি ভাষায় কথা বললাম। আপনার ইংরেজি শুনে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। আপনি কি হিন্দু কলেজের?'

'না, কলেজে পড়া আমার হয় নি। তবে হেয়ারের সঙ্গে এক-সময়ে আমার পরিচয় ছিলো। আপনি হেয়ারের ছাত্র?'

ডেপুটি উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য। সমুদ্রের গভীরে রত্নখনি, এই রাজ্যে আপনাকে পাবো ভাবতেও পারি নি। আপনি কি ব্রাহ্ম?'

'না। তবে রাজা রামমোহনকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।'

'আরে শুনেছেন মশাই, শুনেছেন হীরার কাহিনী! সে এক কেচ্ছা।'

'কোন্ হীরা ?'

'হীরা বুলবুল।'

'কি হয়েছে তার ?'

'তার এক ছেলেকে কলেজে ভর্তি করা নিয়ে কলকাতার জ্ঞানী গুণীরা দু-ভাগ হ'য়ে গেছেন। এডুকেশন কাউন্সিল বলছে তাকে কলেজে ভর্তি করতে হবে, আর কলেজের গভর্নিং-বডির কিছু সভ্য বলছে, বাইজীর ছেলেকে কলেজে ভর্তি করলে ভদ্রলোকের ছেলেরা কলেজে পড়বে না, পড়া উচিত নয়।'

'তারপর ?'

'রাজু দত্ত নতুন কলেজ খুলেছে, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। গভর্নিং-বডির অনেক সভ্য পদত্যাগ করেছে। ক'দিন চলবে কলেজ কে জানে।'

আধুনিক কলকাতার খবর নিয়ে আরও কিছুটা সময় দু-জনের আলাপ হ'লো। ইতিমধ্যে ডেপুটিসাহেবের পিপাসা পেয়েছিলো। স্যাম্পেন এল।

'চলবে নিশ্চয় ?'

'তা চলুক।'

স্যাম্পেন চলতে-চলতে কথা হ'লো আরও কিছুটা সময়। ডেপুটি কাজের কথায় ফিরে এসে বললো, 'তা হ'লে, একটা ব্যাপার কিন্তু আমাকে নোটিসে নিতে হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই সত্যি যে, স্লুপটা গুলির আঘাতেই বেচাল হয়েছে এবং সে-গুলি চলেছিলো পিয়েত্রোর হাওয়াখানা থেকে। আমি পিয়েত্রোর গ্রামেও যাবো তদন্তে। আপনাকে রেজাল্ট্ জানাবো।'

'যদি রাজকুমারের দোষ প্রকাশ হয়, কি হ'তে পারে ?'

'হ'তে কিছু পারে। স্লুপের জন্য ভাবি না। বিটউইন ইউ অ্যাণ্ড মি, আমি মশাই এতে খুশি হয়েছি। ব্লাডি নীলকর ! আর মশাই এটা

তো কোনো বিচারই নয়। ওরা ব্ল্যাক অ্যাক্ট ব'লে চ্যাঁচাবে আর আমরা ব্ল্যাক ম্যানদের সাজা দেবো! সেই পুরনো কথা। নীলকরদের এত বাড় সহ্য করা যায় না। কিন্তু মুস্কিল ওই ইউনিয়ন জ্যাক নিয়ে। সেটার অপমান হয়েছে। কিছু শাস্তি হবে।'

'ফাইন ?'

'কালেক্টর লোক ভালো। ফাইনে নিষ্পত্তি করলেও করতে পারেন।'

হরদয়াল বললো, 'আমি এ-বিষয়ে একটু আলাপ-আলোচনা ক'রে পরে আপনাকে জানাবো।'

হরদয়াল অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছিলো। রাজুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে সে জানতে পেরেছিলো রাজু গুলি ক'রে পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে। অন্যায় বৈকি। রাষ্ট্রীয়শক্তির প্রতীককে অপমান করা। অন্য দিকে, রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীক নীলকররা ব্যবহার করছে, এটাই বা অন্যায় নয় কেন ?

কিন্তু ব্যাপারটা সহসা অন্য দিকে ঘুরলো।

একদিন সকালে যখন হরদয়াল এবং ডেপুটি শ্যাম্পেনের গ্লাসের চর্যে হেয়ার ও ডিরোজিও থেকে রিচার্ডসনের যুগে এসেছে এবং হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্ররা রিচার্ডসনকে পেয়ে ধন্য হয়েছে কিনা আলোচনা করছে— বুজরুক আলি এল তার তাজিয়া ঘোড়ায় চেপে। সোনা চাঁদি জরি ইস্পাত মসলিনের সমন্বয়ে অপূর্ব পরিচ্ছদ। মাথার কামদার পাগড়ির কুল্লা এত উঁচু যে তাঁবুর ছাদে বার-বার লেগে যাচ্ছে। সোনা ও কালোয় চিত্রিত একটা বাঘ যেন।

ডেপুটি বললে, 'আপনার কথার সত্যতা বিচার করবো কি ক'রে ?'

'আমার ইমানদারি। আমি পাঠান। আমার নাম বুজরুক আলি খান লোদি। আমার ইমানদারি জিম্মা আছে হজরত মৈনুদ্দিন চিশতির রহমতের কাছে।'

'কিন্তু—'

বুজরুক অট্টহাস্য ক'রে বললো, 'একটা নাবালক ছেলে কখনো অন্যায় করতে পারে, ফিরিঙ্গি কাজিসাহেব? আমি তাকে বলেছিলাম নিশানা দাগতে, নাবালক ভুলক্রমে নিশানকেই মেরে দিলো।'

'আপনি জানেন এর ফল কি হ'তে পারে?'

'কয়েদখানা।'

'আপনি তার জন্য প্রস্তুত?'

'উপায় কি। তরোয়াল আর বন্দুক নিয়ে এ জমানায় আত্মহত্যা করতে পারি, আর-কিছু নয়।'

'আচ্ছা, আপনাকে আমি পরে ডাকবো।'

বুজরুক আলি চ'লে গেল। ডেপুটি বললে, 'নৈতিক দায়িত্ব বেশ জোর দিয়ে স্বীকার করছে লোকটি। তবে তাতে কাজের দায়িত্ব দূর হচ্ছে না। কিন্তু লোকটি কি সবটুকু সত্য বলছে?'

হরদয়াল বললে, 'সবটুকু সত্যের মূল্য দিতে আমরা পারি না। ধরুন, সত্যি যদি নীলকরের স্লুপের মাথায় ওড়ানো ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকাকে ওরা নষ্ট ক'রেই থাকে তবে সবটুকু সত্য বলতে গেলে কি এ-ও বলতে হয় না যে, ওরা একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছে মাত্র? নীলকরের কি নৈতিক অধিকার আছে অন্যায়ের জাহাজে রাষ্ট্রীয় পতাকা স্থাপন করার? সে তো তার রাষ্ট্রের প্রতিভূ নয়। সে শুধু চায় তার রাষ্ট্রের অস্ত্রবলের ভয় দেখিয়ে পদ্মার বুকে অন্যায়ের জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে। পর্তুগীজ হারমাদদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? সেই সব হারমাদদের যারা জব্দ করেছিলো তারা কি অন্যায় করেছে? না। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে মরেলকে জব্দ করাও অন্যায় হয় নি। কিন্তু এই অন্যায়কে অন্যায় বলা যাচ্ছে না। মরেল-হারমাদদের সমর্থন করছে

কলকাতার কিছু লোক। সবটুকু সত্য বলাও ভালো নয়, শুনেও ফল হয় না।'

মৃত্যু—এই বিষয়টি যে-বয়সে অবিশ্বাস্য থাকে সেই বয়স রাজুর। তার জ্ঞান হওয়ার পর কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটে নি তাদের বাড়িতে। মৃত্যু তার অপ্রত্যক্ষ ছিলো।

শিকারের বাঘ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মৃত্যুও সে ছাখে নি। বাঘের মৃত্যুর ব্যাপারটা যেন একটা দ্রষ্টব্য কিছু। যেন একটি ঝড়, কিংবা একটা মহীরুহের ধ্বংস। তাদের বাগানে বড়ো-বড়ো গাছ কাটার সময়ে খবর পেলে রাজু এর আগে বাগানে গিয়ে দৃশ্যটা অনুভব করেছে। মড়্‌মড়্‌ ক'রে যখন কর্তিতশাখা বনস্পতি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন মনটা একটু ফাঁকা হ'য়ে যায় বটে।

কিন্তু বাঘও নয়, বনস্পতিও নয়, কেউ এমন ক'রে ডুবন্ত মানুষের মতো মুঠ্‌মুঠ্‌ ক'রে মাটি ধরার চেষ্টা করে না, কোনো ক্ষেত্রেই এমন একজোড়া চোখ রাজুর চোখের উপর নালিশ জানানোর মতো, প্রায় শিশুর মতো সাহায্য চাওয়ার ভঙ্গিতে স্থাপিত হয় নি। ইতিমধ্যে একদিন তার মায়ের ঘর থেকে নিজের ঘরে আসতে-আসতে প্রায়ান্ধকার বারান্দাটিতে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, তার চোখে জল এসেছিলো সহসা।

হত্যা অপরাধ কিনা, তার জন্য শাস্তিবিধান হয় কিনা, হ'লে সে-শাস্তি কত বড়ো, এ-সম্বন্ধে রাজুর কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিলো না। এ-বিষয়ে কারো আলোচনা সে শোনে নি। তার চিন্তায় নিজের জন্য ভয় ছিলো না। রূপচাঁদই পার্থক্যটা সূচনা করলো প্রথম। যে এতদিন প্রায় খেলার সঙ্গী ছিলো, তার ব্যবহারে কি ক'রে একটি সসম্ভ্রম ভয় এসে

গেছে। রাজু তার নিজের ঘরে ব'সে থাকলে আগেকার মতো রূপচাঁদ সরাসরি ঘরে চ'লে আসে না।

রানীর হৃদয় অপরিসীম। রাজু যখন তাঁর বক্ষলগ্ন হ'য়ে থাকতো, তখন যেমন এখনও তেমনি— সে তাঁর মনের সীমা পায় নি। প্রথম দিনের সকালেই রানী তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন, 'কাউকে বলিস নে।' রাজুর প্রতি তাঁর ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে বললে ঠিক বলা হয় না। সে অসুস্থ হ'লে তাঁর ব্যবহারে যেমন স্নেহকাতরতা স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, যেন রাজু অসুস্থ।

লেখাপড়া, খেলাধুলো নয়; আস্তাবল-পিলখানা পরিদর্শন, বাগ-বাগিচার তদ্বির, অর্থী-প্রার্থীদের আবেদন রানীর পাশে ব'সে শোনা— এই ছিলো তার প্রাত্যহিক কাজ। ঘটনাটির পর থেকে সবগুলো নিরর্থক হ'য়ে গেছে।

রাজবাড়ির মধ্যে যেমন, গ্রামের পথেও তেমনি সে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। যে-ঘটনাটি সব সময়েই মনে প'ড়ে যায়, সেটা কাউকে বলতে ইচ্ছা করে। দু-তিন দিনের মধ্যে তার দৃষ্টিতে একটা গাম্ভীর্য এসে গেছে।

একদিন যেমন সহসা তার চোখে জল এসে আরও কয়েকবার অশ্রু আসার পথ ক'রে দিয়েছিলো, তেমনি গ্রামের পথে ঘুরতে-ঘুরতে একদিন সে হেসে ফেললো। স্বচ্ছ হাসি নয়, মরিয়া হওয়ার হাসি।

একদিন রাজু বললো রূপচাঁদকে, 'তুই কথা বলতে জানিস না। কথা বলার কায়দাও কষ্ট ক'রে শিখতে হয়। তেমন লোক পাওয়া যায় না রে?'

এমনি অবস্থায় নয়নতারার সঙ্গে রাজচন্দ্রর দেখা হয়েছিলো।

তারপর। ডেপুটির বিচারে বুজরুক আলির পুরো এক বছর জেল হ'লো। রাজচন্দ্রর দু-হাজার টাকা ফাইন হ'লো। বুজরুক আলি জেলে গেল। তার তরোয়াল বন্দুক ঘোড়া কয়েদখানার দরজা থেকে নিয়ে এল রূপচাঁদ। হরদয়াল নগদ টাকা গুনে দিয়ে রাজচন্দ্রকে সঙ্গে ক'রে এজলাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখলো, কিছু দূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে পিয়েত্রো ঘন-ঘন নস্য নিচ্ছে।

চন্দ্রকান্তর মৃত্যু-ব্যাপারটার কোনো হদিস হ'লো না।

॥ চার ॥

নয়নতারাকে তার দাদার সংসারে যে দেখেছে আর এখন যে দেখবে সে-দু-জনের বর্ণনা শুনলে নয়নতারাকে একই ব্যক্তি ব'লে মনে হবে না। তার দাদা ন্যায়রত্নমশাই-এর চতুষ্পাঠী ছিলো গ্রামে। ছাত্রসংখ্যা নগণ্য। বরং ফার্সির পাঠশালায় ছাত্র পাওয়া যেতো সে-সময়ে। ন্যায়রত্নমশাই কি রকম লোক ছিলেন তা গ্রামের লোকের এখন মনে নেই। তাঁর দু-একটা সদ্‌গুণের কথা শোনা যায় এর-তার মুখে, কিন্তু সে-সব সদ্‌গুণের সমষ্টিই একটি চরিত্র-গঠনে পর্যাপ্ত নয়। আর-দশজন সম্বন্ধেও সেগুলো প্রয়োগ করা যায়।

ন্যায়রত্নের যখন মৃত্যু হ'লো তখন তাঁর যুবতী স্ত্রীও সহমরণে যাবার জন্য প্রস্তুত। তার কিছুদিন আগে আর-একটা ঘটনা থেকে গ্রামবাসীদের জানা ছিলো যে সহমরণে গেলে মৃতের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে এবং জেলার কালেক্‌টরের কাছে গিয়ে তার অনুমতি আনতে হবে।

ন্যায়রত্নবধূ সব শুনে আত্মীয়স্বজনকে কিছু বললেন না, নয়নতারাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে ফিসফিস ক'রে বললেন, 'একটা ফুলের মালা গেঁথে আনো আমার জন্যে।'

নয়নতারা দাদার মৃত্যুতে যন্ত্রের মতো বিচারশক্তিহীন হ'য়ে গিয়েছিলো। তখনই সে মালা গাঁথতে চ'লে গেল।

মালা নিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে দেখেছিলো, পরিষ্কার একটা শাড়ি প'রে, চুলগুলি টান-টান ক'রে বেঁধে ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে ন্যায়রত্নবধূ ব'সে আছে। মুখে-চোখে কান্নার ময়লা নেই, ধুয়ে-মুছে প্রসাধনের যতটুকু সম্ভব নিখুঁতভাবে তা করেছে। চোখ দুটো বন্ধ, ছোটো দেহটা থরথর ক'রে কাঁপছে, ঠোঁট দুটো নীল, একটু যেন দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

নয়নতারার ডাকে চোখ দুটো ঈষৎ খুলেছিলো, তারপর ন্যায়রত্নবধূর দেহটা লুটিয়ে পড়লো। বিষ! নিঃসন্দেহে সূচিকাভরণের জন্য সযত্নে রাখা বিষ। নয়নতারার প্রথমে মনে হ'লো, আর-একবার চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে, কিন্তু একেবারে নীরব হ'য়ে গেল সে। হাতের মালাটা বৌদির গলায় পরিয়ে দিলো। পায়ে আলতা দিলো, কপালে সিঁদুর। তার পরে পাড়ার লোকদের বললো, 'বৌদি সূচিকাভরণের বিষে আত্মহত্যা করেছেন।'

গোলমাল তখনই মেটে নি। আত্মহত্যা আর সহমরণ একই কিনা এই নিয়ে তর্কবিতর্ক উঠেছিলো। ঠিক এমন সময়ে পালকিতে চেপে এসেছিলেন একজন। কেউ বলে, রানিমা স্বয়ং— কেউ বলে, তাঁর প্রেরিত আর-কেউ। তিনি এসে নয়নতারাকে প্রবোধ দিলেন। তারপর এল রাজবাড়ি থেকে বারো জন ব্রাহ্মণ। তারা রাজবাড়ির সেরেস্তার কর্মচারী। প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলে যে-সব ব্রাহ্মণ তখন আলাপ-আলোচনা করছিলো তাদের উপেক্ষা ক'রে ন্যায়রত্নদম্পতির দেহ সংকারের জন্য নিয়ে গিয়েছিলো তারা।

সে-ঘটনাগুলির অনেক খুঁটিনাটি ভুলে গিয়েছে নয়নতারা কিন্তু শেষ মুহূর্তে মালা গেঁথে আনার আদেশের একটি শব্দও সে বিস্মৃত হয় নি, এমন কি তার উচ্চারণটাও সে যেন এখনও শুনতে পায়, যেমন সে দেখতে পায় তার ভ্রাতৃবধূর স্থির হ'য়ে ব'সে থাকার ভঙ্গিটি। দেহটা থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিলো। এখনও মাঝে-মাঝে নয়নতারার মনে হয়, তখন বোধ হয় বিষক্রিয়ার শেষ অবস্থা, জ্ঞান লোপ পাবারই কথা, তবু মনের ক্ষীণতম অংশকে জাগ্রত ক'রে রেখেছিলো সে নয়নতারার ডাক শোনার জন্য।

তখন নয়নতারা আর-দশটি মেয়ের মতোই ছিলো, শুধু প্রতিবেশীদের তুলনায় কিছু মার্জিত ছিলো তার মন। ন্যায়রত্নমশাই বোনকে সটীক

মহাভারতখানা আগাগোড়া পড়িয়েছিলেন। বলতেন, 'মেয়েছেলের ন্যায় শিখতে নেই,' অন্য ভাবে বলতেন, 'মহাভারত, রসায়ন, ওতেই সব হবে।'

কিন্তু পৃথিবীতে পুরুষের আশ্রয়ে নেই এমন একটি স্ত্রীলোককে চিনতে পারা কঠিন। তখন চাকরি করার সুবিধা ছিলো না, নয়নতারার পক্ষে কুৎসিত জীবনও সম্ভব ছিলো না। খুব শক্ত মেয়ে সে সন্দেহ কি। প্রথম দিকে সে মসলিনের জন্য সুতো কাটতো। সেই সুতোর নাম ছিলো। সুতোর জন্য দাদন পেতো এবং দাদনের পরিমাণ স্থির হ'তো তার ইচ্ছায়, মহাজনের খুশিতে নয়। কিন্তু এ-বৃত্তি তাকে ত্যাগ করতে হ'লো।

মহাজনের অর্থ ছিলো, প্রাণে শখ ছিলো। রাত্রির অন্ধকারে একদিন মহাজন এসে উপস্থিত। ঘরের দরজা খুলে নয়নতারা বললো, 'এত রাত্রিতে?'

মহাজনের বয়স এমন-কিছু বেশি নয়। ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে সে এক বিখ্যাত কাব্য থেকে এক-আধটা পংক্তি উদ্ধৃত করলো। শেষ খবর এই, নয়নতারা এর পর কার্পাসের কাজ ছেড়ে দিলো এবং ধীরে-ধীরে চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করলো।

এখন সে কবিরাজ। যত-না সে কবিরাজী করে তার চাইতে বেশি করে ওষুধ তৈরি। গ্রামের হরনাথ কবিরাজ রোগীকে অনেক সময়ে তার কাছ থেকে ওষুধ আনতে ব'লে দেন, বিশেষ ক'রে যখন রোগীর প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছা হয় তাঁর এবং সেই ইচ্ছার সূত্র ধ'রে আয়ুর্বেদোক্ত ওষুধের কথা মনে প'ড়ে যায়।

নয়নতারার বয়স পঁচিশ হবে। সন্ধ্যার আগে সে যখন পড়শীদের সঙ্গে কলস কাঁখে জল নিয়ে আসে তখনই তাকে প্রথম দেখা দরকার। সে যেন পাথরের তৈরি। কোমলতা ও বর্তুলতার আভাস যতই থাক, পাথরের কাঠিন্যের কথাও মনে করিয়ে দেয় তার শরীর। আর মনে হবে

আগুনে পুড়ে গেলে বর্ণ কিছু মলিন হবে বটে, কিন্তু ওই কোমলতা তবুও থাকবে।

নয়নতারা সুন্দরী। সহসা এমন রূপ চোখে পড়ে না। বোধ হয় যে-বয়সে মেয়েরা সংসারের দাবিতে সাধারণত ক্ষয়িতরূপা, সেই বয়সে সে একান্ত নিজের হ'য়ে বেড়ে উঠবার সময় পেয়েছে।

নয়নতারার কথা ভাবতে গিয়ে আর-একটা কথা মনে আসে।

নয়নতারার পূর্বপুরুষ কনৌজ থেকে এসেছিলেন। তার ভ্রূ, নাসিকা, ওষ্ঠের গঠনে অবাঙালিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। দেহবর্ণ ফর্সা নয়, বরং যেন রক্তাভ। ধানের রং, গমের রং। কিন্তু 'তিলফুল জিনি নাসা', নয়ন খঞ্জনগতি এবং দশন মুকুতাপাঁতি। কবিরাজের পক্ষে চোখ দুটো আর-একটু স্থির হ'লে ভালো ছিলো। নয়নতারা অতুল মধ্যমা।

রাজচন্দ্র অন্যমনস্ক হ'য়ে তার বাগানে বেড়াচ্ছিলো। এমন সময়ে সে দেখতে পেলো নয়নতারাকে।

সে রাজকুমার। গ্রামের সাধারণ লোকের সঙ্গে তার যোগ খুব কম। আর যতটুকু বা যোগ আছে তা শুধু পুরুষদের সঙ্গে। তবে নয়নতারার কথা আলাদা। মাঝখানে সাত-আট বছর তাকে ছাখে নি রাজু, কিন্তু তার আগে বোধ হয় দেখেছিলো, বোধ হয় কথাও বলেছিলো। সেদিন রাজু পথ হারিয়ে ফেলে একা-একা নয়নতারাদের পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, সম্ভবত নয়নতারাই তাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলো শেষপর্যন্ত।

নয়নতারা পথ থেকে দৃষ্টি তুলতে গিয়েই রাজচন্দ্রকে দেখতে পেলো। পুতুল হাতে পেলে প্রথম কিছুক্ষণ তার দিকে যে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা স্বাভাবিক তেমনি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রাজচন্দ্র নয়নতারাকে দেখছে।

তার দৃষ্টি যেমন নিষ্পাপ তেমনি নির্লজ্জ। নয়নতারা অনুভব করলো, তার গ্রীবার কাছে, তার বক্ষের কাছে, তার চিবুকে রাজচন্দ্রর দৃষ্টি স্থির হ'য়ে পড়ছে— তখুনি স'রে যাচ্ছে না, যেন অনুভব করছে।

নয়নতারা কথা বলতে বাধ্য হ'লো— 'রাজকুমার ?'

'হ্যাঁ। তুমি কে ?'

'নয়নতারা কবিরাজ। আপনি একদিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন—'

'সে কি তুমি ? তুমিই কি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

নয়নতারার বলার কিছু ছিলো না। সে চলতে লাগলো।

দ্বিতীয়বার দেখা হ'লো। সেটাও এমনি আকস্মিকভাবে। নিজের বাড়ির দরজায় নয়নতারা দাঁড়িয়ে ছিলো।

তৃতীয়বার সাক্ষাৎ হ'লো নয়নতারার বাড়িতে। নয়নতারা সকালের আরামদায়ক রোদে পিঠ দিয়ে চতুষ্পাঠীর দাওয়ায় ব'সে বই পড়ছিলো। রাজচন্দ্র দাঁড়ালো। রাজচন্দ্রর পরনে মুসলমানি পোশাক। তাকে দেখলে মনে হবে কোনো মীর-রহিসই হবে। কাঁধের উপরে সেই রুপোর কাজ করা বন্দুক।

নয়নতারা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'রাজকুমার যে ! এদিকে কোথায় ?'

'এমনি, এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'ওটা কি, ওর নামই বুঝি বন্দুক ?'

'হ্যাঁ।'

'বসবেন ?'

'তা বসি একটু।'

নয়নতারা হাসলো। এর আগে রাজচন্দ্র নয়নতারার হাসি-হাসি মুখ দেখেছে বটে কিন্তু হাসি ছ্যাখে নি। নয়নতারা হেসে বললো, 'কতকগুলো প্রাণীর প্রাণ বাঁচলো আজ। কিন্তু বারান্দায় নয়, ঘরের ভেতরে আসুন। রোদ লাগছে গায়ে।'

অন্দরের ঘরে মাদুরে ব'সে রাজচন্দ্র জিগ্যেস করলো, 'তুমি একা থাকো, নয়নতারা, একটুও ভয় করে না তোমার?'

'দেশে রাজা থাকতে ভয় কি?'

'তুমি কি আমার কথা বললে?'

'হ্যাঁ।'

রাজচন্দ্র হেসে বললো, 'তুমি আমাকে এর আগে চিনতে? তবে? ওটা তোমার মন-যোগানো কথা।'

নয়নতারা এ-কথার উত্তর না দিয়ে বললো, 'রাজকুমার, আপনি যে এমন প্রাণীহত্যা করেন, কষ্ট হয় না আপনার?'

'না।'

'বন্দুকের শব্দ তো বজ্রের মতো, ওর আঘাতও বোধ হয়।'

সহসা রাজচন্দ্রর মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। সেটা এত দ্রুত ও এত স্পষ্ট হ'য়ে ঘটলো যে নয়নতারার চোখেও ধরা পড়লো। সে ভাবলো, রাজকুমার হয়তো তার কথায় শাসনের সুর পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

কথাটাকে অন্য খাতে নেবার জন্য সে বললো, 'তা হোক, রাজাদের শিকার করতেই হয়। শিকার করবেন বৈকি।'

কিন্তু সেই মানুষটার মৃত্যু-যন্ত্রণা মনে প'ড়ে গিয়েছিলো রাজচন্দ্রর। তার মুখে যে-হাসিটা ফুটলো সেটা বোকামির হাসি। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, 'আসি নয়নতারা।'

'শিকারে যাবেন ?'

'না, বাড়ি ফিরে যাবো।'

বয়স্ক লোকরাও মাঝে-মাঝে অকর্তব্য কাজ ক'রে বসে, একটি কিশোরও তাই করলো।

পরদিন সকালেই রাজচন্দ্র আবার নয়নতারার বাড়িতে এল। নয়নতারা ঠিক তেমনি ক'রে ব'সেই পুঁথি পড়ছে।

রাজচন্দ্র বললো, 'আচ্ছা নয়নতারা, তুমি তো বলছিলে আমার ভরসায় তুমি গ্রামে থাকো, একদিন আমিই যদি গ্রামে না থাকি ?'

'সে কি !' নয়নতারা উঠে দাঁড়ালো।

'গ্রামে কালেক্‌টর এসেছে, জানো ?'

'কেন এসেছেন ?'

রাজচন্দ্র অধীর হ'য়ে উঠলো। ঘরের ভেতরে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলো।

নয়নতারা লঘু স্বরে, তখনও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় নি সে বিষয়টিতে, বললো, 'কি হয়েছে রাজকুমার ?'

'শোনো, নয়নতারা, শোনো ; তোমাকে একটা কথা বলবো, তুমি কি গোপন রাখতে পারবে ?'

'কি এমন গোপন কথা তোমার মনে তৈরি হয়েছে ? গোপন কাকে বলে তা কি জানো ?'

আবহাওয়াটা মানুষের কথায়, তাদের পারস্পরিক অবস্থান ও চোখের চাহনিতে সৃষ্টি হয় ; এ-আবহাওয়া এমন যে নয়নতারা রাজকুমারের দূরত্ব-বোধটা বিস্মৃত হ'য়ে গেল। শুধু ভাষায় নয়, নিজেও দু-পা এগিয়ে এল রাজচন্দ্রর দিকে।

রাজকুমার বললে, 'আমি যা করেছি তা ভয়ংকর।'

তারপর যে-বক্তব্যটা জিহ্বায় এসে পড়েছিলো সেটাকে রোধ করার চেষ্টা করলো। পরমুহূর্তে সব সংকোচবিমুক্ত হ'য়ে সে বললো, 'জানো নয়নতারা, আমি একটা মানুষকে খুন ক'রে ফেলেছি।'

'কি যা তা বলছো।'

এবার রাজকুমার তার কথা ওজন ক'রে-ক'রে বললো, 'রাগের মাথায় কাজটা ক'রে ফেলেছি।'

'কী সাংঘাতিক! তুমি এমন কাজ করতে পারো?'

'তোমাকে ব'লে ফেলেছি। কালেক্টর এই বিষয়েই খোঁজ করতে এসেছে।'

'এখন উপায়? আমাকে বললে কেন?'

'কেন, তুমি কি এটা গোপন রাখতে পারবে না?'

'যদি না পারি, যদি না পারি!'

কথাটা বলার আগের মুহূর্তে রাজচন্দ্রকে বিচলিত দেখাচ্ছিলো, নয়নতারা বরং যেন একটু কৌতুক অনুভব করছিলো। কথাটা বলার পর রাজচন্দ্র যেন নিশ্চিন্ত হ'লো, তার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হ'লো। তার মুখের বর্ণটাও স্বাভাবিক হ'লো। কিন্তু নয়নতারার মুখ বিবর্ণ হ'লো, তার দৃষ্টিতে উত্তেজনা এল, একটু বিচলিত হ'লো সে।

নয়নতারা এগিয়ে গিয়ে রাজচন্দ্রর মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'তুমি কি এ-কথা সকলকে এমন ক'রে বলেছো?'

'না। হরদয়াল জানে, আর মা। রূপচাঁদ সঙ্গে ছিলো, সেও জানে।'

'আর-কাউকে তুমি বোলো না।'

'বেশ, তাই হবে।'

নয়নতারা রাজকুমারের হাত ধ'রে শয্যার উপরে এসে বসলো। 'কালেক্টর কি তোমাকে সন্দেহ করেছে ?'

'জানি না।'

নয়নতারা খানিকটা সময় চুপ ক'রে ভাবলো।

রাজচন্দ্র বললো, 'নয়নতারা, আমার আর ভালো লাগে না চিন্তা করতে। কি ক'রে এটা ভোলা যায় বলতে পারো ?'

নয়নতারার ছোটো-ভাই ছিলো না। সে অবিবাহিতা। যে-কয়েকটি পুরুষকে সে চিনবার সুযোগ পেয়েছিলো তাদের সংখ্যাও নগণ্য। তারাও নয়নতারাকেই আশ্রয় দিয়েছে, তার দুর্ভাবনা দূর করেছে। কিন্তু তারই কাছে এসে আর-একটি লোক এমন ক'রে পরামর্শ চাইবে এটা ভাবতে পারে নি নয়নতারা।

রাজকুমার! রূপকথার ব্যাপার যেন। সুকুমার ও বলিষ্ঠ একটি পুরুষকে পাশে নিয়ে ব'সে নয়নতারা অবাক হ'য়ে রাজকুমারের দিকে চেয়ে রইলো। কতই বা বয়স হবে। ইতিমধ্যে নয়নতারার নিজের তুলনায় কত বলিষ্ঠ কত দীর্ঘ দেখায় তাকে। তবু মুখের দিকে চেয়ে দ্যাখো, কত কিশোর।

হঠাৎ নয়নতারা বললো, 'রাজকুমার, চলো আমরা অন্য কোথাও চ'লে যাই।'

'কোথায় যাবো ?'

'যেখানে কেউ চিনতে পারবে না।'

রাজকুমার প্রকৃতপক্ষে কিশোর। তার পক্ষে অন্য কোথাও যাবার কল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু নয়নতারা কবিরাজের বয়স পঁচিশ হ'লো। তার পক্ষে হঠাৎ এমন ক'রে এ-প্রস্তাবটা করা যেন বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয়। কিন্তু অতীতের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে মনে হবে

নয়নতারার এবং সেই কালের অন্তঃকরণের উপাদানটা দেখতে পাওয়া গেল।

ঘটনাটা নিয়ে রাজচন্দ্র এর পর খানিকটা সময় আলোচনা করলো। 'আর বোলো না' ব'লে নয়নতারা বাধা দিতে গিয়েছিলো কিন্তু রাজচন্দ্র কোনো অনুরোধ শোনে নি। বহুদিন ধ'রে কথাগুলো মনের মধ্যে আবিল হ'য়ে ছিলো, আজ সামান্যমাত্র পথ করতে পেরে স্রোতের মতো বেরিয়ে এল, যেন তার মন নতুন হ'য়ে উঠবে স্রোতস্নান হ'তে পারলে। রৌদ্রোজ্জ্বল পদ্মার উপমা।

রাজকুমার চ'লে গেল। যাবার আগে সে জিগ্যেস করলো না নয়নতারা কথাগুলো গোপন রাখতে পারবে কিনা। সেদিকে যেন তার আর এতটুকু আগ্রহ নেই।

নয়নতারাই বললে, 'আর-কাউকে বোলো না, রাজকুমার।'

রাজচন্দ্র চ'লে যাবার পর নয়নতারা দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো। সকলেই জানে, ইংরেজ দেশের রাজা, আর, ইংরেজ-কুঠিয়ালের একজনকে হত্যা করেছে রাজচন্দ্র, তার পরিণাম কী ভয়ংকর কে জানে। আর এমন ব্যাপারটা কিনা তাকেই ব'লে গেল সে।

প্রাত্যহিক কাজকর্মে ব্যস্ত হ'য়ে নয়নতারা ভাবলো : কতটুকু পরিচয়, কিছুই নয় নির্ভর করার মতো, তবু এতখানি বিশ্বাস করার কি যুক্তি। আসলে অত্যন্ত ছেলেমানুষ। কি ভাগ্য, গ্রামের আর-দশজনকে ব'লে বেড়ায় নি।

কিন্তু যেন আহত সে, তেমনি অবসন্ন তেমনি ভাগ্যনির্ভর।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নয়নতারা ভাবলো : এতখানি বিশ্বাস অর্জন করার মতো কি-ই বা করেছে সে। এটা খুব সম্ভব, হয়তো বা ব্যাপারটা বলবার

জন্য ছট্‌ফট্‌ করছিলো রাজকুমার, কিন্তু সে নিজে কি প্রীতি অর্জন করেছে? প্রীতি ছাড়া, মনের মানুষ ছাড়া এমন মনের কথা কেউ কাউকে বলে?

মনের মানুষ! কথাটা উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে নয়নতারা থেমে দাড়ালো। শুধু তার মন নয়, তার কর্মরত হাত দু-খানিও। প্রীতি আকর্ষণ করেছে কি তার রূপ? নয়নতারা তার নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন।

নিজেকে শাসন করলো নয়নতারা। শাসনের পাত্র তার সমগ্র মন।

—ছি-ছি, কিশোর।

কিন্তু রাজকুমারদের যে-কল্পনা তার মনে ছিলো সেটাও কিশোর।

তিন-চারদিন পরে অপরাহ্নের দিকে দিবানিদ্রা শেষ ক'রে উঠে বসেছে নয়নতারা, এমন সময়ে রাজকুমার এল। সদরের দিকে চোখ পড়তেই নয়নতারা দেখলো শাদা ধবধবে ঘোড়ায় সওয়ার রাজকুমার। ঘোড়াটা কোথায় বাঁধা যায় তার খোঁজ করছে রাজচন্দ্র। ঘোড়াটা মাথা নাড়ছে, তার গলার ছোটো-ছোটো ঘণ্টাগুলো টিন্‌টিন্‌ ক'রে বাজছে।

বারান্দায় উঠে রাজচন্দ্র বললো, 'আজ কালেক্টর চ'লে গেল।'

'তা হ'লে?' বুকের বোঝা নেমে গেল নয়নতারার। খুশিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠে সে বললো, 'আপনি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলেন, রাজকুমার।'

'না নয়নতারা, মিথ্যে নয়।' গাঢ়স্বরে বললো রাজচন্দ্র, 'ভালো হ'লো না যেন কাজটা। কিছুতেই ভালো লাগছে না। খুশি হ'তে পারছি না যেন। বাড়ির খিড়কিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম ধুলোর কুণ্ডলীর মধ্যে কালেক্টরের গোরুগাড়ির বহর সদরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হ'লো যেন চুরি ক'রে লুকিয়ে ছিলাম।'

উত্তর খুঁজে না পেয়ে নয়নতারা চুপ ক'রে রইলো।

'আচ্ছা নয়ন, তুমি কি আমাকে খুব নীচ মনে করবে?'

'না।'

'কেন তা করবে না, তাই বলো।'

'রাজকুমারদের অনেক সময়ে শত্রুবধ করতে হয়।'

কথাটা বলতে একটু সময় লেগেছিলো নয়নতারার। রাজচন্দ্র কথাটা অনুভব করলো কয়েক মুহূর্ত ধ'রে।

'তুমি সত্যি তাই বিশ্বাস করো?'

রাজচন্দ্র কি ক'রে বুঝবে হঠাৎ কেন তার কিশোর-কপালের ওই চিন্তার দাগ মুছিয়ে দিতে ইচ্ছা হ'লো নয়নতারার, সে নিজেও জানে না।

নয়নতারা বললো, 'করি। এ রকম এর আগেও হয়েছে।'

রাজচন্দ্র খানিকটা সময় চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'সে-লোকটা আমার শত্রু ছিলো কিনা জানি না। বিদেশী কুঠিয়ালের দম্ভ নিয়ে যথেষ্ট অপমান সে আমাকে করেছিলো। এ-ব্যাপারে অনেক ক্ষতির মধ্যে একটা লাভ হ'লো তুমি আমাকে নীচ মনে করো নি। তোমার কাছে অন্তত নিজেকে লুকিয়ে বেড়াতে হবে না।'

নয়নতারা বললো, 'রাজকুমাররাও যদি অপমান থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারেন, প্রজারা কার ভরসায় এই অপমানের দেশে থাকে।'

রাজচন্দ্র নয়নতারাকে দেখতে লাগলো; অনুভব করতে লাগলো। সে-উপস্থিতি যেন উষ্ণ, সুন্দর, যেন তার সৌরভও আছে।

রাজচন্দ্র বললো, 'কী যে করতে ইচ্ছে করছে জানি না। চলো-না নয়নতারা, একটু ঘুরে আসি।'

'মেয়েছেলের কি পথে বেরোতে হয়?'

'পথে কেন, ঘোড়ায়। তুমি যদি বলো এখুনি আর-একটা ঘোড়া আনিয়ে নিই কিংবা চতুর্দোলা।'

নয়নতারা হাসলো।

রাজচন্দ্র বললো, 'নয়ন, তোমার কাছে আসতে আমার ভারী ভালো লাগে। এখন থেকে আমি রোজ আসবো। কখন আসবো, তা বলতে পারি না। তুমি যেন বাড়ি থেকে কোথাও চ'লে যেয়ো না।'

॥ পাঁচ ॥

হরদয়াল তার বন্ধুকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলো। তার উত্তরে সেই বন্ধু একটি ছোটো চিঠিতে তার মতামত জানিয়েছিলো। তা'তে হরদয়াল দীর্ঘতর পত্র দিয়েছিলো, উত্তরে বন্ধুও দীর্ঘতম পত্র দিয়েছে।

হরদয়াল তার প্রথম পত্রে প্রশ্ন তুলেছিলো— মৃত্যুদণ্ড ও নরহত্যায় পার্থক্য কোথায়। রাজচন্দ্র, চন্দ্রসেন প্রভৃতির নাম উহ্য রেখে সে মোটামুটি ঘটনাটা বর্ণনা করেছিলো, তার পরে প্রশ্ন করেছিলো দ্বিতীয় পর্যায়ে : এ-ঘটনায় একে নরহত্যা বলা চলে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে এ-ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে সাহায্য করা চলে কিনা।

বন্ধু লিখেছিলো : হরদয়াল নিজের বিবেকের কাছে কথায় জিত্‌লেও ঘটনার বিচারে হেরে গেছে এবং সে-জন্যই আরও কিছু কথার প্যাঁচ পাবার জন্য বন্ধুকে চিঠি লিখেছে।

দ্বিতীয় পত্রে হরদয়াল বিবেক ও চাকরির মধ্যে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেছিলো। চাকরি অর্থে এ-ক্ষেত্রে শুধু অর্থের মোহ নয়, অন্নদাতার— এবং অন্নদাতা অকৃপণ— উপকারের প্রত্যুপকার করা। বিবেক বড়ো, না প্রত্যুপকার ও অকৃতজ্ঞতা বড়ো হবে, এই প্রশ্ন তুলেছিলো সে। নামগুলো এবারেও গোপন ক'রে সে প্রশ্ন করেছিলো, বিবেককে চোখঠারা এবং সত্য গোপন করা এ-ক্ষেত্রে অন্যায় হয় কিনা।

এবং এ-বিষয়কে উপলক্ষ ক'রে জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাসাবোধক কথা লিখেছিলো সে। তার সূত্রে জীবনের উপকরণ সম্বন্ধে দু-এক কথার মধ্যে হরদয়াল বন্ধুর কাছে কিছু বই, পত্রিকা চেয়ে পাঠিয়েছিলো।

বন্ধু বই পাঠাতে পারে নি, একখানা পত্রিকা পাঠিয়েছে। দীর্ঘ পত্রে সে প্রমাণ করেছে, হরদয়াল সত্য থেকে, জীবন থেকে, অবশেষে বিবেক থেকে পালানোর চেষ্টায় আছে। হয়তো-বা একদিন প্রাণীজগতের

আদি দর্শনের— 'যে-কোনো উপায়ে বাঁচো' এই বাক্যটিকেই চরম ব'লে মেনে নেবে।

হরদয়াল চিঠি পড়া শেষ করেছে, তার সম্মুখে বন্ধু-প্রেরিত ইংরাজি পত্রিকা। পত্রিকাখানির নাম 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। এ-সংখ্যাটিতে বিশেষ কোনো খবর আছে তা নয়, হরদয়াল পত্রিকার জোরদার ভাষা লক্ষ্য করছিলো। হরিশ মুখুয্যে নাম লোকটির, কিন্তু হ্যারিশ মেকলে বললে দোষ হয় না। ভাষার যেমন গতিবেগ তেমনি শক্তি। যেন বক্তৃতা দিচ্ছে রাজসভায়।

সে স্থির করলো, বন্ধুকে ধন্যবাদ দেবে পত্রিকার জন্য এবং অনুরোধ করবে যাতে নিয়মিতভাবে এই পত্রিকাখানি ডাক মারফত আসে। হ্যাঁ, ডাকঘর। বন্ধু বিস্মিত হবে হয়তো, গ্রামে একটা ডাকঘর বসানো হয়েছে, এ-খবর তাকে বলা হয় নি।

আরামকেদারায় শুয়ে পত্রিকা পড়ছে হরদয়াল। সন্ধ্যার আর দেরি নেই। পত্রিকার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হ'তে সেটাকে ভাঁজ ক'রে কোলের উপরে রাখলো। পাশের ছোটো টেবিলটায় ছোটো কাঁচের গ্লাস ও একটি পেট-মোটা বোতল। সামান্য কিছু মদ ঢেলে নিয়ে, আর একটা বড়ো গ্লাস থেকে খানিকটা জল, কিছু নেবুর রস, কিছু চিনি মিশিয়ে পরে গ্লাসটা রেখে দিলো পাঞ্চটাকে থিতোবার জন্য। তারপর কোলের উপরে হাত দু-খানা ভাঁজ ক'রে রেখে সে ভাবতে লাগলো।

একটু পরে পাঞ্চটুকু খেলো হরদয়াল। ভৃত্য আলো দিতে দেরি করছে। তা করুক। চল্লিশ বছর হ'লো এবার হরদয়ালের। মাথার চুলে বোধ হয় পাক্ একটু দেরিতে ধরবে। কানের পাশে কিছু দেখা দিচ্ছে। জীবনের স্তর পার হবার লক্ষণ সেগুলো। কিছুদিন আগেও

সন্ধ্যায় আলো দিতে দেরি হ'লে অস্বস্তি বোধ হ'তো, এখন যেন মাঝে-মাঝে অন্ধকারে অবগাহন করতে ইচ্ছা হয়।

অতীতের দিকে চোখ ফেরালে গোটাকয়েক ঘটনা মনে পড়ে। দশ বছর আগে থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র ঘটনা ঘটেছে হরদয়ালের জীবনে।

হরদয়াল রাজবাড়ির একজন কর্মচারী। তার ইংরেজি জ্ঞান ও সাধুতার পুরস্কার পেলো যখন সে প্রথম শ্রেণীর আমলা থেকে প্রধান কর্মচারী হ'লো। নাম হ'লো দেওয়ান। তার পরের ঘটনা হচ্ছে—রাজবাড়ির চত্বরের বাইরে দেওয়ানখানায় তার নিজের জন্য বাসগৃহ ও লাইব্রেরি স্থাপন।

ঘটনা বলতে এই কয়েকটি। আর যা, সেগুলো মানসিক ইতিহাস। কাজগুলোর ঘটনাগুলোর পরিবেশ ও কারণ। সেই পরিবেশ ও কারণ বিশ্লেষণ করছে এখন হরদয়াল।

যদি আকাঙ্ক্ষার কথা ওঠে তা হ'লে বলা যায়, ভালো লেগে গেল রাজবাড়িটা তার। এই বিশ্রামের অবকাশ, এই শান্ত পরিবেশ তার আকাঙ্ক্ষিত ছিলো। কিন্তু এরই কি নিশ্চয়তা ছিলো? ছিলো না, কিন্তু সুযোগ ছিলো। বাকিটুকু তার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি।

ভৃত্য আলো দিয়ে গেল। আলোর প্রথম জ্যোতিটা চোখে লাগতে হাতের চেটোয় চোখ আড়াল ক'রে সইয়ে নিলো হরদয়াল। এই ভৃত্যটি তার নিজের হাতে মানুষ। আগে মফঃস্বলে যখন মাঝে-মাঝে খাজনা আদায় করার কাজে যেতে হ'তো তখন এ-ই ছিলো একমাত্র অবলম্বন। হরদয়ালের কখন কি প্রয়োজন এ যেমন সে জানে আর-কারো তেমন জানা নেই।

ভৃত্যটি বললো, 'বাবুর্চি জিগ্যেস করছিলো কি রান্না হবে আজ।'

সাধারণত এ-সব প্রশ্নের উত্তরে লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে দেয় হরদয়াল। গৃহিণীহীন গৃহ। বাবুর্চি চাকরের সংসার। নিজের অভিরুচি না জানিয়ে দিলে তারাই বা কি করতে পারে।

'শাদা মাংস যা হয় রাঁধতে বলো। একটু দেরি ক'রে।'

'তিতির আছে।'

'তাতেই হবে।'

ভৃত্য চ'লে গেল।

হরদয়াল বন্ধুকে কথা বলার মতো মুখভঙ্গি ক'রে ভাবলো: এটা আমার ক্যাম্প-লাইফ। শহর থেকে বাইরে তাঁবুতে জীপ্‌সিদের মতো জীবন কাটানো। যদি বলো কেন, তার উত্তর এই যে, ভালো লাগে। এ-জীবনে এইটাই মহত্তম বোধ হচ্ছে।

হরদয়াল উঠে একটু পায়চারি করলো, তারপর পাশের টেবিলটায় গিয়ে বসলো। তার উপরেই ছিলো আলোটা। একখানা লম্বা-চওড়া খাতা খুললো। চামড়ায় বাঁধানো খাতা, কোণগুলো চাঁদির পাতে মোড়া। দোয়াতদানটা টেনে নিলো। সেটিও চাঁদির। গায়ে তার উঁচু ক'রে পল তোলা, যেখানে পল তোলা নয় সেখানে একগুচ্ছ ফুল খোদাই করা। কলমটা হাতির দাঁতের, লিখবার সময় যেখানে আঙুলগুলি থাকবে সে-জায়গাটুকু সোনায় মোড়া ব'লেই মনে হয়।

খাতাটা খুলে তারিখ লিখলো। তারপর লিখলো তখনকার দিনের পক্ষে চল্‌তি বাংলায়— বন্ধুর চিঠি পাবার পর এই কথাগুলো আজ লিখছে:

জীবনটা আমার একটা ক্যাম্প। পথের ধারে বাসা বেঁধেছি। এই জীবনই আমার ভালো লাগছে। জীবনকে অনুভব করার পক্ষে এ-পদ্ধতিটাই ভালো। তোমরা স্রোতের ভেতরে আছো, কখনো বাধা দেবার চেষ্টা করছো, কখনো বাধা

দিতে গিয়ে পর্যুদস্ত হচ্ছো, মোট কথা স্রোতের সঙ্গে গতি তোমাদের। এখানে জীবনের নদীর বাঁক। জল স্থির ধীর। অবগাহন করা যায়, তীরে উঠে এসে অথৈ নিবিড় জলরাশিকে অনুভব করাও যায়। জীবনকে এমন স্থির হ'য়ে দেখার কি মূল্য নেই? বাঁচার জন্যই একদিন এই শুধু-দেখার অভিজ্ঞতা কারো কাজে লাগে না?

হরদয়াল হাসলো। বন্ধু তাকে একটা কড়া গালি দিয়েছে। এক সময়ে ছিলো যখন কলেজের ছাত্র বলতেই সত্যবাদী বোঝাতো। প্রবাদ আছে, তখনকার কলকাতায় বলা হ'তো এই ইংরেজনবিস ছাত্রগুলি মিথ্যা কাকে বলে তা জানে না। এটা খুব উচ্চ প্রশংসার কথা। এতে একটা জিনিস প্রমাণ করে: তারা একান্ত অভী ছিলো। সংকোচ, কুণ্ঠা, লোকলজ্জাও তাদের ছিলো না। তুমি মদ খাও? খাই। তুমি অসৎ স্ত্রীলোকের বাড়ি যাওয়া-আসা করো? করি। তুমি রামের টাকা নিয়ে ফেরত দাও নি? কথাটা সত্য। তুমি নাকি ভগবান মানো না? না। এ-সব উত্তর দিতে যাদের সাহস আছে তারা মিথ্যে বলবে কেন? ধরো, তাদের কেউ একটা খুন করেছে, জিজ্ঞাসা করো— খুনের জন্য তুমি দায়ী? অভ্যাস বশে ব'লে বসবে, হ্যাঁ। বন্ধু তাকে বলেছে, তুমি সত্যবাদী নও।

হরদয়াল চিঠির উত্তর এখনও দেয় নি। সে সত্যবাদীর মতো স্বীকার করলো নিজের কাছে— সে সত্যবাদী নয়। সে রাজকুমারকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলেছে এবং মিথ্যা ব্যবহার করেছে।

চিন্তা এবং ডায়েরি লেখা বন্ধ করতে হ'লো। একটা মৃদু সৌরভে তার ঘরটা পূর্ণ হ'য়ে উঠলো। চোখ তুলে সে দেখলো, রানী এসেছেন। সন্ত্রস্ত হ'য়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলো, রানী বললেন, 'বোসো দেওয়ানজি।'

'ডেকে পাঠালেই পারতেন। কষ্ট ক'রে এলেন।'

'সে কিছু নয়। একটা পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে।'

'আজ্ঞা করুন।'

'একটা উৎসব করতে ইচ্ছে হয়েছে, এখন করা কি সমীচীন হবে?'

'অসমীচীন হবে কেন?'

'কেউ যদি মনে করে বিপদমুক্তির জন্যই এই আনন্দ!'

হরদয়াল মৃদু হাসলো।

'কই, বললে না?'

হরদয়াল বললে, 'স্বে দোষৈ শঙ্কিতা হি মনুষ্যাঃ।'

'তা বটে। তুমি নিষেধ করছো?'

'না। ব্যবস্থা করছি। কি-কি হবে?'

'কালীপুজো, জনসাধারণের নিমন্ত্রণ। কবিয়ালদেরও খবর দিতে হবে।'

'আচ্ছা, পুরোহিতকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

রানী উঠে দাঁড়ালেন। হরদয়ালের ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। দামী আসবাব ও গৃহসজ্জাগুলি রানী অনুমোদন করলেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে হরদয়ালকে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন বোধ হ'লো। বিছানায়, বসবার চেয়ারে, এমন কি ঘরের মেঝেতেও বইপুঁথি ছড়ানো।

রানী বললেন, 'হরদয়াল, তোমার কিছু আলমারির দরকার মনে হচ্ছে।'

'না, তার এমন কি প্রয়োজন।'

'বইপুঁথি ঘরময় ছড়ানো দেখছি।'

'চাকরকে বলবো তুলে রাখতে।'

'আজকাল আর তোমার বই তেমন আসে না, না?'

'আসছে, আগের চাইতে কিছু কম।'

'যা দরকার হয় আনিয়ে নিয়ো।'

রানী চ'লে গেলেন।

ইতস্তত চাইতে-চাইতে দেয়ালের গায়ে বড়ো ঘড়িটার দিকে চোখ পড়লো হরদয়ালের। আলো প'ড়ে ঘড়ির ডায়ালটাকে একটা লাল আলো ব'লে বোধ হচ্ছে। একটা মথ-জাতীয় প্রজাপতি সে-আলোর গায়ে বসবার জন্য উড়ছে, ডানার ঝাপটা লাগছে কাঁচের গায়ে। রাত্রি নটা হ'লো।

হরদয়াল ঘরের মেঝেতে একটু পায়চারি ক'রে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। জানলার নিচে কি-কি ফুলের গাছ আছে এখন তা বুঝবার উপায় নেই; এ-শীতে ফুল যদি-বা ফোটে, ঘ্রাণ থাকে না। হরদয়াল এখন ঠাহর করলো, রানীর ব্যবহৃত সুগন্ধিটি বর্ষার একটি দুষ্প্রাপ্য ফুলের।

ফিরে এসে ডায়েরির সদ্য-লেখা পৃষ্ঠাটির দিকে একটু-সময় দৃষ্টি দিলো হরদয়াল, তারপর অন্যমনস্কের মতো পাতা উল্টোতে লাগলো। প্রায় এক সপ্তাহ আগেকার একটা তারিখের নিচে তার মন স্থির হ'লো। লেখাটার সারমর্ম এই রকম:

ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষা দিতে ব'সে অনেকেরই একটা বিষয় অনুভব হয়, হল্-এ ব'সে আপাতবিস্মৃত বিষয়গুলিও মনে প'ড়ে যায়। সেটাই মনের প্রকৃত শক্তির পরিচয়। তেমনি দুর্ঘটনার সময়ে, যুদ্ধের সময়ে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মানুষ যেমন জড়ীভূত হয়, অন্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তার চরিত্র ও স্বরূপের প্রকাশ পায়। রানী বুদ্ধিমতী, রানী রূপসী, রানীর দেহ ও মনে অন্য অনেক গুণ আছে, কিন্তু রাজ্য চালানোর পক্ষে সেটুকুই সব নয়। শিশুপুত্রকে কোলে ক'রে নিঃসহায় একটি মহিলা অজস্র সম্পদ আগলে রাখতে পারে না। আত্মীয়রা, কর্মচারীরা সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে। কিন্তু রানীকে সবাই ভয় করে। কি সে ভয়, কোথায় সে দৃঢ়তা এতদিন হরদয়াল জানতে পারে নি, দীর্ঘ দশ বৎসরের একটি দিনের জন্য রানীকে কঠিন এবং দুঃসাহসী ব'লে মনে হয় নি। কিন্তু সেই রাত্রির সেই নিঃশঙ্ক নিঃসঙ্গ অভিযান একটি লৌহকঠিন দার্ঢ্য ও অকুতোভয়তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

রানী শ্রদ্ধেয়া।

চাপে না-পড়লে চরিত্রের প্রকৃত রূপ চোখে পড়ে না। হরদয়াল নিজের চরিত্রের সমালোচনা করলো— সে নিজেও কখনো কল্পনা করতে পারে নি, প্রয়োজনের সময়ে সে-ও নিখুঁত একটি অভিনয় করতে পারে। বন্ধুর তিরস্কারটা টাটকা এবং তীব্র না হ'লে সে হয়তো নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে দিতে পারতো অভিনয়ের সার্থকতার জন্য।

এইটুকুই তার নিজস্ব ব্যাপার, আর সব কর্তব্য। দেওয়ানের কর্তব্য প্রভুকে রক্ষা করা। তাই করেছে সে।

কর্তব্যের তাড়নায় পরদিন সকালে পুরোহিতকে ডেকে পাঠালো হরদয়াল। পুরোহিত এলেন। সাধারণত পূজা-অর্চনার ব্যাপারে সাধারণ কর্মচারীরাই খবরদারি করে। দেওয়ান স্বয়ং তদারক করছেন, তদ্বির করছেন— প্রাচীন হ'য়েও পুরোহিত একটু বিস্মিত হলেন। ব্যাপারটা সাধারণ নয়, সন্দেহ কি।

প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর পুরোহিত প্রস্তাব করলেন, 'তা হ'লে তান্ত্রিক একজনকে আনলে কেমন হয়?'

'আমার ধারণা ছিলো আপনি নিজেই তান্ত্রিক।'

'আমি সিদ্ধ নই।'

'তা হোক, জ্ঞালে বোধ হয় একটু কম হয়েছিলো—'

'দেওয়ানসাহেব, জ্বালের কম-বেশিতেই ওটা হয় না। পদার্থটি সিদ্ধ হবার মতো হওয়া চাই। আপনাদের সেবায় লেগে থেকে অনেক পেলাম, কিন্তু হারালাম ওই পদার্থটিকে।'

হরদয়াল পুরোহিতের খোঁচাটি উপভোগ করলো।

'তা বেশ। আপনি তা হ'লে আপনার মনের মতো লোক আনিয়ে নিন, কিন্তু পুজোটা সামনের অমাবস্যায় হওয়াই চাই।'

'তাই হবে।'

'টাকার জন্য ভাবনা নেই। রানিমা নিজে মুখ ফুটে বলেছেন।'

পুরোহিতের পর দেওয়ানের কামরায় ঢুকলো সদর-নায়েব।

'এদিকে কবিয়ালরা কোথায় থাকে জানেন, নায়েবমশাই ?' হরদয়াল প্রশ্ন করলো।

'তা আপনাদের শোনবার মতো ভালো গান এদিকে হয় না, স্যার।'

'আপনাদের শোনার মতো ?' হরদয়াল নায়েবের বিনয়কে ব্যঙ্গ করলো।

'তা হয়।'

'তার চাইতে ভালো কোথায় পাওয়া যায় ?'

'দক্ষিণে। শুনেছি কলকাতায় নাকি—'

'নায়েবমশাই, কলকাতা-প্রীতি আপনার অসাধারণ।'

'তা নয় স্যার, ওদিকে সত্যি ভালো কবিয়াল আছে।'

'আসতে ছ-মাস লাগবে।'

'জেলার সদরে নাকি বিদ্যাসুন্দরের পালা বেঁধে আজকাল গান হচ্ছে।'

'সেটা কি রকম ? আচ্ছা, তা-ই না-হয় আনবার ব্যবস্থা করুন।'

নায়েব চ'লে যাচ্ছিলো, হরদয়াল ডাকলো।

'হ্যাঁ মশাই, কাল খাতা চেক করতে গিয়ে একটা রহস্য দেখলাম। ইসবশাহী পরগনার হিসেব কি আপনি দেখেন ?'

নায়েবের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। একটু থেমে ভদ্রলোক বললো, 'আপনার বাহাদুর নম্বর হুকুমে ওটা আমাকেই দেখতে হয় বটে।'

'আমি তিন সপ্তাহের আমদানি দেখলাম। গত বছরের তুলনায় ভালো দেখাচ্ছে না। বাজে আদায় কমেছে বটে, কিন্তু বাকি খাজনা উসুল বাড়ে নি।'

নায়েব আমতা-আমতা ক'রে বললে, 'মাসটা শেষ হ'লে হিসেব করবো ভেবেছিলাম। আচ্ছা আমি নজর রাখছি।'

'আচ্ছা যান।'

নায়েব পালিয়ে বাঁচলো। মুহূর্তকালের মধ্যে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল আজ বিপদের সূচনা দেখা দিয়েছে। সাবধানে কাজ করো, উঁচু-গলায় কথা বোলো না। বড়ো-বড়োরা ছাড়া আর কেউ আছো এ যেন মনে না প'ড়ে যায়।

কিন্তু আধঘণ্টাও পার হ'লো না। পাশাপাশি দু-তিনখানা ঘরে অনেকগুলো কান সতর্ক হ'য়ে উঠলো। ডাকছেন—কাকে ডাকছেন যেন।

সদর-নায়েব সবেমাত্র ডাবা-হুঁকোয় মন দিয়েছিলো, তাড়াতাড়ি হুঁকো নামিয়ে রেখে কোঁচা সামলাতে-সামলাতে খাস-কামরার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, ডাকছেন বটে, তাকেই ডাকছেন।

পর্দা ঠেলে প্রবেশ ক'রে নায়েব দেখলো, দেওয়ান মৃদু-মৃদু হাসছে। 'মরেলগঞ্জের কুঠিয়ালকে নিমন্ত্রণ করছেন নাকি?'

'তা করা উচিত।'

'তাই করুন। বাজারের বন্দরের মহাজনদেরও করবেন বোধ হয়?'

'সাধারণত তা করা হ'য়ে থাকে।'

কি একটা ভাবলো দেওয়ান, একটু পরে সে বললো, 'কবিয়ালা বা যাত্রা যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই, তার উপরে নাচওয়ালীর ব্যবস্থা করুন। ভালো নাচওয়ালী চাই।'

'এদিকে কোথায় পাওয়া যাবে?' নায়েব বিপদ গুনলো।

'যাবে। সদরে খোঁজখবর নিন। আপনারই সদরে যাওয়া দরকার। কালেক্‌টর ও ডেপুটি কালেক্‌টরকে নিমন্ত্রণ করবেন, এবং মরেলগঞ্জের কুঠিয়ালকেও।'

'যে আজ্ঞে।'

'আপনাকে একবার সদরে যেতেই হচ্ছে। সদরের নিমন্ত্রণগুলো এবং সব ব্যবস্থা আপনার দায়িত্বে রইলো। মোদ্দা কথা, নাচওয়ালী যেন সাহেবদের মনোরঞ্জন করতে পারে।'

নায়েব চ'লে গেলে দেওয়ান তার খাস-ভৃত্যকে ডেকে পালকি আনতে বললো।

চারজন বেহারা ছোটো পালকিখানা বারান্দায় ঘরের দরজায় নামালো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেওয়ান বললো, 'তা হ'লে আপনাদের সই করাবার কাগজ আজ নেই তো?'

সদর-নায়েব আবার এল, তার পিছনে খাতা-হাতে সারিবদ্ধ পাঁচ-ছ-জন আমলা।

তাদের হাত থেকে সই করার কাগজ নিয়ে নায়েব দেওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করলো। দেওয়ানের খাস-ভৃত্য দোয়াত কলম নিয়ে এসেছিলো। পালকির ছাতে খাতা রেখে দেওয়ান কাগজগুলো খস্‌খস্ ক'রে সই ক'রে দিলো।

আমলারা চ'লে গেল, নায়েব দাঁড়িয়ে রইলো। দেওয়ান পালকিতে উঠলো, পালকি বেহারাদের কাঁধে উঠলো। নায়েব হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলো। দেওয়ান-কুঠির দিকে রওনা হ'লো পালকি। কাছারিঘর থেকে দেওয়ান-কুঠি তিন শ' গজ।

কথাটা উঠেছিলো বছর তিন-চার আগে হরদয়ালের দেওয়ানগিরির দ্বিতীয় বৎসরের গোড়ার দিকে। সূত্রটা মনে নেই হরদয়ালের।

'কালেক্টর কত বেতন পায়?' রানী জিগ্যেস করেছিলেন।

'হাজার টাকা হবে।'

'আমার দেওয়ানের বেতন হাজার এক টাকা ধার্য হ'লো।'

রানীর হাসিটা দেওয়ানের মনে আছে।

হরদয়াল বিমূঢ় হ'য়ে চেয়েছিলো রানীর মুখের দিকে।

কিন্তু রানীর কথা তখনও শেষ হয় নি। রানী বললেন, 'প্রতি আমলার বেতন পাঁচ টাকা ক'রে বাড়বে, পেয়াদাদের এক টাকা ক'রে।'

হরদয়ালের মনে আছে, খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার পর কী আনন্দ, কী উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছিলো কাছারিতে।

কয়েক দিন পরে সদর-নায়েব বলেছিলো, 'মাসিক খরচ প্রায় চার হাজার বেড়ে গেল স্যার।'

'মাসিক আয় চার হাজার বাড়ানো যায় ?'

'আজ্ঞে !'

'ভেবে দেখুন।'

দেওয়ান নিজের ঘরে ঢুকে ভাবলো, আয় বেড়েছিলো বৈকি। শুধু বিলের জলকর থেকেই টাকাটা উঠে এসেছিলো। এখনও উঠছে। আয় এখনও বাড়ছে। কিন্তু নিজের হাজার টাকা নিয়ে কি করবে হরদয়াল ভেবে পায় না। বছরে আট-দশ হাজার ক'রে জ'মে যাচ্ছে।

দেওয়ান আরামকেদারায় বসলে খাস-ভৃত্য এসে পাশে একটা ছোটো টেবিল রেখে গেল। ঝকঝকে পেতলের বারকোশে সাজিয়ে অতঃপর ব্রেক-ফাস্ট এল দেওয়ানসাহেবের। একটু দেরিতেই হয় সেটা। বাবুর্চি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইলো আদেশের অপেক্ষায়। অগ্নিমান্দ্যের কোনো চিহ্ন নেই দেওয়ানের। চামচের মাথায় হরদয়াল ডিমগুলো ভাঙতে লাগলো, হাল্কা ধোঁয়া উঠতে লাগলো ডিমগুলো থেকে। ডিমের পর ফলের দিকে যখন দেওয়ান চামচ বাড়ালো, বাবুর্চি তখন খুশিমুখে বিদায় নিলো।

খাস-ভৃত্য বললে, 'হুজুরের আজ রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন।'

'সে কি রে, আবার আজই ?'

'দেওয়ান-কুঠির সকলেরই। সকালে আপনি কাছারিতে বসলে রানিমার খাস রসুয়ে-বামুন ব'লে গেছে।'

দেওয়ানের ব্রেকফাস্ট শেষ হ'লো। আরামকেদারায় গা ঢেলে দিয়ে আতপ্ত খুশিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠলো সে। একটু-সময় বিশ্রাম, তারপর শুরু হবে নিজের লেখাপড়ার কাজ। খাস-ভৃত্য উচ্ছিষ্ট সরিয়ে ফেলে ঘরের পর্দাটা টেনে দিলো।

হরদয়াল বন্ধুকে এই ধরনের একটি চিঠি লিখলো :

তোমার দ্বিতীয় পত্রের উত্তর এখন টাট্‌কা-টাট্‌কা দেওয়া যাবে না। বিল্‌ উইলবারফোর্সের কোনো আত্মজীবনী পাওয়া সম্ভব কিনা জানিয়ো। তুমি একবার প্রশ্ন করেছিলে, সেনাপতি বড়ো, না তার সৈন্যদল। উইলবারফোর্সের জীবনী প'ড়ে তার উত্তর দেবো। একক চেষ্টায় একটি সাম্রাজ্যের রোগ দূর করা সম্ভব, একটি মস্তিষ্ক পৃথিবীকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। এরকম সেনাপতি হয়তো-বা সৈন্যদল অপেক্ষা অনেক বড়ো।

একটা কৌতুকের ব্যাপার ঘটেছে যার জন্য এ-কথা উত্থাপন করলাম। রূপচাঁদের কথা তুমি জানো। তার পিতামহ ও পিতামহীকে এই রাজ-পরিবার একশত এক টাকায় কিনেছিলো। রানিমাকে ব'লে ক্রয়পত্র ছিঁড়ে ফেলেছি, কিন্তু সে ক্রীতদাসই থেকে গেল। রাজবাড়ির বাইরের জীবন সে কল্পনাও করে না।

আহারের পর রানীর কামরায় ডাক পড়লো হরদয়ালের।

'খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে, হরদয়াল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'উৎসবের ব্যবস্থা করছো তো। কি-কি করলে ?'

'পুজোর ভার পুরোহিত নিয়েছেন। সদর-নায়েব জেলার সদরে যাচ্ছেন। তিনি কবিয়ালের ব্যবস্থা করবেন, আর—'

'আর কি ?'

'নাচওয়ালীর কথাও ব'লে দিয়েছি।'

'নাচওয়ালী ? তোমাদের রাজা তো এখনও নাবালক।'

'আজ্ঞে, কালেক্‌টরদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হচ্ছে—'

'কিন্তু তোমাদের কি নাচমহল আছে ?'

'ভেবেছি দেওয়ান-কুঠির হলঘরেই হবে।'

'তা বেশ।'

'কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কিসে ?'

'স্বভাবতই লোকে প্রশ্ন করবে এ-উৎসবটা কিসের। আমাদের রাজকুমারের বিপদমুক্তি বললে চলবে না। কি বিপদমুক্তি, লোকে প্রশ্ন করতে পারে।'

'তুমি নিজে কিছু ভেবেছো ?'

'কারো জন্মোৎসব হিসাবে প্রচার করা চলে।'

'রাজকুমারের জন্মোৎসব হোক তবে।'

'তাতে একটু অসুবিধা আছে। তাঁর জন্ম বৈশাখে ; বৈশাখ এখনও অনেক দূর।'

'তা হ'লে কি করতে চাও ?'

'রানীর জন্মোৎসব হোক।' .

'কবে আমার জন্ম হয়েছিলো তা কি আমারই মনে আছে !'

'সেটাই তো সুবিধা হবে এ-ক্ষেত্রে।'

রানী ঈষৎ আরক্তিম হলেন। চোখ নামিয়ে নিজের হাতের বলয় দুটি পরীক্ষা করলেন যেন। 'আচ্ছা, তাই হোক তবে।'

রানী তাকিয়ার উপরে কনুইয়ের ভার রেখে ঈষৎ একটু হেলে

বসলেন। তিনি প্রায় নিরাভরণ। হাতের এক জোড়া বলয় আর গলার এক ছড়া হার ছাড়া আর-সবই পরিত্যক্ত। তাঁর অবস্থান-পরিবর্তনের সময়ে হারে-বসানো শাদা পাথরগুলো ঝকঝক ক'রে উঠলো।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বলা যায়— রানীর জন্মোৎসবের প্রথা এই-ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিলো।

॥ ছয় ॥

'কি তুমি পড়ো দিনরাত ? পড়তে মানুষের এত ভালোও লাগে !'

নয়নতারা উঠে দাঁড়ালো অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে।

'কি বই ওটা ?'

'কিছু নয় এমন।'

নয়নতারা হাতে-লেখা পুঁথিখানি আড়াল করলো আঁচলে। আড়াল না করলে রাজচন্দ্রর কৌতূহল হ'তো কিনা সন্দেহ।

'লুকোচ্ছো কেন ? বই কি লুকোবার জিনিস ? ও তো তোমার কবিরাজী শাস্ত্র।'

'তা হবে। কিন্তু আকাশে মেঘ, বাদলা-বাদলা লাগছে। জল হ'তে পারে। এমন দিনে বেরিয়েছেন ?'

'শীতের মেঘ। তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম, নয়ন, রাজবাড়িতে উৎসব হবে। তুমি যেয়ো। কালীপুজো হবে, বিদ্যাসুন্দরের পালা হবে।'

'যাবো। কিন্তু রাজবাড়ির সকলে যদি বলে, কবরেজটা এখানে এসেছে কেন !'

'তুমি বলবে রাজকুমার ডেকে এনেছে। বোলো, তুমি রাজকুমারের মিতে।'

নয়নতারা হাসলো।

রাজকুমার বললো, 'আচ্ছা নয়ন, নাচওয়ালী কি খুব সুন্দর হয় ?'

'কেন বলুন তো, এ-গ্রামে নাচওয়ালী আবার কে এল ?'

'উৎসবে নাচওয়ালীও নাকি আসবে। বললে না, নাচওয়ালীরা সুন্দর হয় কিনা ?'

'একেবারে কুৎসিত হয় না।'

'তা আমি জিগ্যেস করি নি। তোমার চাইতেও সুন্দর কিনা তাই বলো।'

'তা-ও হয়।' নয়নতারার ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হ'লো।

'এটা একেবারে ডাহা মিথ্যে। তা কখনো হয়, তা হ'লে সে নেচে বেড়াবে কেন।'

'কি করবে, কবরেজি ?'

'তোমার সব তাতেই ঠাট্টা!'

নয়নতারা হাসি গোপন করতে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। একটু পরে গম্ভীর মুখে রাজচন্দ্র প্রশ্ন করলো, 'নয়ন, তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট। এখন থেকে তুমি আর কবরেজি করতে পারবে না।'

'আমাকে খেতে-পরতে দেবে কে ?'

'আমি কি পারি না, নয়ন ?'

আর-একবার হাসবার উপক্রম করতে গিয়ে নয়নতারা দেখলো প্রস্তাবটি রাজচন্দ্রর অন্তরের গভীর থেকে উত্থিত হয়েছে। সে বললো, 'পারেন, নিশ্চয়ই পারেন। দরকার হ'লেই আপনাকে আমি বলবো।'

ঝিরঝির ক'রে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল।

রাজচন্দ্র বললো, 'কিছুদিন থেকে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, নয়নতারা, তোমার বই পুঁথি দেখে। এর পরে লোকে আমাকে মূর্খ বলবে।'

'কেন, কেন ? মূর্খতার কি দেখলো লোকে ?'

'আমি না-পারি ফার্সি পড়তে, না-বুঝি ইংরিজি। বাংলায় লেখা কতকগুলো বই আছে— তা-ও পড়তে ভালো লাগে না।'

'আপনার পণ্ডিত আপনাকে সংস্কৃত পড়ায় নি ?'

'অং বং শুনলে আমার বিরক্ত বোধ হয়।'

'কেউ আপনাকে ভালো ক'রে পড়ায় নি। সংস্কৃতে খুব ভালো লাগার মতো বিষয় আছে।'

'ছাই! কি বই পড়ছিলে তুমি? ওটায় একটাও ভালো কথা আছে তুমি বলতে চাও?'

নয়নতারা মৃদু হাসলো। স্মিতমুখে বললো, 'ওটা কালিদাসের বই।'

'কোন কালিদাস? যাকে তার বউ মূর্খ ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, প্রবাদ তাই বলে।'

'তুমি যদি প্রমাণ করতে পারো ওর মধ্যে একটাও দামী কথা আছে, আমি—'

'আমি নিজেই ভালো জানি না, আমি কি ক'রে প্রমাণ করি।'

'চেষ্টা করো।' রাজচন্দ্র পালঙ্কের উপরে জাঁকিয়ে বসলো।

পুঁথিখানা মেঘদূত। দু-রকম সংকোচ অনুভব করতে লাগলো নয়নতারা। মহাভারত হ'তো যদি, তা হ'লেও সে সংকোচ অনুভব করতো। নিজের বিদ্যা সপ্রমাণ করার সংকোচ তবু কাটিয়ে ওঠা যায়, কিন্তু মেঘদূতের প্রেম ও বিরহের কথাগুলি কি ক'রে বলা যায় রাজকুমারের সামনে।

কিন্তু রাজচন্দ্র রাজকুমার। অসাধারণ পুরুষ।

'এটা কালিদাসের মেঘদূত। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এর কথা।'

'সেই মেঘ এক দেশ থেকে আর-এক দেশে যাচ্ছে। কে যেন একদিন বাংলা ক'রে বলেছিলো গল্পটা।' রাজচন্দ্র বললো।

'আপনার ভালো লাগে নি?' কথাটা ব'লে নয়নতারা রাজকুমারের দিকে চেয়ে দেখলো। দু-বছর আগেও যদি শুনে থাকে রাজকুমার, ভালো লাগার কথা নয়। ভালো লাগার মতো, অনুভব করার মতো বয়স তখনো হয় নি। একটা ঘোর যেন লাগলো নয়নতারার চোখে,

সহসা তার মনে হ'লো এমনি এক যক্ষই তো নায়ক ছিলো এ-কাব্যের, এমনি প্রথম তারুণ্যে উচ্ছল না হ'লে এমন কথাগুলি সৃষ্টি হয় না।

নয়নতারা বললো, 'শুনবেন ?'

'পড়ো না !'

এর পরে নয়নতারা মেঘদূত পড়তে শুরু করলো। তার কণ্ঠ ভালো, তার উচ্চারণ শুদ্ধ, ছন্দজ্ঞান অনবদ্য। কালিদাস লিখবার সময়ে যে-ধ্বনিগুলি বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন মন্দাক্রান্তায়, বোধ করি, নয়নতারার পাঠে সেগুলির প্রতিধ্বনি ছিলো।

ধ্বনিবিন্যাস রাজচন্দ্রকে আকৃষ্ট করলো, কিন্তু তার মনে যে দাগ কাটছিলো সেগুলি শুধুই ধ্বনি নয়, নয়নতারার স্ফুরিত অধর, তার বিলোল দৃষ্টি। মাঝে-মাঝে তার গণ্ড আরক্তিম হচ্ছে কেন রাজচন্দ্র বুঝতে পারলো না, কিন্তু অনুভব করলো পরিবর্তনগুলো। পূর্বমেঘের মাঝামাঝি নয়নতারা থামলো, কাব্যের সুরে তখনো সে আচ্ছন্ন।

রাজচন্দ্র বললো, 'আমাকে অর্থ শিখিয়ে দেবে ?'

নয়নতারা বিপদ গুনলো। রাজচন্দ্র অর্থ বুঝবে না মনে ক'রেই সে পড়তে পেরেছিলো, তবু আর-একজনের কাছে ব'সে পড়ছে এই অনুভূতিতে মধুর একটা সংকোচ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছিলো মাঝে-মাঝে। অর্থ করা কি ক'রে সম্ভব।

'আপনার পণ্ডিতমশাইকে বললেই হবে।'

'যদি পড়ি, যদি শিখি, তোমার কাছেই শিখবো। এই প্রথম আমার মনে হ'লো পড়াটা মধুর। শিকারের চাইতেও ভালো লাগার মতো বিষয় ওতে আছে।'

'আচ্ছা আর-একদিন।'

'কেন ? এই ঝিরঝিরে বাদলায় সমস্ত পথঘাট ভিজে গেছে, আজ

ঘোড়াটাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে নেই। আজ কোথাও বেরুবো না। তোমার কাছে ব'সে-ব'সে পুঁথিটা পড়বো। আমার মনে হয় তোমার মতো পড়তে কেউ পারবে না। পণ্ডিতের সংস্কৃত পড়া যেন কট্‌কট্‌ ক'রে কাঠসুপুরি চিবোনো।'

'আমি পারি না।'

'না, তুমি পারো।'

'কিন্তু আপনার নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়ার সময় হয়েছে। আপনি অনেকক্ষণ হ'লো এসেছেন। ওঁরা সকলে আপনার খোঁজ করছেন।'

'নয়ন, আমি প্রথম শ্লোক না প'ড়ে উঠবো না।'

'কিন্তু আপনি তো ক্লান্ত, একটু শরবৎ দেবার ব্যবস্থাও আমার নেই।'

'তুমি বুঝি গরিব?' রাজচন্দ্র হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর নয়নতারার শয্যায় লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে বললো, 'এই শুলাম। তুমি পড়বে, অর্থ করবে, তবে উঠবো।'

'যদি অর্থ করতে না পারি?'

'আমার শুয়ে-শুয়ে পা নাচানো বন্ধ করতে তো আর পারবে না।'

কুমারী নয়নতারা রাজচন্দ্রর দিকে চেয়ে ছিলো কিন্তু হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেলো তার মন— কিন্তু এ যে কিশোর, একেবারে ছেলেমানুষ। নয়নতারা বললো, 'আচ্ছা রাজকুমার, এর পর যেদিন বলবেন আমি আপনাকে বলবো এর অর্থ। আমি ব্যাকরণ, টীকা, অন্বয় সব ঠিক ক'রে রাখবো পুঁথি ঘেঁটে।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ। কথা দিচ্ছি।'

'তাই ব'লে আমি উঠছি না। গল্প বলো একটা, শুনি।'

'গল্প?' নয়নতারা অবাক হ'য়ে তাকালো রাজচন্দ্রর চোখের দিকে।

রাজচন্দ্র হাত বাড়িয়ে নয়নতারার ডান-হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে-করতে বললো, 'তোমার গল্প। তুমি একা-একা কি ক'রে থাকো, কি ভাবো, রাত্রিতে ভয় করে কিনা— এই সব। এ কি, তুমি কাঁপছো কেন?'

'না, কাঁপবো কেন! সুড়সুড়ি লাগছিলো আঙুলে।'

নয়নতারা নিজের কাঁপা-কাঁপা একটা ভাবকে পুড়িয়ে দিলো নিজের ভেতরে। কিন্তু বললো, 'আমাকে তোমার খুব ভালো লাগে?'

'ভয়ানক।'

কয়েকটি চুল রাজচন্দ্রর কপালে এসে পড়েছিলো, নয়নতারা সেগুলো আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিলো তার মনে হ'লো, সে প্রশ্ন করবে, কেন এত ভালো লাগে; কিন্তু মনে হ'লো, সে এমনি প্রগল্‌ভা হ'য়ে পড়ছে কোনো প্রশ্ন না-ক'রেই। প্রশ্ন ক আদৌ উচিত হবে না।

রাজচন্দ্র বললো, 'বললে না তোমার গল্প? আমার মনে হয় একদিন সারাদিন সারারাত তোমার কাছে থাকি, দেখি, তুমি কি করো।'

নয়নতারা নিজের অজ্ঞাতেই মুচকি হেসে বললো, 'থেকো একদিন।'

'হ্যাঁ থাকবো। সেদিন পূর্ণিমা হওয়া চাই। বারান্দায় ব'সে-ব'সে দু-জনে অনেকক্ষণ গল্প করবো। বাঁশ গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে চাঁদ উঠে পড়বে। তবু আমরা গল্পই করবো।'

একদিন রাজচন্দ্র অভিমান ক'রে বসলো। নয়নতারার কাছে এসে নিজেকে তার তুলনায় ঐশ্বর্যবান ব'লে কখনো তার মনে হ'তো না, বরং নয়নতারাকেই পরিপূর্ণা ব'লে মনে হ'তো; কিন্তু প্রিয়জনকে উপহার দিতে সাধ যায় বৈকি মানুষের।

মসলিন বলতে কতকটা আজকালকার টিস্যু বেনারসি শাড়ির মতো

যে কাল্পনিক জিনিসকে আমরা আন্দাজ ক'রে নিই ঠিক সে-রকম নয়। মুঠি ক'রে ধরলে তবে বোঝা যায় কাপড়টা ডালিমফুলী রঙের; নতুবা ঘাসের সামনে মেলে ধরো, মনে হবে ঘাস-রং। আকাশের দিকে তুলে ধরো, মনে হবে আকাশী। এত পাতলা, কিন্তু কি সমান বুনোন। সব চাইতে সুন্দর শাদা সুতোয় তোলা বুটিগুলো।

প্রাত্যহিক ঘোড়ায় চড়ার ব্যায়ামটা শেষ ক'রে ফিরছিলো রাজচন্দ্র। পিয়েত্রোর বাঁধা জোলাদের মধ্যে প্রধান দবীর বক্সের বাড়িটা পথের ধারেই। ঘোড়া সেই বাড়িটার কাছাকাছি আসতে দু-একজন লোক রাজচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে পথের ধারে যুক্তকরে দাঁড়ালো।

'কি ব্যাপার, তোমাদের সকলের কুশল তো?'

'হুজুরের রাজ্যে সকলেই ভালো আছি। হুজুর আমাদের একটা বিচার ক'রে দিন।'

হাসিমুখে রাজচন্দ্র বললো, 'কি বিচার, কি হয়েছে?'

'হুজুর, আমরা বাজারের দোকানদার। দবীর চাচার কাছে আমরা সকলেই টাকা পাই। তেল, নুন, চাল, ডালের জন্য পায় ওরা, আর আমি পাই তামাক আর অন্য মসলার জন্য। দবীর চাচা আমাদের খবর দিয়েছে কাল, সে সব দেনাপাওনা শোধ ক'রে দিয়ে আজমীর শরিফের দিকে রওনা দেবে। হুজুর, দবীর চাচার এ গের্দে ঠাট্টার জন্য নাম আছে। আমরা সহজে আসি নি, অনেক খবরাখবরের পর এসে দেখছি— সেই ঠাট্টা। একখানা শাড়ি দিয়ে বলছে, এটা নিয়ে সব ধার সকলে শোধ ক'রে দাও।'

'শাড়িটা কি বাজে, তাতে কি তোমাদের ধারের টাকা ওঠে না?'

'আজ্ঞে দাম কত তা আমরা জানি নে। এই যে লোকজন দেখছেন, সকলেই এসেছে ওই শাড়ি দেখতে, দামের কথা কেউ জানে না। কত দাম হ'তে পারে এ-কথা জিগ্যেস করলে সকলেই মাথা চুলকোচ্ছে।'

'দবীর নিজে কি বলছে ?' রাজচন্দ্র জিগ্যেস করলো।

'আজ্ঞে তিনি হাসছে আর বলছে, যার সাহস থাকে ন্যায্য দাম ফেলে তুলে নেও। আমি ঠিক এই রকম শাড়ি আর বুনবো না এটা আমি ব'লে দিতে পারি। এর জোড়া আর হবে না।'

'পিয়েত্রোসাহেবের দরবারে যাও তোমরা, তিনি শাড়ি সম্বন্ধে খুব ভালো মতামত দিতে পারবেন।'

'আজ্ঞে পিয়েত্রোসাহেবের লোকও আছে ওই দঙ্গলের মধ্যে। তারা বলছে, ওই শাড়ির যা দাম তাতে পাঁচখানা মুর্শিদাবাদী গরদ হয়। লাভ কি মসলিন কিনে ? তারপর হাত দিয়ে বলছে কাপড়ে— ও সব্বনাশ, এও তো রেশমির চাইতে রেশমি সুতোর। এর দাম করার সাহস আমাদের নেই।'

রাজচন্দ্র ঘোড়া থেকে নেমে বললো, 'চলো, আমি শাড়িটা দেখবো।'

রাজকুমার আসছেন শুনে দবীর বক্স তার সাকরেদ আল্লারাখা বসাকের সঙ্গে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

রাজকুমার বললো, 'কি ব্যাপার ওস্তাদ দবীর বক্স ?'

'কিছু না হজরৎ, এদের চক্রান্ত। আমি বলছি তোমরা ন্যায্য দামে কিনে নেও। কেউ দাম বলবে না, কেবল হাসাহাসি করছে।'

'তুমি নিজেই দাম বলো না ?'

'হুজুর, আমি তো দোকানদার না, আমি দামের কি জানি।'

'দেখি কাপড়টা।'

তখন আল্লারাখা বসাক লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে শাড়িখানা রাজকুমারের হাতে দিলো। একখানা রেশমি রুমালের যে ওজন শাড়িটার ওজন তার চাইতে বেশি নয়। রাজকুমারের হাতের উপরে ডালিমফুলী রঙের একখানা রুমালই যেন দিলো আল্লারাখা। কিন্তু যখন দবীর বক্স

আর আল্লারাখা দু-জনের আঙুলের ওস্তাদিতে শাড়ির ভাঁজ খুলতে লাগলো তখন শাড়িটা অদৃশ্যপ্রায় হ'লো। শাড়ি দেখে গুঞ্জন উঠলো। শাড়িটা খুলে দেখার সৌভাগ্য এর আগে আর কারো হয় নি।

রাজকুমার এদের দিকে ফিরে বললো, 'কত দাম হ'তে পারে এর ? তোমরা এর কত দাম দিতে পারো ?'

'আজ্ঞে পিয়েত্রোসাহেব বলেছেন এক শ' টাকার চাইতে দামী শাড়ি আমরা কিনবো না।'

'শাড়ি যদি তার চাইতেও দামী হয় ?'

'আজ্ঞে বিক্রি হবে না। আজকালকার খরিদ্দাররা সোনা-চাঁদির কাজ-করা বেনারসির দিকে ঝুঁকেছে। এ-সব শাদামাটা কারিগরির দিকে মন নেই।'

'বেশ তো, এক শ' টাকাই দাও না। তাতে কি দবীর বক্সর সব ধার শোধ হয় না ?'

'তা হয় না, হুজুর। ও-শাড়ির দাম এক শ' টাকার অনেক বেশি।'

হঠাৎ রাজচন্দ্র অন্য ভাবে কথা বললো, 'আচ্ছা দবীর মিয়া, আমার বাবার কালে তুমি কি শাড়ি দিয়েছো আমাদের বাড়িতে ?'

'জি।'

'এ-রকম শাড়ির কি দাম পেতে ?'

'জি, দাম নেবার কথা ছিলো না। বছরে এক জোড়া শাড়ি বরাদ্দ ছিলো আমার উপর। তাতে আমার চেলা-সাকরেদ সহ খাওয়া-পরার খরচ চলতো ছ'মাস।'

রাজচন্দ্র একটু-সময় চিন্তা করলো। প্রথমে তার মনে হ'লো এ-রকম সব ওস্তাদের দুঃখকষ্টে সাহায্য করা উচিত, তারপর মনে হ'লো শাড়িটা

কি নয়নতারা পরবে? তারপরই মনে হ'লো, নিশ্চয়ই সে কিনবে শাড়িটা। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের মধ্যে নয়নতারা শাড়িখানা প'রে দাঁড়ালো।

'দবীর মিয়াঁ, তোমার ধারের পরিমাণ লিখে ঠিক ক'রে শাড়িটা নিয়ে আমার কাছে যেয়ো।'

এইভাবে শাড়িটা এল রাজচন্দ্রের কাছে।

তখনও বেলা আছে। শীতের পড়ন্ত বেলায় শাড়িখানা নিয়ে রাজচন্দ্র নয়নতারার বাড়িতে গেল।

নয়নতারার কাছে কয়েকজন লোক ওষুধের জন্য ব'সে ছিলো। সে কখনো হেসে, কখনো কোনো লোভী কু-আহারী রোগীকে ভৎর্সনা ক'রে তাদের খবরাখবর করছিলো। রাজকুমারকে আসতে দেখে লোকগুলো তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রে বিদায় নিলো।

নয়নতারা তার ওষুধের ঝাঁপিটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললো, 'এমন ক'রে তুমি যদি সব সময়ে আসো, আমার রোগীরা ভয়ে ভেগে যাবে।'

'যত যায় তত মঙ্গল।'

'কী সব্বনেশে ভালোবাসা, আমার দিন চলবে কিসে?'

'না-চলাই তো আমি চাই। এবার ছাখো তো এটা কি?'

'বাঃ, বেশ শাড়ি তো, মসলিন বুঝি?'

'হ্যাঁ। কেন এনেছি বলতে পারো?'

রাজকুমারের এখনও রাজকন্যে আসে নি। এ-শাড়ি যে তার জন্যেই সে এনেছে তা' বুঝতে দেরি হ'লো না নয়নতারার। মসলিন জিনিসটার মূল্য কখনো-কখনো খুব বেশি হয়— এটা জানতো সে। হয়তো দামের

দিক দিয়ে এ-শাড়িখানা রাজকুমারের কাছে সাধারণ, কিন্তু গ্রহণ করার কি যুক্তি আছে নয়নতারার।

'রাজকুমার!'

'হ্যাঁ মিতেনি, তোমার জন্যেই।'

'ছি, ছি, রাজকুমার, আমার জন্যে কি ও-সব আনতে হয়!'

'কেন, বন্ধু নও তুমি আমার!'

'লোকে শুনলে কি বলবে তোমাকে?'

'যার যা খুশি বলুক। তুমি এখন একবার এটা পরো তো। প'রে আমার সামনে দাঁড়াও।'

'তা হয় না।'

'সে কি, কেন হয় না?'

'তা হয় না। ও-সব কাপড় আমাদের পরতে নেই।'

'কেন পরতে নেই, কোন শাস্ত্রে নিষেধ আছে?'

রাজচন্দ্র একটা অনুচিত কাজ ক'রে ফেললো। নয়নতারার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার আঁচলটা স্পর্শ করলো। যেন সে নিজেই মসলিনটা পরিয়ে দেবে তাকে। দৃঢ় মুঠিতে আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে নয়নতারা বললো, 'রাজকুমার, বোসো। আমার কথা শোনো।'

কিন্তু রাজচন্দ্র বসলো না। তার ঠোঁট কাঁপলো, চোখ ছলছল ক'রে উঠলো, গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠলো।

'রাজকুমার, রাগ কোরো না। ভালো কথা, তুমি বলেছিলে মেঘদূত পড়বে। এসো, আমরা মেঘদূত পড়ি।'

রাজকুমারের সামনে মসলিন প'রে দাঁড়ানোর চাইতে তার পাশে ব'সে মেঘদূত পড়া অনেক সহজ, এখন মনে হ'লো নয়নতারার।

'শোনো, শোনো, রাগ ক'রে চ'লে যেয়ো না।'

রাজকুমার আঙিনা পার হ'য়ে নতমস্তকে চ'লে গেল। নয়নতারা অনেকক্ষণ কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর এক-সময়ে তার চোখের প্রান্তে জল এল।

মাটি থেকে মসলিনখানা কুড়িয়ে নিয়ে সে তুলে রাখলো। আবার রাজকুমার আসবে, তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, বুঝিয়ে বললে সে বুঝবে।

তার পরদিন রাজকুমার এল না।

॥ সাত ॥

অবশেষে উৎসবের দিনটি এল। রাজবাড়ির তোরণে প্রভাতে নহবত বাজলো। দাস-দাসীদের পরনে কোরা কাপড়। দাসীদের মুখের পানে, দাসদের মাথার লাল গামছায় উৎসব ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পূজার দালানে ব্রাহ্মণ-কায়স্থঘরের বৌ-ঝি ও বিধবারা বসেছে। তিন-চার জন একপাশে ব'সে রান্নার মসলা বাচছে, তাদের চাইতে খানিকটা দূরে পাঁচ-সাত জন ব'সে রান্নার চাল ঝেড়ে বেছে পরিষ্কার করছে। সকলেরই তটস্থ ভাব। এদের মধ্যে সবাই ভক্তিমতী নয়। কিন্তু নেহাত টাকার বদলে যে কাজ করতে বসেছে তারও তটস্থ ভাব। সকলের মনের মধ্যেই এই র[illegible] একটা ভাব কাজ করছে; পুজোটা কালীর, অন্য কেউ নয় যে ক্ষমাঘেন্না করবে।

দালানের বাঁ-দিক দিয়ে চলতে-চলতে একটা থামের আড়ালে পুরুষদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। পুরোহিত সঙ্গে দু-জন ব্রাহ্মণ নিয়ে ব'সে যজ্ঞের কাঠ, বেলপাতা বেছে রাখছেন।

কাজের তুলনায় মাঝে-মাঝে কলরব বেশি হচ্ছে বৈকি। এ-সব ব্যাপারে রানীর আত্মীয়া দু-একজনই সর্বময় কর্ত্রী। তাদের কেউ যখন এসে দাঁড়াচ্ছে কোলাহল ক'মে যাচ্ছে। আত্মীয়স্থানীয়া একজন এসে এদের মনে করিয়ে দিলো, 'কথা বোলো না, থুথ্ ছিটোলে সব নষ্ট হবে।'

দালান থেকে নেমে কিছুদূর গিয়ে চার-পাঁচ জন জোয়ান যেখানে ভোগ-রান্নার কাঠ ফাড়ছে সেখানে দাঁড়ালে দেখা যাবে আট-দশটা পাঁঠা বাঁধা আছে। ছোলা, কাঁঠালের পাতা খাওয়ানোর জন্য দু-একটা উলঙ্গ শিশু জুটে গেছে সেখানে।

বাইরের তোরণ থেকে সানাই-এর ভৈরবী রাগিণীটা অত্যন্ত মধুর হ'য়ে কানে আসছে, কিন্তু সেদিকে খুব-একটা লক্ষ্য করছে না কেউ।

কাছারিবাড়ির বড়ো আঙিনাটায় শামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। বড়ো শামিয়ানা, ঝালরগুলো একটু বিবর্ণ হয়েছে, নতুবা দেখতে ভালোই লাগছে। শামিয়ানার নিচে বাঁশ পুতে একটা অংশ চিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। পর্দানশিনাদের জায়গা হবে ওদিকটায়। শামিয়ানা টাঙানোর আগে বোধ করি কাল আঙিনার ঘাস চেঁচে ফেলে গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেওয়া হয়েছে মাটি। একটা রোদ পেয়ে আঙিনাটা খট্‌খট্‌ করছে।

কাছারির পেছনের দিকে ছোট্টো বাগান। বাগানে অবশ্য ফুলগাছ নেই, দু-একটা কাঠচাঁপা, এক-আধ ঝাড় হাস্নুহেনা। বাগানের ভিতর কিছুদূর গেলে একটা খড়ের চাল দেওয়া পাকা দেয়ালের ছোটো বাড়ি চোখে পড়ে। এটার ব্যবহার ঠিক বোঝা যায় না। পাশাপাশি আট-দশটা কুঠুরি। প্রায় সবগুলোই তালাবন্ধ। শুধু এক ধারের খানতিনেক খোলা আছে। তার মধ্যে একখানিতে আট-দশ জন লোক। সকলেরই বাবরি চুল, গাঁজার নেশায় সকলেরই প্রায় চোখ লাল। ঘরের এক কোণে ঢোল, তব্‌লা, সারেঙ্গী, বীন্‌ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ছড়ানো রয়েছে। এরাই যাত্রাগান করবে। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে কয়েকটা লোক ও তার চাইতে বেশিসংখ্যায় ছেলেপুলে এসেছে।

অন্য ঘর দু-খানির লোকদের সঙ্গে এদের কোনো সংস্রব নেই। সে ঘর দু-খানির একটিতে তিনজন লোক উবু হ'য়ে বসেছে একটা ফুর্সিকে ঘিরে, ধূমপান করছে, কথা বলছে কম। সেদিকে লোকের ভিড় জমার সুবিধা নেই। অন্যটিতে দুটি স্ত্রীলোক। একজনের বয়স ত্রিশ পার হয়েছে। একটু যেন রোগাটে, হাত-পাগুলো শুকনো-শুকনো, মুখে মেচেতার দাগ, পানের রসে দাঁতগুলো কালচে, চোখে সুর্মার টান। অন্য স্ত্রীলোকটির বয়স কম। উদ্ধত যৌবন, বিলাসমুখিনতার ছাপ চোখেমুখে, কিন্তু চোখ দুটিতে নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টি। জড়বুদ্ধির আর-একটা প্রমাণ এর

হাসি। অকারণে শব্দ ক'রে পারিপার্শ্বিককে সচকিত ক'রে হেসে উঠছে অল্পবয়সী স্ত্রীলোকটি। ভাঙের নেশায় এমনি ক'রে হাসে নেশাখোররা। এদের পরিনে পশ্চিমদেশী পোশাক। পাঞ্জাবি ও পায়জামা। অবশ্য ওড়নার বালাই নেই। এরা নাচওয়ালী।

সদর-নায়েব তার কর্মভার সুচারুরূপেই নির্বাহ করছে।

সারা গ্রামে চঞ্চলতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং চঞ্চলতার একটা মূল সুর কখন সন্ধ্যা হবে, এই প্রশ্ন। সহজেই শীতের সন্ধ্যা এল।

পূজা-দালানে ঢাক বেজে উঠলো, নহবতখানায় সানাই দু-একবার প্যা-প্যাঁ সুরে বেজে উঠলো; লোক ছুটতে লাগলো কাছারির উঠোনের দিকে।

অভিনয়ের বিষয় বিদ্যাসুন্দর। আসরে তিল ধারণের স্থান নেই। মাঝখানে দাঁড়িয়ে অধিকারী কালীকীর্তন শুরু করেছে।

শ্রোতাদের চোখ জ্বলছে। পালা মাঝামাঝি এসেছে, যুবারা সোজা হ'য়ে উঠে বসেছে উৎকণ্ঠায়। বয়োবৃদ্ধরা রামপ্রসাদী সুরের দোলায় দুলছে।

জনসাধারণের পাশ কাটিয়ে রাজচন্দ্র আসর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। রূপচাঁদ এল তার পিছু-পিছু।

'তুই যা, গান শোন্ গে। আমার কিছু দরকার নেই।' রাজচন্দ্র রূপচাঁদকে বললে।

আকাশে তারা আছে। ধোঁয়ার মতো একফালি মেঘ একগুচ্ছ তারার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তারাগুলির প্রত্যেকটি যেন অসাধারণ বড়ো দেখাচ্ছে। আকাশের রং কালো নয়, যেন অত্যন্ত গভীর বর্ণনাতীত নীল।

রাজচন্দ্রর মনে হ'লো যেন একটা কাঁচের গোলকের মধ্যে সে আছে। আর এটা যে সে অনুভব করছে, এটাও যেন পুরোপুরি তার অনুভূতিতে নেই।

চোখের সম্মুখে একটি প্রাণ মুছে যেতে দেখে যেমন অপূর্ব অনুভব হয়েছিলো, চোখের সম্মুখে অভিনয়ের নায়ক-নায়িকা আর-এক অপূর্বতায় যুক্ত ক'রে দিলো তার অভিজ্ঞতাকে। প্রেম লালসার হিংস্রতায় উত্তপ্ত হ'য়ে উঠছে। সে-লালসা এখনও দুঃসহ হয় নি, জ্ব'লে যাচ্ছে না অন্তর। কিন্তু আহার্য যেমন দেহকে উত্তপ্ত করে তেমনি সে-লালসা সবলতা এনে দিচ্ছে চিন্তায়।

প্রায় তার গায়ের উপর দিয়ে একটি পালকি হাঁই-হুঁই করতে-করতে চ'লে গেল। ওদের দোষ নয়, অন্ধকারে মানুষ ঠাহর করাও কঠিন, রাজকুমার ব'লে চেনা অসম্ভব। সুন্দরও এক দেশের রাজপুত্র, এমনি অন্ধকারে সে যাচ্ছিলো বিদ্যার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। আসরের লালচে আলোগুলো চোখে পড়ছে, কিন্তু ইতিমধ্যে এতটা দূরে সে এসে পড়েছে যে গানের কথাগুলোর চাইতে সুরই বেশি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

পালকিটা যাচ্ছে দেওয়ান-ভবনের দিকে। দেওয়ান-ভবনের সামনের টানা-বারান্দায় ঝাড়ের আলোগুলো ঝলমল করছে। রাজচন্দ্রর মনে পড়লো নাচের কথা।

নাচের আসর কি রকম হচ্ছে কে জানে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাকে কেউ ডাকতে আসে নি। বোধ হয় এখনও কিছু দেরি আছে।

পায়চারি করতে-করতে সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা সিংদরজায় যাবার পথ। সেদিকে তাকিয়ে সিংদরজার বাইরের কিছুই নজরে পড়লো না। সিংদরজার থামগুলোর এ-পিঠটায় অস্পষ্ট আলো পড়েছে। অস্পষ্ট ফ্রেমে-আঁটা গাঢ়তম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জোনাকি উড়ছে।

জোনাকিগুলোর মধ্যে দিয়ে চ'লে গেলে ওই অন্ধকারে নয়নতারার বাড়ির পথ।

কিন্তু নয়নতারা তাকে অপমান করেছে।

সহসা রাজচন্দ্রর মন অস্থির হ'য়ে উঠলো। নয়নতারাও কি বিন্দার মতোই একজন নারী! তেমনি সব—

কিন্তু ভাবনায় বাধা পড়লো। দু-জন লোক আলো হাতে, তাদের সঙ্গে রূপচাঁদ, এদিকে এল। ম্লান আলোতেও রূপচাঁদ তাকে চিনতে পারলো এবং দাঁড়ালো।

'কি রে রূপচাঁদ, আলো হাতে কোথায় ঘুরছিস?'

'আজ্ঞে হুজুর আপনাকে খুঁজছি, ওদিকে যাবেন না?'

'কোথায়, নাচের আসরে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডান্‌কানসাহেব এসেছে, পেত্রো এসেছেন। ডিপুটি-সাহেবও এসেছেন।'

'বটে? তা তারা তো তোদের দেওয়ানের অতিথি।'

'সে কি হুজুর, আপনি না-গেলে যে কেউ নাচের আসরে ঢুকছে না। চলুন।'

দেওয়ানবাড়ির বড়ো হল-ঘরখানা দেয়ালগিরি ও ঝাড়ের আলোয় ঝকঝক করছে। দেয়ালে এদিক-ওদিক খানকয়েক বড়ো-বড়ো আরসি বসানো হয়েছে এবং সেগুলি থেকে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে আলো। মেঝেতে নীল কামদার গালিচা পাতা। দেয়ালের কোল ঘেঁষে-ঘেঁষে ছোটো-ছোটো গদিমোড়া ফরাস। একদিকের দেয়ালের ফরাসটি রাজকীয় আড়ম্বরে সজ্জিত। লাল মখমলের গদির গায়ে জরির কাজ, তাকিয়া-গুলোর গায়ে জরির ঝালর। এটা যে রাজকুমারপ্রমুখদের জন্য সংরক্ষিত, বুঝতে বিলম্ব হয় না।

হল-ঘরটির লাগোয়া একটি ছোটো কুঠুরিতে একটিমাত্র বেলদার ঝাড়ের তলায় একটা টেবিলের পাশে দেওয়ান, পিয়েত্রো এবং অন্য দু-জন লোক। তাদের মধ্যে এক জন শ্বেতাঙ্গ, অন্য জন ভারতীয়। রাজু অনুমানে বুঝলো, এরাই ডেপুটি এবং ডান্‌কান।

হরদয়াল উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে বললো, 'এই আমাদের রাজকুমার আসছেন, রাজকুমার দীর্ঘজীবী হোন। ইনি রাজকুমার, ইনি মরেলগঞ্জের ডান্‌কান হোয়াইট্।' হাসিমুখে ডান্‌কান হাত বাড়িয়ে দিলো, 'হা ডু ডু, থ্যাঙ্কস্ অ'ফুলি ফর দি ইনভিটেশ্যন।'

রাজকুমার নমস্কার করলো। সে ইংরেজি জানে না। নীরব হ'য়ে রইলো। হরদয়াল অতঃপর ডেপুটির সঙ্গে রাজচন্দ্রর পরিচয় করিয়ে দিলো। ডেপুটিও ইংরেজিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো এবং রানীর দীর্ঘ-জীবন কামনা করলো। হরদয়াল পিয়েত্রোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। পিয়েত্রো উঠলো না। হাতের ইশারায় রাজকুমারকে তার পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলো। রাজকুমার সেই চেয়ারটায় বসতে পিয়েত্রো তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো।

হরদয়াল নিজের হাতে ডিক্যাণ্টার ধরলো। গেলাসগুলো পূর্ণ ক'রে নিয়ে অভ্যাগতরা পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করলো। রানীর স্বাস্থ্যপান আগেই হয়েছিলো। ডান্‌কান উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বাস্থ্যপান প্রস্তাব করলো, হরদয়াল এবং ডেপুটি সহর্ষে ও সোল্লাসে গ্লাসে গ্লাস লাগিয়ে তা সমর্থন করলো। পিয়েত্রো অর্ধোত্থিত হ'য়ে হাসি-হাসি মুখে গ্লাস এগিয়ে দিলো।

সকলে আসন গ্রহণ করলে পিয়েত্রো বললে, 'আমার গাউট, মিস্টার ডান্‌কান, অমন সহসা কারো স্বাস্থ্য কামনা ক'রে আমাকে বেমওকায় ফেলবেন না।'

ডান্‌কান বললে, 'মনসেনে, আপনার ভঙ্গিটিই সব চাইতে স্বাভাবিক হয়েছে।'

ডেপুটি যোগ দিয়ে বললো, 'এবং সুচারু।'

এদের ইংরেজির মাঝখানে নিজেকে বোকা-বোকা লাগছিলো রাজচন্দ্রর। সে যেন কেউ নয়, এমনি মনে হচ্ছিলো তার। পিয়েত্রো তাকে চুপি-চুপি বললে, 'রাজু, তোমার সঙ্গে যে-ভাষায় কথা হবে সেই ভাষাতেই উত্তর দেবে।' রাজচন্দ্রর যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিলো, প্রস্তাবটি শুনে সেটুকুও উবে গেল। কিন্তু পিয়েত্রো কতখানি ভেবে দাবা বোড়ে চালে, বিশেষ ক'রে এমন সাহচর্যে, সেটা রাজচন্দ্র জানতো না। পরে একদিন কথায়-কথায় বলেছিলো পিয়েত্রো অনর্গল হাসি এবং অনর্গল তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে— ইংরেজ জাতটা যতই লোককে নিজের ভাষার কথা শুনিয়ে বেড়াক, আসলে ফরাসী ভাষা তাদের স্বপ্নের ভাষা। সুযোগ পেলে ইংরেজরা তাদের ফরাসী ভাষা-জ্ঞান জাহির না-ক'রে পারে না।

পিয়েত্রো বললো ফরাসী ভাষায়, 'রাজকুমার, আপনার মা মহীয়সী রানীকে আমাদের নমস্কার জানাবেন। বলবেন, প্রতিবেশিদের প্রতি তাঁর সমবেদনা আমাদের আবার নতুন ক'রে মুগ্ধ করেছে।'

কথাটা সামান্য, মনে-মনে মক্‌সো ক'রে রাজচন্দ্র দু-তিনটে কথা যোগ ক'রে-ক'রে একটা বাক্য খাড়া ক'রে ফেললো— 'মায়ের পক্ষ থেকে প্রতিবেশিদের সমবেদনার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।'

পাছে ভুল হয় এই ভয়েই তার কান দুটিও লাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু ডান্‌কান ও ডেপুটি নয় শুধু, হরদয়ালও বিস্মিত হ'লো। পিয়েত্রোও ভাবলো, ছোকরা ভালো শিখতে পারবে তো ফরাসী!

এবার ডান্‌কানের পালা। সে কেউকেটা নয়, হ্যারোর স্কুল থেকে পাস করেছে, ফরাসী দেশে বেড়িয়েছে, কন্টিনেন্টে ঘোরাও তার ভাগ্যে

ঘটেছে। ইদানীং সে মরেলগঞ্জের ইণ্ডিগো লিমিটেডের ম্যানেজার। এমন কি কেউ-কেউ তাকে ফ্যাক্‌টরও বলে। সে বললে— তার ফরাসী তোবড়ানো-টুপির মতো— 'রাজকুমার, তোমার এই বদান্যতার কথা আমি কলকাতার সমাজে বলবো। যদি লাটসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁকেও বলবো তোমাদের দিকে নজর রাখতে।'

ডান্‌কানের ফরাসীর দম হারিয়ে যাচ্ছিলো। সে চালাকি ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে হরদয়াল ও ডেপুটিকে লক্ষ্য ক'রেই যেন বললো ইংরেজি ক'রে— 'আমরা প্রতিবেশী, প্রকৃত এবং খাঁটি প্রতিবেশী।'

ভাষার ব্যাপারটা আরও কিছুদূর হয়তো গড়াতো, এমন সময়ে পিয়েত্রোর হুঁকাবরদার প্রবেশ ক'রে প্রভুর পাশে গড়গড়াটা রাখলো। ডান্‌কানও চুরুট ধরালো। নিশ্চিন্ততার আনন্দে ডেপুটি ও হরদয়ালকেও এগিয়ে দিলো।

হল থেকে পিড়িং-পিড়িং ক'রে তার টানার শব্দ আসছিলো। সদর-নায়েব দরজার কাছে মুখ বা'র ক'রে বললে, 'হুজুররা এলেই নাচওয়ালী আসরে আসবে।'

রাজচন্দ্রর জীবনে এই প্রথম নাচ। অন্য সবাই অল্পবিস্তর ভালোমন্দ নাচ দেখেছে, কিন্তু সেই হল-ঘরের আরামদায়ক আসরে ব'সে অভিজ্ঞরাও খানিকটা বিস্মিত হয়েছিলো। যা রটে তার কিছু বটে, এই স্বগতোক্তি করলো রাজু কোণ-ঘেঁষা রাজকীয় ফরাসে ব'সে।

নাচওয়ালী প্রবেশ করলো। তার তবল্‌চী, বীন্‌কার এবং সারেঙ্গী বৃদ্ধ তিনটি যেন যমজ, তারা আগেই ব'সে ছিলো আসরে। নাচওয়ালী উরু মুড়ে বসলো ওদের মাঝখানে। তাঁর চোখের সুর্মা এবং আঙুলের মেহেদি, তার ঝুটা মোতির অলংকার এবং স্বচ্ছপ্রায় পেশোয়াজ এক মুহূর্তে হল-ঘরখানিকে পরিপূর্ণ ক'রে দিলো।

পিয়েত্রো দাড়িতে হাত বুলালো। অনেক নাচ দেখার সুযোগ তার হয়েছে। তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে' সেটা আর কারো চোখে পড়লো কিনা কে জানে। নাচওয়ালী বিশ জোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে হেঁটে এসেছে দরজা থেকে আসরের মাঝখানে। সেই পদক্ষেপগুলিও নাচ। সর্বাঙ্গ যেন হাওয়ায় ভেসে আছে, এত লঘু। শুধু পায়ের সুশিক্ষিত আঙুল ক'টা অচঞ্চল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং চোখ দুটিতে নাচের তীব্রতম চঞ্চলতা সংহত হ'য়ে দুলছে।

পিয়েত্রো হরদয়ালের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে জিগ্যেস করলো, 'কোথা থেকে যোগাড় করলেন?'

'আপাতত জেলার সদর থেকে, শুনছি নাকি অযোধ্যায় বাড়ি।'

'অযোধ্যা?'

ডান্‌কান বললে, 'আউধ? নবাবের দরবার?'

রাজকুমার স্থিরদৃষ্টিতে নাচওয়ালীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

নাচ আরম্ভ হ'লো। হরদয়ালের নিজস্ব ভৃত্যটি রুপোর একটা বারকোশ নিয়ে প্রবেশ করলো। দু-তিনটি বোতল, ঝকঝকে কাঁচের গ্লাস।

নাচওয়ালী নিজের দেহটাকে কখনো ফেনহিল্লোলে পরিবর্তিত করছে, কখনো পুষ্পস্তবকে। সংগতদাররা সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে তার গতির সূক্ষ্ম সময়-বিভাগকে সুরের সূক্ষ্মতর বিভাগ দিয়ে সূচিত করার চেষ্টা করছে।

পিয়েত্রোর হাতের গ্লাসের ধার উপচে ফেনাগুলো গ্লাসের গা বেয়ে তার আঙুলের উপরে এসে জমছে। গ্লাস নামিয়ে রেখে সে সম্মুখের ফুর্সিটার নল নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলো।

নেশা মাথায় পৌঁছলে কেউ-কেউ নির্বাক দার্শনিক হ'য়ে যায়। ডান্‌কানের বয়স চল্লিশের ঘর এখনও পার হয় নি। ইতিমধ্যে একবার

তার হাতের গ্লাসে নাচওয়ালীর প্রতিবিম্ব পড়েছিলো। হ্যারোর স্কুলের চুল্লির পাশে ব'সে থাকা রাত্রিগুলির কথা ডান্‌কানের মনে পড়লো। কিছুদিন বেকার অবস্থায় কেটেছিলো তার, সেই দিনগুলির কথাও মনে পড়লো। এই ভারতবর্ষ। এলাচ লবঙ্গর দেশ, মসলিন ও সোনার দেশ, এই নাচের দেশ। আগুনের মতো গরম হ'য়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। এই সোনার দেশে সবই প্রখর। প্রখর এর আকাশ, প্রখরা এর নারী। যেন একটি কবিতা। ময়ূরের ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়ালো। সোনালি মখমলে নিপুণ তুলিতে টানা কালো ডোরা কাটা। মখমলের মতো মসৃণ উষ্ণস্পর্শ ব'লে আশা হয়। রানীর কণ্ঠের মালায় স্থান পাবার মতো ক্যাট্‌সআই পাথরে তৈরি চোখ, কী নরম, কী ভাস্বর সেই দৃষ্টি। কী অপূর্ব প্রাণনা, কী সর্বগ্রাসী নিথর নেশা।

প্রথম নাচ থামলে ডান্‌কান ইশারায় নাচওয়ালীকে ডাকলো। কুনিশ ক'রে নাচওয়ালী ফরাসের নিচে গালচেয় বসলো। ডান্‌কান জেব থেকে একটা গিনি বার ক'রে দিলো। নাচওয়ালী উঠতে যাচ্ছিলো, হাতের ইশারায় তাকে বসতে ব'লে নিজের হাতে ভ'রে এক গ্লাস সুরা দিলো। সুরাটুকু পান ক'রে নাচওয়ালী বাজনার সুরে কুনিশ ক'রে নাচতে-নাচতে গালচের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

দ্বিতীয় নাচের পর পিয়েত্রো উঠে দাঁড়ালো। রাজকুমার এবং ডান্‌কানকে নিজের গাউটের কথা ব'লে তাদের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। সম্মানিত অতিথিকে বিদায় দেবার জন্য হরদয়ালও উঠে গেল।

দেওয়ান-ভবনের ঘেরা গাড়ি-বারান্দার নিচে পিয়েত্রোর পালকি। পিয়েত্রো সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালকির পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'দেওয়ান, শোনো।'

দেওয়ান কাছে এলে পিয়েত্রো বললো, 'তুমি বাঘে-বলদে একঘাটে

জল খাওয়ালে হে দেওয়ান। যাই বলো, ডান্‌কান ছোকরা ভালো। দেখলাম ওর আগের লোকটির মতো বদ্‌মেজাজী নয়। তা বেশ করেছো। কিন্তু হুঁসিয়ার থেকো, স্ত্রীলোক নিয়ে যেন নাচমহলে বচসা না হয়। দেখলাম ডান্‌কানের বেশ নেশা লেগেছে।'

হরদয়াল হেসে বললো, 'আপনার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে যেন বঞ্চিত না হই।'

হরদয়াল ফিরে এসে দেখলো ডান্‌কান ও রাজচন্দ্র পাশাপাশি বসেছে। ডান্‌কান ভাঙা-ভাঙা বাংলায় কথা বলছে, রাজচন্দ্র তার উত্তর দিচ্ছে। সম্ভবত দ্বিতীয় নাচওয়ালী নাচবে, নতুন ক'রে সুর বেঁধে নিচ্ছে যন্ত্রে। হরদয়াল ফরাসের একটি কোণে বসলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নাচ শুরু হ'লো।

কোথায় যেন শোনা গেছে, পেশোয়াজ ওড়না মুসলমানযুগের আমদানি। কিন্তু তারও আগে নাচ ছিলো। বৌদ্ধযুগে ছিলো, স্বর্গে উর্বশীরাও নাচতো। কি রকম পোশাক ছিলো তাদের নাচের? এ-নাচওয়ালীটির মতোই কি? সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়েদের মতো শাড়ি পরা, কোমরে মোটা একটি ফুলের মালা, হাতে ফুলের বলয়, গলায় ও কপালে ফুলের সাজ। যেন একটি গৃহস্থ-মেয়ে হাতের কাজ ফেলে নেচে উঠলো। —এই কথাগুলো রাজচন্দ্র চিন্তা করছিলো তখন।

কিন্তু সে জানতো না অর্ধ অসংবৃত বাস এ-নাচের দুর্ঘটনা নয়, অঙ্গ; নতুবা কাঁচুলিতে অত কারুকার্য থাকতো না।

রাজচন্দ্র দেখলো, হরদয়াল এক-সময়ে উঠে গেছে। ডেপুটি কখনো হাতের আড়ালে চোখ ঢাকছে, কখনো দেখছে নাচ। ডান্‌কান একটা রুমাল ছুঁড়ে দিলো নাচওয়ালীর দিকে।

কত রাত্রি পর্যন্ত আজ নাচ চলবে কে জানে। মনে হ'লো আলোগুলো

লালচে হ'য়ে আসছে। ডান্‌কান ডান-হাতের তর্জনী দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেললো।

আবার প্রথম নাচওয়ালীর নাচ শুরু হ'লো।

কিন্তু নাচের মাঝখানে ডান্‌কান বললো, 'দুসরা কো বুলাও।'

প্রথম নাচওয়ালী যেন জানতো এমনটা ঘটবে, সে নাচ বন্ধ করলো না। দুসরা নাচওয়ালী মুখে আঁচল চেপে হাসতে-হাসতে ডান্‌কানের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

ডান্‌কান তাকে ফরাসে বসিয়ে সুরার পাত্র এগিয়ে দিলো। নাচওয়ালী খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। ডান্‌কান প্রথমে অবাক। তারপর সে-ও হাসিতে যোগ দিলো।

নাচ থেমে গেছে। অতিথিরা চ'লে গেছে। দেওয়ান-ভবনের ভৃত্যরা নাচঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বারান্দার আলো নিভিয়ে দিচ্ছে।

নিজের শোবার ঘরের বারান্দায় ম্লান আলোকে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে হরদয়াল ভৃত্যকে জল আনতে বললো। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলই এখন প্রয়োজন তার। শীতের মাঝরাত্রি। কিছুক্ষণ আগে দেউড়িতে দারোয়ান দুটো বাজিয়েছে। সন্ধ্যার কলকোলাহল একেবারে মগ্ন হ'য়ে গেছে, দূর থেকে ঠাকুর-দালানের একটা মৃদু শব্দ কানে আসছে।

ভৃত্য এলে তার হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ ক'রে হরদয়াল বললো, 'নেবু পেয়েছিলি তা হ'লে। বেশ, এবার ছাখ্‌ তো রূপচাঁদকে পাওয়া যায় কিনা।'

ভৃত্য চ'লে গেল।

মাথাটা টিপটিপ করছে। বারান্দায় রেলিং-এ হেলান দিয়ে হরদয়াল শিরশিরে বাতাসটা অনুভব করলো।

সহজেই পাওয়া গেল রূপচাঁদকে।

'কুমার কোথায় রে রূপচাঁদ ?'

'আজ্ঞে তাঁর খাস-কামরায়।'

'আচ্ছা, যা।'

'কিছু বলবেন ?'

'না, খোঁজ নিলাম।'

রূপচাঁদ চ'লে গেলে হরদয়ালের ভৃত্য বললো, 'রাত অনেক হয়েছে, এর পরে খাবেন কি ক'রে ?'

'খাওয়ার রাত আগেই পার হয়েছে।'

'কিছুই খাবেন না ?'

'না। বালাপোশটা নিয়ে আয়। আর এই জামাজোড়া নিয়ে যা।'

ভৃত্য জামা নিয়ে গেল, বালাপোশ এনে দিলো। হরদয়াল বালাপোশ গায়ে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামলো।

এদিকে উৎসবের আলো নিভে গেলেও ঠাকুর-দালানের পূজা মহা-সমারোহেই চলছে। হোম হচ্ছে সেখানে। পূজারীদের অনতিদূরে রানী ব'সে আছেন। প্রতিমার দিকে তাঁর দৃষ্টি স্থির।

হরদয়াল একজন দাসীকে বললো, 'রানিমাকে জিগ্যেস করো, দেওয়ানের আর কাজ আছে নাকি।'

উত্তর দেবার জন্য রানী নিজেই উঠে এলেন। বারান্দার উপর থেকে হরদয়ালকে ডেকে বললেন, 'তোমার ওদিকের সব মিটেছে, হরদয়াল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পুজো মিটতে দেরি আছে। রাত অনেক হ'লো, বিশ্রাম নিলেও পারতেন।'

'নিজের ছেলের মঙ্গল কামনায় এক রাত জাগলে মেয়েদের কিছু হয় না, হরদয়াল। তোমার অতিথিরা সবাই এসেছিলো ?'

'হ্যাঁ, মরেলগঞ্জের ডান্‌কান এসেছিলো, ডেপুটিও এসেছেন। গিয়েছে
তো আসবেনই।'

'তাদের যথাযোগ্য সমাদর হয়েছিলো তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মরেলগঞ্জে রাজকুমারের নিমন্ত্রণ হয়েছে। সেখানে
দু-এক দিনের মধ্যে নাচের মজলিস হবে।'

'এ-বন্ধুত্ব কি চিরস্থায়ী করা যাবে?'

'আশা করা যাক। অন্তত তদন্তের কথাটা আর কোনো প্রকারে
কেউ তুলতে সাহস পাবে না।' চাপা গলায় হরদয়াল বললে।

রানী একটি মধুর হাসিতে হরদয়ালকে পুরস্কৃত করলেন।

রাজু বললো, 'রূপচাঁদ, মদ খেতে খারাপ নয় তো! আর-একটু
খাওয়াতে পারিস?'

'আজ্ঞে তা পারা যায়।'

'যা, নিয়ে আয়।'

রূপচাঁদ চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ আগে আর-একটা ভৃত্যকে ব'লে তামাক সাজিয়েছে রাজু।
সেটা পুড়ে-পুড়ে সুগন্ধ ছড়াচ্ছিলো। রুপোর টোপর ঢাকা কল্‌কে।
টোপরের গায়ের ছিদ্রগুলো দিয়ে মধুরগন্ধী ধোঁয়া উঠছে।

রাজু ফুর্সির নলটায় মুখ দিলো। প্রথমে মিষ্টি স্বাদ লাগলো, কিন্তু
তারপরই বেদম কাসি এল।

ফুর্সিটা সরিয়ে রেখে সে জানলার পাশে দাঁড়ালো। নিচে শামিয়ানাটা
চোখে পড়ছে। বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে ব্যালকনিতে যাওয়া যায়।
সেই ব্যালকনির নিচেই বাগান শুরু হয়েছে। এখন কিছুই চোখে
পড়ছে না। অন্ধকারে অতিপরিচিত জিনিসের অবস্থান আন্দাজ করতে

কষ্ট লাগে। বাগানের সেই ঘরগুলোর মধ্যে নাচওয়ালীরা এখন ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

চিন্তার একটা বাঁক নিয়ে নিজেই আবিষ্কার ক'রে অবাক হ'লো, কোনোদিন সে চেষ্টা করে নি, নতুবা রাজপুরীর কোনো-কোনো জানলা থেকে নয়নতারার বাড়িটা চোখে পড়তো, নিদেন ছাদে উঠলে তো বটেই। এখন আর সম্ভব নয়। দিনের বেলায় দেখা যাবে চেষ্টা করলে।

রূপচাঁদ একটা ছোটো কালো মোটা বোতল ও গ্লাস নিয়ে এল।

'এনেছিস! তুই তো আচ্ছা ওস্তাদ! খুলবি নাকি?'

রূপচাঁদ বোতলটা খুলে গ্লাসে ঢেলে রাজুর সম্মুখে ধরলো।

'কোথায় পেলি?' গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললো রাজু।

'দেওয়ানের বাবুর্চির কাছে। বললো, এর নাম শ্যাম্পেন।'

'এটাই খায় নাকি সকলে?'

'তা তো জানি না আজ্ঞা।'

'তুই খাস না?'

'না আজ্ঞা।'

গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে আবার নামিয়ে নিলো রাজু।

'ভারি মজা রে। কেউ আমাকে কোনোদিন নিষেধ করে নি; রূপচাঁদ, তুই মদ খাস্ নে?'

'কেউ খেতেও তো বলে নি।'

'বেশ কথা। তুই ভারি চালাক। (রাজু হাসলো) তা হ'লে খেতেও বলে নি, নিষেধও করে নি। আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। খুব ইচ্ছে করছে।'

গ্লাসটা নিঃশেষ ক'রে রূপচাঁদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রাজু বললো, 'মা কোথায় রে? পুজোর এখনো অনেক দেরি নাকি?'

'হ্যাঁ, তা দেরি আছে।'

'আচ্ছা রুপু, তুই কি দেখেছিস নয়নতারা এসেছিলো কিনা ?'

'আজ্ঞে না, ঠাহর করি নি।'

'নয়নতারা আমার উপরে রাগ করেছে কিনা বলতে পারিস ?'

'আজ্ঞে তা-ও নয়।'

'না পারলি, না পারলি!' রাজু পালঙ্কে ব'সে বললো, 'আর-একটু দে তো।'

'আরও ?'

'দে-না, আহাম্মক। দিব্যি একটা ঘুম দিলেই সেরে যাবে। আর তুই দেওয়ানের বাবুর্চিকে জিগ্যেস ক'রে রাখবি, দেওয়ানের নেশা হ'লে কি খায়।'

'আজ্ঞে আচ্ছা।'

রাজুর মনে হ'লো, আশ্চর্য এই নয়নতারা। এলেই বা কি ক্ষতি ছিলো। ওই যে মেয়েটি এতগুলো পুরুষের সম্মুখে নাচতে পারলো মসলিন প'রে, আর তুমি আমার সামনে পরতেই পারলে না, এত লজ্জা!

রূপচাঁদ দরজার কাছে বসেছিলো। রাজু পালঙ্ক থেকে উঠে টেবিলের উপরে রাখা বোতল আর গ্লাসটা হাতে নিলো।

'তুই যা ভাবছিস তা নয়। এই ছাখ্ কতটুকু!'

রাজু আধমাত্রা ঢেলে নিয়ে ধীরে-ধীরে পান করলো।

'এমন উৎসব আর কোনোদিন হয় নি, না রে ? আচ্ছা, তুই কি এর আগে এমন উৎসব এ-বাড়িতে হ'তে দেখেছিস ?'

'আজ্ঞে না।'

রাজু তৃতীয় বার তামাকের কাছে গেল। কিন্তু এবার তার সাহস হয়েছে, দু-তিনবার টান দিলো নলটায়।

'ত্মাখ্ রূপচাঁদ, ঘুম আসছে না। একটু ঘুরে এলে কেমন হয় ?'

রূপচাঁদ বাইরের অন্ধকারের কথা তুললো। প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে রাজচন্দ্র সন্ধ্যায় শোনা সুন্দরের অভিসারের কথা বললে। রূপচাঁদ নিষেধের দ্বিতীয় যুক্তি তুলে বললো, 'রানিমার অনুমতি না-নিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত নয়।'

রাজু বললো, 'যাবো আর আসবো। ততক্ষণে তোর পুজোও শেষ হবে না।'

সদর-দরজা পার হ'য়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রূপচাঁদ বললো, 'আজ্ঞে এটা পথ নয়।'

'তুই আমার চাইতে বেশি জানিস ?'

রূপচাঁদ প্রমাদ গুনলো। নেশা হয়েছে সন্দেহ কি। বাগানের সেই ঘরগুলোতে যাবার পথ এটা নয় তা রাজকুমারের নেশার ঝোঁকে ঠাহর হচ্ছে না।

কিছুদূর গিয়ে রাজু বললো, 'তুই বিয়ে করেছিস রূপচাঁদ ?'

'আজ্ঞে।' অন্ধকারে রূপচাঁদের মাথা-চুলকানো দেখা গেল না।

'তোর বউ তোকে খুব ভালোবাসে ? ওই বিদ্যার মতো ?'

'আজ্ঞে ওনারা দেবতা।'

'দেবতা কি রে আহাম্মক। ওরা তো আমাদের মতোই মানুষ।'

'হুজুর, এটা বাগানের পথ নয়।'

'তা আমি জানি। যদি তোর ভয় করে তা হ'লে বলবি— কালু ইন্নু, আলহে ইন্নু এলাহে।'

'ওটা কি হুজুর ?'

'আলি খাঁ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো, ভয়ের সময় ওটা বললে আর ভয় থাকে না। কী ভালোই আমাকে বাসতো আলি খাঁ। পৃথিবীতে এক মা ছাড়া অত ভালো কেউ বাসে না।'

রাজু বুঝতে পারে নি, কিন্তু তার মস্তিষ্কে সুরা ধীরে-ধীরে প্রভাব বিস্তার করছিলো।

আরও কিছুদূর যাবার পর রাজু বললো, 'রূপচাঁদ, এবার ফিরে যা।'

'আজ্ঞে আপনাকে একা ছেড়ে দিয়ে যাবো কি, হুজুর!'

'যাবি না? যেতেই হবে।'

'আজ্ঞে তা হয় না। বেড়ানো হয়েছে, এবার চলুন।'

'না যদি যাবি তা হ'লে আমি অন্ধকারে একদিকে চ'লে যাবো, সারা রাত খুঁজেও পাবি না, যা বলছি!'

রূপচাঁদ 'আজ্ঞে' 'আচ্ছা' ব'লে চ'লে গেল।

নয়নতারার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রাজু সহসা ডাকতে পারলো না নয়নকে। এতক্ষণ পথে হাসি-তামাশায় কাটিয়ে দিয়েছে, রূপচাঁদ চ'লে যাবার পরই তার মনের একটা অংশ ফিরে যেতে চেয়েছিলো। তার প্রায়-কিশোর মনে সুন্দরের অভিসারের দুঃসাহসিকতাটা কাজ করছিলো, নিজেকে সুন্দর ব'লে ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু সে শুনেছে, সবটুকু বুঝতে না-পারলেও; অভিনয়ের একান্ত আদিরসাত্মক ইঙ্গিতগুলো তার মনে গিয়ে অভূতপূর্ব অনুভবের সৃষ্টি করেছিলো। হঠাৎ নয়নতারাকে ডাকতে গিয়েই সে-সব মনে পড়লো। পথে চলার লঘুতা হারিয়ে তার মনের বয়স একমুহূর্তে বেড়ে গেল। কি-একটা অজ্ঞাত উৎকণ্ঠায় তার গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠলো।

'নয়নতারা, নয়ন, নয়ন!'

নয়নতারা উঠে ব'সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

'নয়ন!'

নয়নতারা গলার স্বর চিনতে পেরে দরজা খুলে দিলো।

'রাজকুমার, এই রাতে?'

রাজুর মনে হ'লো বলবে— তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম। কিন্তু কথা সে আদৌ বলতে পারলো না, একান্ত ব্যথিতের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে নয়নতারার বুক ঘেঁষে দাঁড়ালো।

'বোসো।'

নয়নতারা নিজেও যেন কথা হারিয়ে ফেললো। কয়েক দিন আগে অভিমান ক'রে চ'লে গিয়েছিলে— সে-কথাও সে বলতে পারলো না।

'বোসো।'

রাজকুমার পালঙ্কে বসলো। নয়নতারা ঘরের প্রদীপটা বাড়িয়ে দিয়ে এল। সুরার গন্ধ রাজকুমারের দেহের সুঘ্রাণগুলিকে ছাড়িয়ে উঠেছিলো। নয়নতারা সহসা রাজকুমারের মুখের দিকে চাইতে পারলো না। একবার তার মনে হ'লো সে-চোখ ত্রুটি যেন নেশায় বিহ্বল।

নয়নতারা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তুমি শোও, আমি আসছি।'

বাইরে এসে নয়নতারা অন্ধকারে বারান্দার এক কোণে বসলো। কি ভাববে সে। ভাবতে যেন জোর পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ সে আকাশের দিকে, অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো।

ঘরে এসে দেখলো, রাজকুমার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কপট নিদ্রা নয়। তবু, পরীক্ষা করার জন্য একটু শব্দ ক'রে সে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। প্রদীপটা কমাতে গিয়ে নিভিয়ে ফেললো। কেমন একটা ম্লান আলো ওদিকের খোলা জানলাটার গায়ে। নয়নতারা বিছানার এক পাশে অতি সন্তর্পণে বসলো। কপট নয় রাজুর নিদ্রা।

নয়নতারা বিছানায় শুয়ে পড়লো। পরে একটু সাহস ক'রে একটু কোমলতা অনুভব ক'রে রাজকুমারের দখল-করা বালিশটার এক কোণে মাথা রেখে সে-ও ঘুমিয়ে পড়লো।

পিয়েত্রো এত সহজে রাজী হবে কল্পনা করা যায় নি। কিন্তু বিষয়টা যার কাছে নিছক অনুমোদনের ব্যাপার সে রাজী হ'লো না। মরেলগঞ্জের ডান্‌কান আপত্তি করলো।

পিয়েত্রোর আপত্তিতে যুক্তি ছিলো, ডান্‌কানের আপত্তিতে ছিলো জোরে-জোরে বলা তার মতামত মাত্র।

পিয়েত্রো ফ্‌সিতে মুখ রেখে পদ্মার উপরের আকাশে মেঘের সঞ্চালন লক্ষ্য করতে-করতে বললে, 'কি প্রয়োজন? তুমি ভেবো না, দেওয়ান, ইংরেজ আমার এখনো জাতশত্রু। আমি জানি ভ্যুপ্লের সময়ে একটা ভুল করেছে ফরাসীজাতি, দ্বিতীয়বার ভুল করে পলাশিতে। এখন ভ্যুপ্লের সময় ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয়। যদি তুমি আমাকে বলতে ফরাসী শেখার জন্য স্কুল করবে, আমি আপত্তি করতাম। কেন করবে? কি তোমার যুক্তি? তুমি কি মনে করো কোনো বিষয়েই ভারতীয়দের চাইতে বেশি অগ্রসর ইংরেজ কিংবা ফরাসী?'

নিজে ভারতীয় হ'য়ে অভারতীয়ের মুখের প্রশংসাকে প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকার করতে দেওয়ান একটু দ্বিধা বোধ করলো, কিন্তু তার সাহসের অভাব নেই। সে বললে, 'ফরাসী ভাষার কথা আমার জানা নেই, কিন্তু শেলী কীটস্‌-এর তুলনাই কি সংস্কৃতে আছে, সেক্‌সপীয়র মিলটনের কথা না-হয় নাই তুললাম।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো না একটি মহাভারত সেক্‌সপীয়রের সবগুলি নাটকের সমান। সেক্‌সপীয়রের নাটক পড়ার জন্য যতখানি শ্রম করেছো, আয়াগোকে চিনতে যে-পরিশ্রম করেছো ততখানি শ্রম কি মহাভারতের জন্য করেছো? মহাভারতে যতগুলি চরিত্র আছে ততগুলি চরিত্র তেমনি জীবন্ত হ'য়ে কি সেক্‌সপীয়রে আছে?'

পিয়েত্রোর সায়াহ্নের সুরা এল। দেওয়ানের ও নিজের মাঝখানে সুরার সরঞ্জামগুলো রেখে পিয়েত্রো বললো, 'কলকাতায় খুব বড়ো একটা আন্দোলন চলছে জানো?'

'কোন আন্দোলনের কথা বলছেন? বিধবা-বিবাহ কি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমাদের অনেকের মনে হয়েছে বিধবা-বিবাহটা প্রচলিত করার মূলে নারীজাতির স্বাধিকার স্বীকার ক'রে নেবার যে-প্রবৃত্তি সেটা পেয়েছো ইংরেজজাতির কাছে। এটা কি সত্যি? বিধবা-বিবাহ কি তোমাদের দেশে অচল ছিলো? রামায়ণেও বিধবা-বিবাহের নজির আছে। মুসলমানদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সুপ্রচলিত। তবু ইংরেজিশিক্ষিত লোকরা কেন বড়াই করো, তোমাদের জ্ঞান হয়েছে ব'লেই এমন করছো।'

'অতীতে ছিলো এ-ও যদি স্বীকার ক'রে নিই, ইংরেজরা আমাদের সেই নষ্টজ্ঞান ফিরিয়ে না দিলে আমরা অতীতে যা আছে তা-ও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। হতভাগিনীদের পুড়িয়েই মারতাম।'

'কথাটা ঠিক হ'লো না, দেওয়ান। তোমাদের সমাজের উপরের তলায় বিধবা-বিবাহ ছিলো না, কিন্তু ডুলে-বাগ্‌দি এদের মধ্যে?'

'ছিলো এবং আছে।'

'তা হ'লে এটাই প্রমাণ হয় সমাজের রুচির মান ও তার শাসনের ভয় যাদের কাছে বড়ো তারাই এ-বিষয়ে পরাঙ্মুখ ছিলো। সমাজের শাসন বড়ো ভয়ংকর। তার ভয়ে মানুষ গোপনেও একটা কাজ সহসা করতে পারে না। সমাজের বিধানই ন্যায়-অন্যায়ের মান। নতুবা ন্যায়-অন্যায়ের অন্য কোনো মানই নেই। তোমরা জ্ঞান লাভ ক'রে এই হৈচৈ করছো তা নয়। পৃষ্ঠপোষক পেয়েছো ইংরেজদের মধ্যে। কলকাতায় এক নতুন সমাজ তৈরি হচ্ছে। সেই নতুন সমাজের নেতা ইংরেজ

এবং ইংরেজের সুদের ব্যবসায়ের বেনিয়ানরা। কাজেই তারা যেটাকে নিন্দা করে না সেটাকে তোমরাও অন্যায় বলো না।'

'আপনার যুক্তিগুলো প্রখর কিন্তু ঘাতসহ নয়। প্রাচীন শাস্ত্রে ভালো যা আছে তা গ্রহণ করার মন তৈরি করছে ইংরেজি শিক্ষা, যেমন দিয়েছে সে শাস্ত্রের অধিকাংশই যে এ-যুগের পক্ষে অপ্রয়োজনের এই চিন্তা করার সাহস।'

'বেশ তো, তোমরা যখন শিখেছো আর অন্য লোকের নতুন ক'রে শেখার দরকার কি? তোমরা এবার ব্যাখ্যা করো। একটি ব্যাপারে লক্ষ্য রেখো দেওয়ান, ওদের দেশের স্কুলে নতুন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু নিজের দেশের পুরনো বিষয়গুলিকে ওরা অশ্রদ্ধা করে না। ওরা যত অগ্রসর হয় প্রাচীনকে তত শ্রদ্ধা জানায়।'

কিন্তু শুধু তর্কই ক'রে যাবে এমন লোক পিয়েত্রো নয়। হঠাৎ এক-সময়ে প্রায় তর্কের মাঝখানে বললে সে, 'তোমার মত বদলায় নি, দেওয়ান?'

'কি ক'রে বদলায় বলুন?'

'তা যদি না বদ্‌লে থাকে তবে তুমি স্কুল করো। প্রথমে ছেলেরা পড়ুক। তারপর মেয়েরা আসবে। একেবারে শিক্ষা না-হওয়ার থেকে ইংরেজি শিক্ষাও ভালো। জ্ঞান না বাড়ে বুদ্ধি বাড়ুক, অন্তত ভালো বন্দুক তৈরি করতে শিখুক।'

দেওয়ান আলোচনার আকস্মিক গতি-পরিবর্তনে বিস্মিত হ'লো। কিন্তু তখন-তখনই কাজের কথায় ফিরে এল, বললে, 'তা হ'লে আপনার সহায়তা পাচ্ছি।'

'কি করতে হবে আমাকে, বলো।'

'জায়গা-জমি দিতে হবে।'

'জায়গা, আমার জায়গা কোথায় ? মাত্র ছ' ফিট অবশিষ্ট।'

'কে খাবে এত সব। পাঁচ ভূতে লুটবে তো।'

'মিথ্যা বলো নি। তা, কোন জায়গা তোমার দরকার ?'

'গঞ্জের পাশে আপনার তাঁতীদের খালি ভিটেগুলো।'

'তা বটে, তাঁতীরা আর ফিরবে না। দিতে পারি।'

একটু চিন্তা করলো পিয়েত্রো। অর্ধপূর্ণ গ্লাসটা ঠোঁটে লাগিয়ে আরও খানিকটা চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'দিতে পারি একটি শর্তে—'

'কি শর্ত ?'

'স্কুলের নাম কি রাখবে স্থির করলে ?'

'এখনও স্থির হয় নি।'

'যদি স্কুলের নাম রাখো জ্ঞানদা-সভা।'

'ওটা মানায় না। জ্ঞানদায়িনী সভা বললে তবু মন্দ হয় না।'

'তা হ'লে জ্ঞানদা-স্কুল নাম রাখো না।'

'তা রাখা যায়, জ্ঞানদা হাই ইংলিশ স্কুল। এই আপনার শর্ত নাকি ?'

'শর্ত আর কি। বললাম, খেয়াল হ'লো। তা নিয়ো জায়গাটা। লিখে-প'ড়ে দিতে হবে নাকি ?'

'ভালো হয় তা হ'লে।'

'দেবো। জ্ঞানদা-স্কুলের নামে লিখে দেবো।'

নিজে উদ্যোক্তা অথচ কি নাম হবে বিদ্যালয়ের সে-বিষয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ দেখালো না হরদয়াল। আগ্রহ থাকলে সে জিগ্যেস করতে পারতো— জ্ঞানদা কি কারো নাম ? সে-রকম প্রশ্ন করলে হয়তো পিয়েত্রো উত্তর দিতো,—হ্যাঁ, একজনের নাম, কিন্তু তার পরিচয় দিয়ে লাভ নেই ; তোমরা চিনতে পারবে না।

হরদয়াল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তা হ'লে কাল একবার গিয়ে জায়গাটা

দেখুন। আমি আসবো। কি রকম ভাবে ঘরগুলো তোলা যায় তার আলোচনা করা যাবে।'

কিন্তু ডানকানের মতিগতি বোঝা দুঃসাধ্য।

হরদয়ালের বক্তব্যে স্কুল কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র সে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে উঠলো।

স্কুলটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছিলো হরদয়াল, চুরুট চিবোতে-চিবোতে ডানকান হোয়াইট শুনছিলো। তার নিজের দেওয়ান সিংমশাইও উপস্থিত ছিলেন।

হরদয়াল বললো, 'দেখুন, সাহেব, ইংরেজজাতি যেদিন পলাশিতে দাঙ্গায় অংশ নিয়েছিলো সেদিনই ভারতের সুপ্রভাত হ'লো। এত বড়ো একটি বাঙালীজাতি সেদিন নিশ্চিন্ত হবার অবকাশ পেলো। মাৎস্য ন্যায় শেষ হ'লো।'

'দ্যাটস্ অল্ রাইট।'

'সুশাসনের গুণে মানুষ তার সংবৃত্তিগুলির উন্মেষের সুযোগ পাচ্ছে। রাজা বদলালেই যুদ্ধ, রাজা বদলালেই আইন বদলানো— এ-সব অত্যাচারের হাত থেকে বাঙালীজাতি বেঁচেছে।'

'হোয়াট্ দেন্?'

'ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে বাঙালীজাতি সংস্কৃতিবান হ'য়ে উঠবে এমন সূচনা দেখা দিয়েছে।'

'রাইট্ এগেন।'

'যে-আলোয় কলকাতা উদ্ভাসিত সে-আলো আপনার চারিদিকেও প্রতিভাত হোক।'

'ইউ রাইট টু দি অথরিটিস ইন্ ক্যালকাটা।'

'তাঁরা নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন, কিন্তু খানিকটা সেল্‌ফ্‌-হেল্‌প্‌ দরকার
কি। আমরা প্রাথমিক চেষ্টা করি। তারপর তাঁরা বাকিটুকু করবেন।
...টন যা কলকাতায় করেছিলেন আপনি এই অঞ্চলে তাই করুন।
...মাদের জেলার সদরে এখনো হাই স্কুল স্থাপিত হয় নি।'

'বীটন ওঅজ্‌ এ ব্যাড্‌ মার্চেন্ট।'

'ব্যবসায়ী হিসেবে সে-ভদ্রলোক আপনার স্টিরাপ ধরারও উপযুক্ত
...। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান চ্যারিটির কথা মনে করলে যে-কোনো ফাদারের
...হতে তিনি কম নন।'

'ডোণ্ট ইউ ফাদার মি টু মাই ফেস্‌ (আমার মুখের সামনে
...দার ফাদার কোরো না)।' সাহেবের আকস্মিক ক্রোধে হরদয়াল
...চকিয়ে গেল। চুরুটে দাঁতের চাপ দিয়ে ডান্‌কান বললো, 'আই হেট্‌
...ারস অ্যাণ্ড রেভারেণ্ড্‌স্‌।'

হরদয়াল ভাবলো এটা সময়োচিত হয় নি, তার এই আসাটা। সে
...দার লং-এর কথা বলতে যাচ্ছিলো। এখন ভাবলো, ভাগ্যে বলে নি।

কিন্তু হরদয়াল সাহেবের প্রজা নয়। প্রতিবেশী এক দুর্দান্ত জমি-
...রের ম্যানেজার। তারও নখদন্ত আছে। তা ছাড়া, আপদে-বিপদে
...হায্য করতে পারার শক্তি আছে তার।

ডান্‌কান বললে, 'ডেওয়ান, তোমার কথায় আমি বিলকুল রাজী,
...নডিশান— তোমার স্কুলে ইংরাজি পড়াতে পারবে না।'

হরদয়াল সাহেবের মনের গতিটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।
...হেব হরদয়ালের কাছে প্রতিবাদ না পেয়ে বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে বললে,
'ইংলিশ এডুকেশ্যন হ্যাজ এণ্টার্ড ইন্‌ টু দ' হেড্‌। ইউ হ্যাভ্‌ হ্যাড্‌ টু
...চ্‌ অব্‌ ইট্‌।'

সাহেব যা বললে তার সারমর্ম এই : কলকাতা থেকে খানকয়েক চিঠি

পেয়েছে সে। যারা এক-সময়ে ইংরেজি শিখে ইংরেজদের ভক্তি করতে তারা অতিরিক্ত আদরে মাথায় চ'ড়ে বসেছে। এ-রকম হ'য়েই থাকে প্রভু জাতি যদি নিগারদের মাথায় তুলে নাচে তবে নিগারদের ধারণা হয় তারাও প্রভুদের সমকক্ষ। খানাপিনা মেলামেশার ফল এই সব। হরিশ মুখুয্যেদের মতো লোককে শায়েস্তা করতে বেশি সময় লাগে না কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি কোন-কোন আহাম্মক পরনিন্দাবিশারদ পাদরী এর পেছনে আছে। মোট কথা, ইংরেজি শেখার ফলে ইংরেজদের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাডি নিগাররা কথা বলতে শিখেছে। মেকলে আর-এক ইডিয়ট ছিলো। কৃষকরা, চাষীরা আজ তাদের প্রভুকে সমালোচনা করতে শিখেছে।

হরদয়ালের চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। এমন কি দেওয়ান সিং-এর মুখোসপরা মুখেও ঠোঁটের কোণগুলো আকুঞ্চিত হ'লো।

কিন্তু হরদয়ালের মুখ পলকে আবার তার স্বাভাবিক রং ফিরে পেলো। সে বললো, 'কিন্তু সাহেব, বিটুইন ইউ অ্যাণ্ড মি, এ-দেশের এই লোকগুলি এবং আপনাদের শাসকজাতির মাঝখানে এমন একদল এ-দেশীয় লোক দরকার যারা শিক্ষা-দীক্ষায়, ধ্যান-ধারণায় আপনাদের অনুকরণ করে এবং আপনাদের শাসন এ-দেশের কাছে প্রিয় ক'রে তোলার চেষ্টা করে।'

সাহেব বললো, 'হুঁ!'

হরদয়াল বললো, 'তা ছাড়া, ভগবান না-করুন, হঠাৎ কিছু ঘটলে হোম থেকে সৈন্য ও শাসকের জাহাজ পৌছনোর আগে এরা আপনাদের সাহায্য করবে।'

হরদয়ালের চোখের কোনায় অত্যন্ত ধারালো, অত্যন্ত বাঁকা, জেনে লুকিয়ে দরবারে যাওয়া যায় এমন একটি হাসি দেখা দিলো।

সাহেব বললে, 'হুঃ!'

হরদয়াল সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা সাহেব, আমি চলি।'

সাহেব হরদয়ালের উঠে দাঁড়ানো দেখে যেন সংবিৎ পেলো, 'মাই ডিয়ার হুদলাল, আমার কথায় নিশ্চয়ই তুমি ভুল বোঝো নি। উই আর গুড নেবারস্ অ্যাণ্ড উইল রিমেইন সো।'

হরদয়াল বললে, 'অনেস্ট ডিফারেন্স অব্ ওপিনিয়ন দেয়ার মাস্ট বি। সে যা হোক, আপনি যে খোলাখুলি আপনার মত জানিয়েছেন এ-জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

ডান্কানের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে হরদয়াল সাহেব-কুঠির দরজা পর্যন্ত মাথা নিচু ক'রে হেঁটে গেল। তার ক্রোধটার পাত্র খুঁজে পাচ্ছে না, অপমানবোধে তার মনটা অবিরত জ্বালা করছে। লাগামে হাত দিয়ে সে পা বাড়াতে যাবে এমন সময়ে সিংমশাই তার কাঁধে হাত রাখলেন।

'দেওয়ানজি!'

হরদয়াল ঘুরে দাঁড়ালো।

'সাহেব বললেন, যদি কোনো ইংরেজ বা আর্মানি টিচার না আনেন স্কুলে এবং স্কুলের পাঠ্যবিষয় ঠিক করার সময়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে নেন তবে স্কুল বসানোতে তত অমত নেই তাঁর।'

হরদয়াল বললো, 'আচ্ছা, ভেবে দেখবো।'

সিং বললেন, 'সাহেবের রাগ করার কারণ আছে। নীল চাষীদের নিয়ে কলকাতায় একটা গোলমাল শুরু হয়েছে। ইংরেজি-জানা এ-দেশী লোকরাই সে-সব গোলমালের নেতা।'

হরদয়াল বললো, 'তাই নাকি? আমি খবর নেবো। এ-সব কারণেই একটা ডাকঘর গ্রামে বসানো হয়েছে, খবরাখবর পেতে ভারী বেগ পেতে হয়। আচ্ছা, নমস্কার।'

হরদয়াল ঘোড়ায় চাপলো।

॥ নয় ॥

দরবারী প্রথায় খবরাখবর ক'রে দেওয়ান রানীর কাছে দরবার করতে গেল।

রানী বললেন, 'এসো, এত জাঁকজমক কেন এটুকু পথ আসতে?'

'নিজের জন্য দরবার করতে এসেছি।'

'জায়গীর চাই?' রানী হাসলেন।

'জায়গীরদার হবার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমি মাস-মাহিনায় কাজ করতেই ভালোবাসি।'

'তা হ'লে বেতন বাড়াতে হবে?'

'আজ্ঞে তা-ও নয়। একটা স্কুল স্থাপন করার চেষ্টা করছি।'

'সেখানে কি হবে?'

'দেশের ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি শিখবে।'

'শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও?'

'আপনি অনুমতি করলেই হয়।'

'ইংরেজি শিখে লাভ হবে ব'লে তোমার মনে হয়?'

'তা হবে।'

'বেশ, যদি প্রজাসাধারণের উপকার হয়, করো। আমাকে কি করতে হবে?'

'আজ্ঞে স্কুলের শিক্ষকদের বেতনটা আপনাকে বহন করতে হবে।'

'কত হবে?'

'আপনার দেওয়ানের বেতনের অর্ধেক। সদর-নায়েবের উপরে যে-পদটা তৈরি করার কথা হয়েছিলো সেটা বন্ধ থাক।'

'তোমার কষ্ট হবে তো!'

'এক-আধ ঘণ্টা বেশি খাটতে হবে।'

'তা হ'লে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ-রকম একটা ব্যাপার করতে যাচ্ছো, প্রতিবেশিদের মতামত নিতে হয়।'

হরদয়াল বললে, 'পিয়েত্রোর মত আছে। প্রথমে আপত্তি করলেও পরে মত দিয়েছেন। স্কুলবাড়িটা তাঁর জমির উপরেই হবে।'

'কেন, তার কি দরকার ছিলো?'

'গঞ্জের মাঝখানে হয়। আশপাশের গ্রামগুলি থেকে ছাত্রদের সমান দব পড়বে।'

'তা হ'লে আর কি। সবই তো ঠিক হয়েছে।'

'ডান্‌কান আপত্তি করছে।'

'কেন? সে তো নিজে ইংরেজ শুনেছি।'

'লোকটা আসলে লেখাপড়া খুব জানে না। ওদের দেশের স্কুলে পাস করা। কলেজের মুখও দেখে নি। প্রায় আমারই মতো।'

'কি বলে?'

'বলে, ইংরেজি পড়ানোর জন্য ইংরেজ মাস্টার না আনলে তিনি মত দেবেন।'

'ডান্‌কানের অমতে চলতে তুমি সাহস পাও?'

'মত করাতে হবে। দেখি।'

হরদয়াল অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবলো।

রানী বললেন, 'পিয়েত্রোকে দিয়ে বলাও না কেন।'

'সে আর-এক মুশকিল। দু-জনে একসঙ্গে হ'লে দু-জনের মত এক হ'য়ে যাবে। কিংবা মতের পার্থক্য গ্রামগুলির স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই বন্ধ ক'রে দেবে।'

'এ-ব্যাপারেও রাজনীতি আছে তা হ'লে। কিন্তু পিয়েত্রো যখন মত দিয়েছে অগ্রসর হও।'

'আপনার অনুমতি পাবো আমি জানতাম। জেলার সদরে যা হয় নি তেমনি একটা স্কুলই আমরা স্থাপন করবো। একটু মুশকিল লাগছে।'

'আবার কি মুশকিল?'

'পিয়েত্রো এক বায়না ধরেছেন। স্কুলের একটা নামকরণ করেছেন। অবশ্য যে-নাম দেওয়া হবে তা-ই থাকবে এমন হয় না। নাম বদ্‌লে যায়। লোকের মুখে-মুখে গ্রামের নামে স্কুলের নাম হয়, মাস্টারের নামে স্কুলের নাম হয়।'

'পিয়েত্রো কি নাম দিতে চাচ্ছে?'

'বলছে, জ্ঞানদা-সভা।'

'অদ্ভুত নাম তো। বিদেশী লোক, ওর কল্পনায় এর চাইতে ভালো নাম কি ক'রে আসবে।'

'আমার মনে হ'লো, সভার বদলে বিদ্যাপীঠ কথাটা বললে মন্দ হয় না।'

রানীর চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ হ'লো যে তার চেষ্টায় তাঁর ভ্রূ দুটি ও মুখের কয়েকটি পেশীও কুঞ্চিত হ'লো। হরদয়াল জানে বিদ্রূপ করার সময় কখনো-কখনো ভ্রূ এমন ক'রেই কুঞ্চিত হয় রানীর, সে-কুঞ্চন নাসিকায় নেমে এসে পক্ষ দুটিকে একটু বিস্ফারিত ক'রে অবশেষে ঠোঁটে তীর্যক হাসি হ'য়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু বিদ্রূপ নয়, ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হ'য়েই রইলো, চোখের তারা দুটি ঈষৎ সংকুচিত হ'লো, তারপর স্বাভাবিক হ'লো দৃষ্টি। যেন একটি কৌতুক-সমস্যার সমাধান হ'লো অবশেষে।

'জ্ঞানদা বিদ্যাপীঠ?' রানী প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। তা হ'লে পিয়েত্রোর প্রস্তাবের মানও রাখা হ'লো। নামটাও ওরই মধ্যে একটু ভালো করা গেল।'

তীক্ষ্ণধার তরবারিটা পরীক্ষা করার জন্য তার ধারের উপর দিয়ে

আঙুল চালানো যেমন সাহস এবং কৌশলের কাজ, তেমনি কৌশলে এবং তার চাইতেও বেশি সাহসভরে রানী একটি প্রশ্ন ক'রে বসলেন। যেন দরবার শেষ হয়েছে এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে রানী প্রশ্ন করলেন, 'জ্ঞানদা কারো নাম নয় তো?'

'না— তা কি ক'রে হবে। আপনার এ-রকম সন্দেহ হ'লো কেন? তা সন্দেহ হয় বটে। নতুবা স্কুলের নামেই জমি দান করার শর্ত কে করে। এ যদি পিয়েত্রো না-হ'য়ে আর-কেউ হ'তো তবে আপনার সন্দেহ যুক্তিযুক্ত ব'লেই মনে হ'তো, কিন্তু পিয়েত্রোর প্রিয়জনের নাম জ্ঞানদা হবে এ সম্ভব হয় না। গুইনেভি, গুইনিভার ইত্যাদি হ'লে হ'তো। কি বলেন?'

'তাই হবে। খেয়ালী লোক। খেয়ালের মাথায় বলেছে।' বলতে-বলতে রানী আকস্মিকভাবে চ'লে গেলেন।

হরদয়াল নিজের ঘরে ফিরে এসে বিশ্রাম করতে-করতে ভাবলো: পিয়েত্রো রাজী হয়েছে। রানী রাজী হয়েছেন। ডান্‌কান রাজী না-হ'য়েও রাজীই হয়েছে। বহুদিনের একটি উচ্চাশা পূরণ হবে। হোক, জ্ঞানদা বিদ্যাপীঠই নাম হোক। মহারানী বিদ্যালয় বা রানীমাতা বিদ্যা-ভবন এমন যে-সব নামের কল্পনা করেছিলো হরদয়াল, তার চাইতে জ্ঞানদা বিদ্যাপীঠই বা এমন কি খারাপ নাম। রানী যে-রকম সন্দেহ করছেন তা-ই যদি হয়, জ্ঞানদা যদি কারো নামও হয় তাতেই-বা ক্ষতি কি!

আপাতত ইটের গাঁথুনি দিয়ে পাকা-বাড়ি তুলে দেওয়া যাবে না। তোড়জোড় ক'রে ইট চুন সুরকি এনে জমা ক'রে কাজে লাগিয়ে দিতে-দিতে তিন-চার মাস। কাজ শেষ হ'তে ছ'মাস। প্রায় এক বছর পরে ছাড়া স্কুল চালু করা যাবে না। তার চাইতে কাঠের কাঠামোয় আটচালা উঠুক। ভিত পাকা করা হোক। স্কুল চালু হোক।

আর শিক্ষক। শিক্ষকের জন্য একটু চিন্তা সে আগেই ক'রে রেখেছিলো। প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে পত্র মারফত। বন্ধুকে লিখেছিলো, সে জবাবে বলেছে—দু-শ' টাকায় একজন ভালো হেড-মাস্টারই পাওয়া যাবে। কিন্তু বন্ধু প্রশ্ন করেছিলো, একই হেডমাস্টার কি ক'রে ছেলেদের এবং মেয়েদের স্কুলে হেডমাস্টারি করবে। বন্ধুকে এ-চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি। তখনো স্কুল স্থাপন করা সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে পারে নি হরদয়াল।

তখনকার দিনে হরদয়ালরা চা খেতো না। তার একটি প্রিয় পাঞ্চ্ ছিলো। ব্র্যাণ্ডি, নেবুরস, চিনি আর গরম জল। মাত্রাগুলি তার নিজের ঠিক করা। আজ পরিশ্রম বেশি হয়েছে। বাবুর্চিকে পাঞ্চ্ মেশাতে ব'লে আরামকেদারায় শুয়ে ভাবছিলো সে। পাঞ্চ্ এলে সে আরামকেদারাতেই উঠে বসলো।

বন্ধুকে চিঠি লিখলো হরদয়াল :

তোমাকে পূর্বে যে-প্রকার সমাচার দিয়াছিলাম তাহার পর লিখি এখানকার স্কুল-স্থাপন বিষয়ে অধুনা নিশ্চিত হইয়াছি। পিয়েত্রোসাহেব আপন বদান্যতাবশত স্কুলবাটির নিমিত্ত জমি ছাড়িয়া দিবেন। আমার প্রভুপত্নী শিক্ষক মহাশয়দিগের বেতন বহন করিতে রাজী হইয়াছেন। অর্থসাহায্যের কারণ—কালেক্টর মহোদয়ের সাহায্যত গভর্নর কৌন্সেলেও একখানি দরখাস্ত পেশ করিব ভাবিয়াছি।

আমার পূর্বের প্রস্তাব মতো লিখি, তুমি অগৌণে একজন প্রধানশিক্ষক উপযুক্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। তাঁহাকে অবশ্য ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান বিতরণের যোগ্যতা রাখিতে হইবে। তাহা অপেক্ষাও বড়ো প্রয়োজন, তাঁহাকে বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ হইতে হইবে। পুরাকালে শুনিয়াছি একটি-মাত্র গুরুকে কেন্দ্র করিয়া বহু বিদ্যার্থী জ্ঞান লাভ করিত। আমার বাসনা, তোমার প্রেরিত প্রধানশিক্ষক সেইরূপ কুলাধ্যক্ষের স্থান গ্রহণ করিতে পারিবেন।.....

কোন কথায় কি মনে প'ড়ে যায়। হরদয়াল বন্ধুকে চিঠি লিখে

টেবিলের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। লোকের মুখে বহুবার শুনে যা পুরনো হ'য়ে গেছে সেই কথাটি নতুন ক'রে মনে প'ড়ে গেল প্রথমবার শোনার বিস্ময় ও আনন্দ বিচ্ছুরিত ক'রে।

কলকাতার লাল সুরকির পথ দিয়ে পালকি যাচ্ছে। কলেজ থেকে এ-সময়ে এ-পালকি বেরিয়েছে, বীটনসাহেব ছাড়া কেউ নয়। একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে পালকির পাশে-পাশে দৌড়চ্ছে। দুপুর রোদে ছেলেটি ঘর্মাক্ত। তার মলিন ধুতি ও মলিনতর উড়ুনির অসংবৃত অবস্থা। পালকির আরোহী ছেলেটির থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ডান-দিকে মুখ করলেন। ছেলেটি দৌড়ে পালকির ও-পাশে গিয়ে সাহেবের চোখে পড়ার চেষ্টা করলো— মি পুয়োর বয় স্যার। মি টেক স্কুল, ভেরি ভেরি পুয়োর স্যার। বীটন হেসে ফেললেন। রোদে তপ্ত গোরার লাল মুখে মেয়েলি হাসি। আরও কিছুদূর যাবার পর বীটন কথা বলতে বাধ্য হলেন— সি মি টুমরো। কাল ডেকা করিয়ো।

হরদয়ালের মনে হ'লো বাজারের ছেলেরা তার জামা ধ'রে টানছে। দেওয়ানসাহেব, স্কুলে পড়বো। টাকা নেই। বাবা গুড়-মুড়কির দোকান দেয়, হুজুর। বেতন দিতে পারবো না।

আনন্দের আতিশয্যে দেওয়ানের চোখে জল এল।

কিন্তু ভাবদুর্বল হচ্ছে মন, এই অনুভব ক'রে হরদয়াল সোজা হ'য়ে বসলো চেয়ারে। সাধারণত যা করে না তেমনিভাবে ডাকলো সে খাস-চাকরকে, সে এলে বললো, 'ওয়াইন্।'

ডানকানের কথা ভাবলো হরদয়াল: লোকটার মনের গঠন কিম্ভুত। কিন্তু এত ভয় পেলো কেন? 'হিন্দু পেট্রিয়টে' কিছু প্রকাশিত হয় নি যাতে নীল চাষীরা উৎক্ষিপ্ত হ'তে পারে। হয়তো কলকাতায় দু-একটা বক্তৃতা হয়েছে নীল চাষীদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে। অবশ্য রামগোপাল যদি

বক্তৃতা দিয়ে থাকেন তবে ইংরেজদের ভয় পাবারই কথা। রামগোপালের বক্তৃতা! তিন-তিনটে জবরদস্ত্ অক্সফোর্ড-পাস সাহেব-ব্যারিস্টার তর্কে যুক্তিতে হারলো, হার মানলো ইংরেজি ভাষার দাপটে, ইংরেজি শ্লেষে! খোঁজ নিতে হবে।

চাকর রুপোর বারকোশে ক্লারেটের সরঞ্জাম এনেছিলো। হরদয়াল সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'দরকার হবে না। তামাক দে।'

চাকর চ'লে গেলে হরদয়ালের মনে পড়লো পিয়েত্রোর সূক্ষ্ম শ্লেষ; সে বলেছিলো, অন্তত ভালো বন্দুক তৈরি শিখুক। তারপর তার নিজের তীব্র ব্যঙ্গটার কথা মনে হ'লো। হোম থেকে সৈন্য না-আসা পর্যন্ত এরা লালকুর্তা গায়ে সিপাহী হবে, তাই নয়? প্রশ্নটা নিজের কাছে ক'রে হরদয়ালের মনের তলে একটা হাসি জাগলো, যেটা প্রসন্নতার রূপ নিয়ে ফুটে উঠলো মুখে। কথাটা সে খুব ভালো বলেছে, এই আত্মতৃপ্তির সঙ্গে কথাটা বলার পীড়ন-সুখ সে অনুভব করলো নতুন ক'রে।

॥ দশ ॥

পিয়েত্রোর কাছে যাই-যাই করছিলো রাজু কিছুদিন থেকেই, কিন্তু কেউ প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিতো, সময় অভাবে যেতে পারছি না। অবশ্য কেউ তাকে এমন প্রশ্ন করে নি।

অবশেষে নয়নতারাই একদিন তাকে জিগ্যেস করলো, 'রাজকুমার, তোমাকে যারা ভালোবাসে তাদের কথা ভুলে যাওয়াই তোমার স্বভাব, তাই নয়?'

'কেন বলছো এ-কথা?'

'এমনি জিগ্যেস করলাম।'

'শুধু-শুধু তুমি কিছু বলবে এমন তো হয় না, নয়নতারা।'

নয়নতারা পুঁথিটি জড়িয়ে-জড়িয়ে বেঁধে ফেললো। কুলুঙ্গিতে পুঁথিটি তুলে রাখবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'পিয়েত্রোর কাছে তুমি তো আর যাও না।'

'আজকাল তুমি যেন আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছো।'

'না, তা নয়। একটা কথা কি জানো, রাজকুমার, আমি যদি তোমার স্ত্রী হ'য়ে জন্মাতাম তা হ'লে বলতাম স্ত্রৈণ হোয়ো না।'

'স্ত্রৈণ কাকে বলে আমি জানি না।'

নয়নতারা হেসে-হেসে বললো, 'জানবার কথাও নয়। কিন্তু মিতা, রাগ কোরো না। পুরুষমানুষের দেহ যেমন পরিশ্রম না করলে নষ্ট হয়, মনও তেমনি। শুধুমাত্র মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বললে পুরুষের মন নষ্ট হয়, গ্লানি জমে মনে। মেয়েমানুষরা সে-রকম পুরুষকে আর শ্রদ্ধা করতে পারে না।'

'এত সব বলছো কেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

'বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলি নি। বুজরুক আলির কথা মনে

করো। তার খোঁজও তো তুমি করো না। শুনলে কত কষ্ট হবে তার। অত ভালো তোমাকে আর কে বাসে?'

রাজু গম্ভীর মুখে বললো, 'তা বটে। আমিও ভাবছি কিছুদিন থেকে। আজই যাবো।'

'তাই ব'লে এখুনি তোমাকে উঠতে হবে না।'

'কেন, এখন যাওয়াই তো ভালো।'

'না, তা হ'লে সারাক্ষণই আমার মনে হ'তে থাকবে তুমি রাগ ক'রে চ'লে গেছো, ব'সে-ব'সে ভাববো আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কাল যেয়ো সকালে। স্নান-আহারের বেলা হবার আগে চ'লে এসো।'

'কাল তা হ'লে তোমার কাছে দুপুরবেলা আসতে পারবো না।'

'বেশ তো, না এলে।'

রাজুর আবার অভিমান হ'লো। সে বললো, 'তুমি কখনোই আমার আপন হবে না। এ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।'

দরজার কাছে যেখানে রাজু দাঁড়িয়েছিলো সেখানটায় এগিয়ে এল নয়নতারা। রাজুর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'এই নিয়ে এ-কথাটা এক শ' বার বলা হ'লো তোমার। মনে এমন অশান্তি বাসা বাঁধলে সে-মন কখনো প্রশান্ত হয় না। মেঘদূতের রস দূরের কথা, সাধারণ কাব্যের রসও মনে দাগ কাটবে না। সব কাব্যেই নিজের দুঃখ দেখতে পাবে। কিসে তোমার বিশ্বাস হবে আমি ভেবে পাই নে।'

কথা বলতে-বলতে নয়নতারা হঠাৎ একটা কাজ ক'রে ফেললো, রাজুর হাতের কমলহীরের আংটিটা খুলে নিলো। নিজের আঙুলে পরলো। তারপর তেমনি হাসি-হাসি মুখে নিজের ছোটো আংটিটা খুলে নিজেই রাজুর হাতে পরিয়ে দিলো।

'হ'লো তো!'

'কি হ'লো?'

'কেন, রূপকথার গল্প শোনো নি? সে-সব গল্পে রাজকুমাররা কাঠুরের মেয়েকে এমন আংটি দেয়, শোনো নি?'

বিষয়টির আকস্মিকতায় রাজু খানিকটা সময় মুহ্যমান হ'য়ে রইলো, তারপর তার অবিশ্বাস্য দ্রুততার জন্যই সে বললো, 'যাও, সব তাতে তোমার রসিকতা।'

'হয়তো তাই, কিন্তু এ-আংটি তোমাকে আর ফেরত দিচ্ছি নে। যদি রাজবাড়ির লোকরা চোর ব'লে ধরে তখন বোলো খুশি হ'য়ে দিয়েছো। দেখো, যেন বিপদে না পড়ি।' অদ্ভুত একটা গভীর হাসিতে নয়নতারা ঝিকমিক ক'রে উঠলো।

'তুমি কি আংটিবদল বলো একে?'

'আর কি বলবো! তুমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করো না।'

'এর মানে কি হ'লো?'

'আমার পোড়াকপাল, তা-ও আমাকেই বলতে হবে নাকি! তোমার বিয়ে হোক, সুয়োরানী আসুক, একদিন তার গলা ধ'রে বলবো।'

খানিকটা সময় দু-জনে চুপ ক'রে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর রাজু বললো, 'তুমি সব বিষয়েই আমার চাইতে বেশি বোঝো। তুমি যখন এ-ব্যবস্থা করলে তখন এতে বোধ হয় আমার ভালোই হবে।'

ভবিষ্যতে এই সামান্য ঘটনাটার ফল কতদূর প্রসারিত হয়েছিলো তা এখনই বলা যায় না। কিন্তু হেতুটা রাজু নিজে না বুঝলেও সে-রাত্রিতে তার গভীর সুনিদ্রা হয়েছিলো। সাধারণ আংটিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে এক-সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ শেষ ক'রে উঠেই সে রূপচাঁদকে হুকুম করলো ঘোড়ার জিন কষতে।

রানী বললেন, 'কোথায় যাবি ?'

'অনেক দিন পিয়েত্রোর কাছে যাই নি। একবার ঘুরে আসি।'

'যাওয়াই উচিত। প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়াটাই ভদ্রতা।'

অত্যন্ত হাল্কা মন নিয়ে রাজু পিয়েত্রোর বৈঠকখানার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো।

রাজুর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে রানী বললেন, 'দাশুর-মা, পালকি আনতে বলো। রূপচাঁদ ছাড়া আর-কেউ যেন না জানে। খিড়কির বাইরে পালকি থাকবে।'

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে দাশুর-মা এসে খবর দিলো পালকি প্রস্তুত। রানী অতি সাধারণভাবে খিড়কি পার হ'য়ে এসে পালকিতে চেপে দাশুর-মাকে বিদায় দিলেন, হাতের ইশারায় রূপচাঁদকে ডেকে বললেন, 'নয়নতারার বাড়ি।'

পালকির পাশে-পাশে রূপচাঁদ ছুটে চললো।

নয়নতারা স্নান ক'রে উঠে ঝুঁটি ক'রে চুল মাথার উপরে তুলে দিয়ে দাওয়ায় ব'সে কুলোয় ক'রে চাল বাচছে। বাড়ির চৌহদ্দির বেড়া ঠেলে পালকি অন্দরের চিকের পর্দা দেওয়া ছোটো দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালো। এত ছুটে এসেছে পালকি যে বেহারাগুলো হাঁপাচ্ছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম পড়ছে।

রানী পালকি থেকে নেমে বললেন, 'দূরে গাছতলায় বিশ্রাম করো গে, ডাকলে এসো।'

রানী অন্দরে প্রবেশ করলেন। উঠোন পার হ'তে-হ'তে তিনি দাঁড়ালেন, ততক্ষণে নয়নতারাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

নয়নতারা আন্দাজ করার চেষ্টা করলো লোকটি কে হ'তে পারে। বেশভূষায় পারিপাট্য নেই, তবুও বড়ো ঘরের চিহ্ন আছে। কপালে সিঁদুর নেই, কিন্তু ভূষণরহিতাও নয়।

নয়নতারা বললো, 'আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না।'

আগন্তুকা বললেন, 'পারার কথাও নয়, আমাদের দু-জনের এর আগে দেখা হয় নি।'

'আপনি কি অন্য গ্রাম থেকে এসেছেন?'

'না, এই গ্রামেই থাকি।'

'বসুন।'

রানী মাদুরে ব'সে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম নয়নতারা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কুমারী? তোমরা বুঝি কুলীন?'

'হ্যাঁ, কুমারী বটে। কিন্তু কুলীনের লক্ষণ কি আর আছে বলুন! না আছে দান-ধ্যান, না আছে যাগযজ্ঞ।'

'তোমার অভিভাবক কে আছেন?'

নয়নতারা একটু ভাবলো। তারপর বললো, 'আমার অভিভাবক এই গ্রামের রানিমা।'

রানী বললেন, 'এর পর আমার আর পরিচয় না দেওয়া চলে না; আমিই রানী।'

নয়নতারা বিস্মিত হ'লো, খানিকটা সময় রানীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো।

কিন্তু নয়নতারা শঙ্কিত হ'লো। তার আঙুলের নতুন ধরনের আংটিটা

ভার-ভার লাগতে লাগলো। রানী নিজে এসেছেন, কি বলবেন, কি উদ্দেশ্য, কে বলতে পারে। রানী কি তার চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত করবেন, কিংবা সোজাসুজি তার এবং রাজুর সম্বন্ধের কথা উত্থাপন ক'রে বসবেন। নয়নতারা মুখ নিচু ক'রে বসলো। কিন্তু রানী সে-সব কোনো প্রশ্ন না তুলে বললেন, 'কথায়-কথায় জানতে পারলাম, রাজু তোমার কাছে কাব্য পড়ে। তা ভালোই হয়েছে। এ-গ্রামে কাব্য পড়ার মতো পণ্ডিত আর কোথায়। টোলের পণ্ডিত নাকি ব্যাকরণসর্বস্ব। কি পড়ছে এখন রাজু?'

নয়নতারার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা দিলো, 'তাকে ঠিক পড়া বলে না। আমি নিজে ব্যাকরণ কিছু জানি না। ব্যাকরণ বাদ দিলে কাব্যের অর্থবোধের চেষ্টাই শুধু হয়। দু-জনে মিলে পড়া। এখন আমরা রঘু পড়ছি।'

রানী বললেন, 'তুমি নিশ্চয় মহাভারত পড়তে পারো?'

'দাদার কাছে পড়েছিলাম।'

'আমাকে একটু শোনাও-না একদিন।'

নয়নতারা সত্যিকারের সংকোচ বোধ করলো। মূল মহাভারত যিনি শুনতে চান তাঁর সংস্কৃত-জ্ঞান খুব সাধারণ নয়। তবু যাচাই করার জন্য জিগ্যেস করলো, 'কাশীরামের?'

'না, মূল। তোমার কাছে আছে?'

নয়নতারা এই ভেবেও অবাক হ'লো যে-মহিলা মূল সংস্কৃত মহাভারত শুনতে চান তাঁর ছেলে কেন সংস্কৃত আদৌ ধরতে পারে না। বললো, 'দাদার ছাত্ররা প্রায় সবগুলি পুঁথি নিয়ে গিয়েছে। তারা খুঁজে পায় নি পরে এমন-একটা পেয়েছিলাম আমি। সেটা শুধু শান্তিপর্ব।'

'তা হ'লে তো কথাই নেই, নয়ন। তুমি কবে যাবে তাই বলো।'

'যেদিন আপনার হুকুম পাবো। আপনাকে না চিনতেই তো আপনাকেই আমার অভিভাবক বলেছি।'

রানীর মুখ উজ্জ্বল হ'লো, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি পালকি পাঠাবো।'

রানীর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে তাঁকে বিদায় দিয়ে নয়নতারা ভাবতে বসলো।

সমগ্র ব্যাপারটি নয়নতারার কাছে প্রহেলিকা ব'লে মনে হ'লো। রাজুর বিষয়ে অনুসন্ধান করাই অবশ্য রানীর উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি কি তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যে রাজুর জন্য নয়নতারার প্রীতিকে সখ্য ব'লে নিতে পেরেছেন? তা যদি হ'তো তবে এমন ক'রে আসার কি দরকার ছিলো? যেন সব ব্যাপারটা চুপিচুপি নিষ্পত্তি করার ইচ্ছা। যদি মহাভারত শোনাই উদ্দেশ্য হয়, লোক পাঠিয়ে খবর দিলেই তো হ'তো। যেন গোপন আচরণের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রানীর আসার ধরনটা।

দাসী এসে রান্নার কথা মনে করিয়ে দিলো। তার নিজের আহারের রুচি কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিলো না। কমলহীরের আংটিটায় আবার চোখ পড়লো। সেটা একবার খুলে ফেললো, আবার পরক্ষণেই পরলো।

নয়নতারা রান্নার উদ্দেশ্যে চ'লে গেল।

পালকিতে যেতে-যেতে রানী ভাবলেন নয়নতারার কথা। মেয়েটি সুন্দর বটে। মোহিত করার মতো সৌন্দর্য, মিষ্টি গলার স্বর। কিন্তু বয়সের পার্থক্যটাও লক্ষণীয়। অবাক লাগতে লাগলো রানীর, সেদিনকার সেই রাজু, বুকে চেপে যাকে ঘুম পাড়াতে হ'তো সে-ও কি নারীর রূপের আকর্ষণ অনুভব করতে পারে! অবশ্য একজাতীয় রূপ আছে যা

প্রাণীমাত্রকেই আকর্ষণ করে, যেমন আলোর রূপ; শিশু হ'লেও আকর্ষণ করে, যেমন লাল রং। নয়নতারার দেহবর্ণ আকর্ষণীয়, তার মিষ্ট ভাষা আকর্ষণীয়, কিন্তু সে যে রমণীরত্ন, এ বুঝবার বয়স কি রাজুর এরই মধ্যে হ'লো!

রানী স্থির করলেন, সূচনাটা ভালোই হয়েছে, কাব্যই যদি পড়তে হয়, নিজের বাড়িতে তা পড়া হোক। একজন প্রজার বাড়িতে রাজকুমারের প্রত্যহ যাওয়াটা ভালো দেখায় না। মহাভারত পড়তে আসুক নয়নতারা, দশ জনে তার কাব্য শুনুক এবং তার নারীত্ব গৌণ হ'য়ে যাক রাজুর চোখে।

রাজবাড়ির খিড়কির কাছে পৌঁছে রানীর মনে হ'লো— কিন্তু যদি রাজুর কাছে নয়নতারার রমণীয়তাই প্রধান হ'য়ে থাকে!

বিষণ্ণতা বোধ করলেন রানী। ছেলে নরহত্যা করেছিলো, সেখানে ছেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু সত্যি যদি ছেলে অবিবাহিত প্রেমের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কি ক'রে তা' রোধ করা যাবে। কি ক'রে তাকে বলা যাবে, নিষেধ করা যাবে। তখন তাঁর মনে হ'লো, নয়নতারাকে আকর্ষণ ক'রে নিজের মহলে আনার চেষ্টা কি তা হ'লে রাজুর পুরুষ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার সমান হ'লো! সহসা নয়নতারার তুলনায় নিজেকে দুর্বল ব'লে মনে হ'লো রানীর।

পিয়েত্রো তার পোষা কাকাতুয়াকে ছোলা খাওয়াচ্ছিলো। রাজুকে দেখে হাতের ইশারায় তাকে ডেকে আবার ছোলা খাওয়ানোর দিকে মন দিলো। রাজু কাছে এলে ফরাসীতে বললো, 'এটাকে আমি ফরাসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিখতে দেবো না। ইতিমধ্যে চারটি ভদ্রতার কথা

শিখে ফেলেছে, তুমি যেন এর সামনে কথা বলতে গিয়ে বাংলা ব'লে ফেলো না।'

রাজু ফরাসীতে বললো, 'তা হ'লে অন্য কোথাও চলুন। আমি কতক্ষণ আর ফরাসী বলবো।'

বসবার ঘরে এসে পিয়েত্রো বললে, 'অনেক দিন আসো নি। ভালো আছো তো?'

'ভালোই আছি। আলি খাঁর খবর কি?'

'সে ভালোই আছে, কিন্তু তার একটা কাজ আমার ভালো লাগে নি।'

'কি কাজ?'

'হঠাৎ সে কালেক্‌টরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে চিঠি দিয়েছে।'

'কি বলেছে?'

'শুনলাম নাকি বহু রকমে ত্রুটিমার্জনা চেয়ে লিখেছে, এবারকার মতো ছেড়ে দিলে সারাজীবন ব্রিটিশপতাকা অভিবাদন ক'রে কাটিয়ে দেবে।'

'লাভ কি হ'লো?'

'ছাড়া পেতে পারে। উকিলের চিঠি পেয়েছি কাল, সে-ই নাকি পরামর্শ দিয়েছে, তদবিরও করছে।'

রাজুর বিপদ হ'লো। সে খুশিই হচ্ছিলো কথাটা শুনে, আলি খাঁ ছাড়া পাবে এর চাইতে সুখের কথা আর কি আছে; কিন্তু পিয়েত্রোর যখন মনঃপূত হয় নি ব্যাপারটা, হয়তো-বা কাজটা ভালোই হয় নি। একটু ভাবতে গিয়ে সে-ও অনুভব করলো— ব্রিটিশপতাকা অভিবাদন করাটাই বোধ হয় অনুচিত। অবশ্য কথাটা তাকে বিচলিত না করলে সে সম্ভবত দেখতে পেতো, পিয়েত্রোর ধীর দৃষ্টির পেছনে থেকে রাজুকে পরখ করছে পিয়েত্রোর তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক।

'কিন্তু,' বললো রাজু, 'জেল-খাটা তো উদ্দেশ্য নয় মানুষের।'

'তা নয়। তা ছাড়া এ-ক্ষেত্রে আলি খাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো তোমাকে বাঁচানো।'

'তা যদি হয়, সেটা তো হ'য়ে গেছে। ইচ্ছে ক'রে অপমান মাথায় নিয়েছে আলি খাঁ। কৌশল ক'রে পালিয়ে আসা মন্দ কি।'

পিয়েত্রো এক-টিপ নস্য নিয়ে বললো, 'আসুক, কি দুষ্টুমি মাথায় খেলেছে কে জানে! যাক্ সে-কথা, ডান্‌কানের কুঠিতে গিয়েছিলে ওর নাচের আসরে? কি রকম লাগলো?'

'মন্দ নয়। তবে নাচওয়ালীদের বয়স হয়েছে। আসর অল্প রাত্রিতেই ফাঁকা হ'য়ে গিয়েছিলো।'

পিয়েত্রো কথা না ব'লে রাজুর মনের উপরে নাচওয়ালীদের ছাপের পরিমাপটা দেখলো।

'তুমি একাই গিয়েছিলে, না দেওয়ানও ছিলো?'

'দেওয়ানের যাবার কথা ছিলো, যান নি শেষপর্যন্ত।'

'তোমাদের এই দেওয়ানের চরিত্রটা নতুন ধরনের। নিজে নাচ গান ভালোবাসে ব'লে মনে হয় না, অথচ উৎসব করতে নাচওয়ালী নিয়ে আসে। তা ভালো করেছে সে, ডান্‌কানের সঙ্গে সদ্ভাব হয়েছে। আচ্ছা, তুমি নিজে গান গাইতে পারো?'

রাজু হোহো ক'রে হেসে উঠলো, 'আমি করবো গান, তা হ'লেই হয়েছে।'

'চেষ্টা ক'রে ছাখো নি তো?'

'তা না দেখলেও বলা যায়।'

'নানা রকমের বাজনা আছে, যে গাইতে পারে না সে বাজাতে পারে। একটা সুর যখন মনের মধ্যে কাজ করে, আর সে-সুর যখন গলায় ফোটে না, বাজনায় তা ফুটিয়ে তোলা যায়।'

'বাজনা তো নহবতওয়ালারা বাজায়।'

'সব সময়ে তা নয়। বড়ো লোক, মহৎ লোকও বাজায়।'

'কি বাজাবো, বাঁশি?'

'অবশ্য কৃষ্ণ যখন রাজা হয়েছিলেন তখন আর বাঁশি বাজাতেন ব'লে শোনা যায় না। কিন্তু তা হ'লেও বাঁশি বাজাতে দোষ কি?'

'দোষ বোধ হয় কিছু নেই। ভেবে দেখি নি বিষয়টা।'

পিয়েত্রো বললো, 'বাজনা শুনবে?'

'কে বাজাবে?'

'কয়েকজন বাজনদার আছে। আমাদের দেশের হিসাবে তারা সকলেই বিশেষ ভদ্রলোক।'

'বেশ কথা, কোথায় তারা? ডাকুন না, শোনা যাক।'

'তুমি শুনবে কিনা, শুনতে তোমার ভালো লাগবে কিনা এই সমস্যা।'

'শুনতে দোষ কি।'

রাজুকে সঙ্গে ক'রে পিয়েত্রো লাইব্রেরিঘরে এসে বসলো। দু-তিনটি সেল্‌ফ্‌-বোঝাই বই, কিছু পুঁথিও আছে। রাজু এর আগেও লক্ষ্য করেছে, কালো এবনির দেরাজের মতো একটা বড়ো আসবাব সেই ঘরের এক পাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে প'ড়ে আছে। পিয়েত্রো একটা চেয়ার টেনে দিয়ে রাজুকে বসতে ব'লে নিজে সেই কালো আসবাবটার পাশে গিয়ে বসলো একটা টুলে। তারপর বললো, 'একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি রাজু, বাজনা যতক্ষণ চলবে একটা কথাও বলবে না।'

রাজু যাকে আসবাব মনে করেছিলো, সেটা একটা পিয়ানো। পিয়েত্রো ডালা খুলে পিয়ানোর সামনে বসলো। রাজু এর আগে কোনোদিন পিয়ানো দেখে নি, নামও শোনে নি। হঠাৎ আসবাবটার পরিবর্তন

দেখে সে বিস্মিত হ'লো। একটা জন্তু যেন হাঁ করলো আর তার অসংখ্য দাঁত চোখে পড়লো।

পিয়েত্রোর পাঁশুটে দাড়িগুলো শূন্যে ভাসছে, মাথাটা পিঠের দিকে হেলানো, দু-হাত ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে, প্রান্ত থেকে মধ্যে, মধ্য থেকে প্রান্তে স'রে যাচ্ছে আর অপূর্ব মনোহর ঝংকার উঠছে। ক্রমশ সেই ঝংকারগুলি মিলে মিশে একটিমাত্র স্বরে মূর্ছিত হচ্ছে।

বাজনা থামলে পিয়েত্রো বললো, 'কি রকম লাগলো?'

রাজু সহসা কথা বললো না।

'সুরটা চেনা-চেনা লাগলো?'

'কোথায় যেন শুনেছি।'

'তোমাদের বাড়ির নাচের কথা মনে হ'লো?'

রাজু নিজের মন হাতড়াচ্ছিলো, এবার ঠাহর করতে পেরে উৎসাহিত হ'য়ে বললো, 'ঠিক তাই।'

পিয়েত্রো হাসিমুখে বললো, 'ঠিক একেবারে সে-রকম হয় নি। একটু এদিকে-ওদিকে যোগ করা আছে। ওভারচারগুলি ঠিক এক নয়। পরে একদিন ট্রায়োগুলি বুঝিয়ে দেবো। ভালো লাগলো?'

'খুব ভালো।'

পিয়েত্রো দরজার কাছে উঠে গিয়ে ভৃত্যকে তামাক দিতে ব'লে ফিরে এল।

রাজু বললো, 'এটা কি ফরাসী নাচেরও সুর?'

'না। ভালো কথা, তুমি কি য়ুরোপের নাচ সম্বন্ধে কিছু শুনেছো কারো কাছে?'

'না।'

'য়ুরোপের নাচের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রায়ই মেয়ে-পুরুষে জোড়ায়-জোড়ায়

দল বেঁধে নাচে। ব্যালে ব'লে একরকম নাচ আছে, সেগুলি অভিনয়ের মতো।'

তামাক এল। পিয়েত্রো তামাক খেতে-খেতে ব্যালের বিশিষ্টতা বোঝালো রাজুকে। তারপর বললো, 'আমি নিজে খুব কমই ব্যালেতে যাবার সুযোগ পেয়েছি। শুনেছি আজকাল রাশ্যানরা এদিকে অনেক এগিয়ে গেছে।'

গড়গড়ার গায়ে নলটাকে কয়েক পাকে জড়িয়ে পিয়েত্রো উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আর-একটু শুনবে বাজনা ?'

পিয়েত্রো পিয়ানোর সম্মুখে টুলটায় বসলো, রাজুও তার চেয়ারটা টেনে এগিয়ে নিলো পিয়ানোর দিকে।

বাজনা শেষ হ'লো। পিয়ানোর চাবিতে হাত রেখে পিয়েত্রো স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। রাজুর চোখ দুটি জলজল করছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজু বললো, 'এটা কি সুর ?'

পিয়েত্রো হাসি-হাসি মুখে বললো, 'হ'লো না, সবটুকু পারলাম না। এটা মোজার্টের একটা গৎ। খুব ছোটোবেলায় বাবার পাশে ব'সে একদিন শুনেছিলাম মোজার্টের একটা পূর্ণাঙ্গ সুর। সে যে কি তা বর্ণনা করা যায় না, ভোলা যায় না। —ওরে তামাক দে।' —ব'লে পিয়েত্রো আবার চেয়ারে এসে বসলো।

রাজু বললো, 'আপনি যে এ-রকম বাজাতে পারেন তা জানতাম না।'

'আমি যে কাউকে বাজনা শুনিয়ে খুশি করতে পারি তাই কি জানতাম !'

পিয়েত্রোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজু বাড়িতে ফিরতে-ফিরতে ভাবলো, নয়নতারাকে বলতে হবে এই বাজনার কথা। গান-বাজনার কথা, নাচওয়ালীদের কথা উঠলেই সে ভ্রূকুটি করে।

॥ এগারো ॥

সদর-নায়েবের ভাগিনেয় গোবর্ধন দত্ত গ্রামের নতুন স্থাপিত পোস্টাফিসের পোস্টমাস্টার। খবরটা আনলো সে-ই। প্রথমে সে গুজবের মতো ছড়িয়ে বেড়ালো কথাটা।

দু-দিন তার আপিসে ডাক আসে নি, অথচ একদিন পর একদিন ডাক আসার কথা। সে নিজেই একটা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে সদরের বড়ো আপিসে পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়েছিলো ডাক আনতে। সেখানে সে নাকি সদ্য-ডাকে-আসা একটি পত্রিকা প'ড়ে এসেছে। কী মারাত্মক কথা! যে শুনলো, সে-ই শিউরে উঠলো। সকালবেলা যারা গোবর্ধনের ডাকঘরের বারান্দায় ব'সে হুঁকো টানে আর গল্প করে তারা গ্রামের মাতব্বরস্থানীয় লোক না হ'লেও সাধারণ প্রজাও নয়। তাদের মানসিক অগ্রগতিও খানিকটা ছিলো এবং সে-অগ্রগতির জন্য মুখ্যত কৃতিত্ব গোবর্ধনের। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ডাকঘরকে পোস্ট-আপিস, সময়কে টাইম, কাজকে ওয়ার্ক ইত্যাদি বলতে শুরু করেছে গোবর্ধনের মুখে শুনে-শুনে। তার চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এদের সাহিত্য-চেষ্টা। সাহিত্য-চেষ্টা বলতে সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা নয়। সাহিত্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া। হুতোম প্যাঁচার নক্সা পড়া চলছে এদের এখন। গোবর্ধন ভালো পড়তে পারে। তার আপিসের টুলে ব'সে যখন সে পড়ে তখন মনে হয়, বই নয়, লেখক নিজেই যেন তাদের সঙ্গে কথা বলছে।

সেই গোবর্ধন বললো, 'আইন হ'য়ে গেল।'

'আইন করলো কে? কলকাতার লাট?'

'আইন করলো বিদ্যেসাগর। লাটে কি আইন করতে পারে? সাহস পায় না।'

'তা হ'লে ঘরে বিধবা হ'য়ে কেউ প'ড়ে থাকবে না ?'

'এই তো সবে শুরু, ছাখো কতদূর জল গড়ায়।'

গোবর্ধন দত্তের একজন সঙ্গীর প্রেমিক হিসাবে নাম ছিলো। সে বললো, 'বলো কি, এ তো খুব কৌতুকের ব্যাপার হ'লো। আইনের খসড়াটা আমাকে একদিন শোনাও।'

এদের সকলেরই বয়স বাইশ থেকে পঁচিশ।

গোবর্ধনের প্রেমিক সঙ্গী চরণদাস বললো, 'তা হ'লে বাবাজী না-হ'য়েও লোকে বিধবা বিবাহ করতে পারিবে।'

গোবর্ধনের দলের আর-পাঁচজন হেসে উঠলো।

গোবর্ধন বললো, 'বাবাজীদের ধর্মপুস্তক প'ড়ে প্রেম করতে শিখলে অথচ তাদের ধর্মের প্রথা মানতেই দোষ ?'

'তা দোষ নেই, ভয় হয়, লোকে বলবে মেয়েমানুষের জন্যই কণ্ঠী পরলাম, কণ্ঠীরও অপমান, মেয়েমানুষটারও।'

গোবর্ধন দত্তের আড্ডা থেকে কথাগুলো গ্রামের এদিকে-ওদিকে ছড়াতে লাগলো।

সেদিন সন্ধ্যায় চরণদাস প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে ডাকলো, 'বনদুর্গা, এদিকে এসো, একটা খবর আছে।'

বনদুর্গা চরণদাসের প্রায় সমবয়সী একজন বিধবা, চরণদাসের দূর-সম্পর্কীয় এক ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মীয়ের স্ত্রী।

'কিছু বললে ?'

'বললাম, এ-দেশ থেকে না পালিয়ে যদি তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকতে পারি।'

বনদুর্গা বললো, 'চরণ, এই নিয়ে তুমি তিন বছরে তিন বার এই কথা বললে। লোকে শুনলে একে কুপ্রস্তাব বলবে। নিজেকে দশের

চোখে হেয় করো কেন? আমি বিদেশী ভিন্ন গ্রামের মানুষ। আমার এই হাল-বলদ জায়গাজমির একটা বিলি-বন্দোবস্ত ক'রে দাও তোমরা দশ জন, আমি চ'লে যাই।'

চরণ বললে, 'লোকে কি বলবে জানি না, তুমি নিজেও কি একে কুপ্রস্তাব মনে করো?'

বনদুর্গা অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে বললো, 'চরণ, চরণ!'

দৃশ্যটা এই রকম: বনদুর্গার বাড়ির সদরের আগারের পাশে যে-চাঁপা গাছ, তার নিচে দাঁড়িয়ে চরণদাস। অস্পষ্ট চাঁদের আলো চরণদাসের বাঁ-কাঁধের উপর দিয়ে তার মুখের একটা পাশে পড়েছে। আগারের ওপারে বনদুর্গা।

বনদুর্গা বললো একটু পরে, 'চরণ, তোমাকে আমি যে-কথা বলি না, সে ক'টি কথা শোনার জন্যই তুমি এমন ক'রে বার-বার আসছো। লোকে তোমাকে হাটের পথ দিয়ে ফিরতে-ফিরতে ঢিল ছুঁড়বে, তোমার ঘরে আগুন দেবে। আমাকে নষ্ট মেয়েমানুষ ভাববে। তার ফলে আমার উপরে অনেকের অন্যায় লোভ হবে। লোকে তোমার প্রাণনাশের চেষ্টাও করবে হয়তো। তবু সেই দু-দিনের জন্যও আমি তোমাকে সুখী করতে রাজী হতাম যদি তুমিও আমাকে নষ্ট মেয়েমানুষ ভাববে এমন সম্ভাবনা না থাকতো।'

চরণদাস বললো, 'বনদুর্গা, তুমি আমার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখো। তুমি বলো, এর থেকে কি পরিত্রাণ আছে আমার? তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে করে, তোমাকে পেতে ইচ্ছে করে, এ-সব আমি ঠেকাই কি ক'রে?'

বনদুর্গা মুখ নিচু ক'রে একটু চিন্তা করলো। তারপর বললো, 'চরণ, আমি তোমার কথায় রাজী, কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকে

ব'লে রাখি। অনেক দিন আমাকে পাবে না, তার জন্য তুমি মনস্থির ক'রে নাও। অপমান আমি সহ্য করবো না।'

বনদুর্গার কথাগুলি যেমন শান্ত তেমনি ধীর।

চরণ বললো, 'না, না, বন্, তার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাকো। আমি আর এ-রাস্তা দিয়েই হাঁটবো না। তুমি আমাকে দু-দিন সুখী করার জন্য বিপদ কাঁধে নেবে তার দরকার নেই। ওরা বলছিলো, বিধবাদের নাকি কুমারী মেয়েদের মতোই বিয়ে হবে এমন আইন হবে। বিদ্যেসাগর নামে এক বড়ো পণ্ডিত নাকি বলেছেন বিধবা-বিয়েতে পাপ হয় না। আমি সেই জন্যেই এসেছিলাম।'

বনদুর্গা অনেকক্ষণ ধ'রে কথাটা ভাবলো। তারপর হঠাৎ তার চোখে জল এল, সে বললো, 'চরণ, কেন তুমি আমার ভাই হ'য়ে আসতে পারলে না!'

চরণ মাথা চুলকে বললো, 'বনদুর্গা, আমি এখন আসি।'

'দাঁড়াও চরণ, কথাটা এত দূর এগিয়েছে, বাকিটুকু ব'লে নিই। তুমি কি আমাকে তার পরও সতী মনে করতে পারবে? কথাটা তুমি ভাবো। আর-একদিন এসো। মনে কোরো না, আমি তোমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলাম। আর-একবার এসো।'

দু-চার দিন পরে গোবর্ধনের আড্ডায় বিধবা-বিবাহের কথাটা যখন সরস আলোচনায় উচ্ছ্রিত হয়েছে চরণদাস ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, একটা কথা তোমরা বলো, যে-সব বিধবা বিয়ে করবে তাদের কি তোমরা সতী মনে করবে না?'

গোবর্ধন বললে বিজ্ঞের মতো, 'যে-সব বিধবা কুল নাশ করে তাদের চাইতে ভালো, তাই ব'লে কি একবার যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের মতো।'

সঙ্গীরা হোহো ক'রে হেসে উঠলো।

গোবর্ধনের উত্তরটা চরণদাসের ভালো লাগে নি, এদের হাসিতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হ'লো।

বিধবা-বিবাহের কথাটা গোবর্ধনের আড্ডায় সীমাবদ্ধ রইলো না। মুখরোচক আলোচনা হিসাবে ছড়াতে লাগলো। মেয়েদের জল তোলার ঘাটে তো বটেই, পুরুষদের স্নানের ঘাটেও। বয়সের কোনো ব্যবধান রইলো না, সত্তর বছরের ঠাকুরদা আর ষোলো বছরের নাতি আলোচনা করলো; এমন কি, বাপ-জ্যেঠার আলোচনাস্থলেও ছোটো-ছোটো ছেলেদের ভিড় হ'তে লাগলো। মেয়েদের ঘাটে তখন বিধবাদের সংখ্যা বেশি থাকতো না। দু-এক জন যারা ছিলো তাদের অবস্থা কষ্টকর হ'য়ে উঠলো। আলোচনা উঠতেই সকলেই তাদের শুনিয়ে-শুনিয়ে এই নব-বিধানের কদর্যতাগুলির উদ্ঘাটন করতো, যেন তারাই এই বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছে। গ্রামে যে শিরোমণি মশায় জীবিতই আছেন সেটারও প্রমাণ পাওয়া গেল। জিওলগাছের আঠা দিয়ে পৈতা মাজতে-মাজতে তিনি বললেন, 'বাপু হে, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ, অর্থগ্রাহী ভিষক, আর অগ্রহণযোগ্যদানগ্রাহী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সমান পতিত। তোমাদের বিদ্যেসাগর খ্রীস্টানের দানে বর্ধিত, খ্রীস্টানের বৃত্তিভুক। তোমরা কি শুনেছো, লোকটা তার কলেজে ভারতীয় দর্শন পড়ানো নিষিদ্ধ করেছে? তার কাছে আর কি আশা করো?'

রাজবাড়ির কাছারিতেও আলোচনা শুরু হ'লো। সদর-নায়েবমশাই পদশব্দে সন্ত্রস্ত হ'য়ে কথাটা থামানোর জন্য বললো, 'কাজ করো, কাজ করো। আইন হ'লো তো হয়েছে কি? আইনে এমন কথা নেই বিধবা-বিবাহ আবশ্যিক। তোমার খুশি না হয় বিধবা-বিবাহের ভোজ খেয়ো না।'

কিন্তু যার পদশব্দে এত ত্রস্ততা সে-ই আলোচনার আসরে এসে বসলো। কাছারির ফরাসে যার পদধূলি পড়ে না, সেই দেওয়ান স্বয়ং নায়েবদের মাঝখানে ব'সে বললো, 'আপনাদের আলোচনায় আমিও যোগ দিতে এলাম। ভোজ খাওয়াটা বড়ো কথা নয়, নায়েবমশাই, কথাটা ভেবে দেখুন।'

নায়েব এবং উঁচুদরের আমলারা ভয়ে-ভয়ে চুপ ক'রে রইলো।

তখন দেওয়ান একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলো। তার সে-বক্তৃতা শুনে উপস্থিত সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল। নায়েবমশাই-এর যদি মেরি গড্‌উইনের বক্তব্য জানা থাকতো তবে বুঝতে পারতো দেওয়ান খ্রীস্টান হওয়ার প্রস্তাব করে নি, খ্রীস্টানদের মধ্যেও যারা একান্ত অগ্রসর, যারা মানুষের সুখদুঃখে বিচলিত হ'য়ে খ্রীস্টানী বিধানগুলি, খ্রীস্টান সমাজের বিধিগুলিও নস্যাৎ ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের মতো কথা বলছে দেওয়ান। আপাতদৃষ্টিতে সেটা একটা নিরীশ্বর সমাজব্যবস্থা। বক্তৃতা শেষ ক'রে দেওয়ান বললো, 'এর জন্য শাস্ত্র থেকে নজির দেখানোর কোনো দরকার নেই। যা অন্যায়, তা অন্যায়ই। বিদ্যাসাগরের মতো বিদ্যা যদি আমার থাকতো তবে আমি এই ঘোষণা করতাম— ভালো এবং ন্যায় এ-দুয়ের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি দেখানোই দুর্বলতা। ভালো এবং ন্যায়কে অনেক সময়ে বলপ্রয়োগ ক'রে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আইন হয় নি, না-হোক ; বেআইনী হ'লেও ন্যায়ই সব আইনের বড়ো।'

দেওয়ান চ'লে গেলে নায়েব এবং আমলারা পরস্পরের মুখের দিকে ভীত ও বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

কথাটা অতঃপর রাষ্ট্র হ'লো। এ-গ্রামের মাথার কাছে একজন আছেন যিনি বিধবা-বিবাহ আইন সমর্থন করেন। কী সাংঘাতিক অবস্থা, কি উপায় হবে তা হ'লে! নায়েব-গিন্নী কর্তার মুখে কথাটা শুনে এই মন্তব্য

করলো। নায়েব দু-কুল রক্ষার জন্য বললো ভয়ে-ভয়ে, 'ভয় কি, তুমি তো আর বিধবা নও।'

দেওয়ানের আহারাদির বিচার যে গ্রামের আর-দশজনের মতো নয় এটা গ্রামের অনেকেই জানতো। এখন সেটা নিয়ে আবার আমলাদের গিন্নীমহলে এবং তা থেকে প্রতিবেশী মারফত নতুন ক'রে কানাঘুষো চললো।

॥ বারো ॥

নতুন স্কুলবাড়ির নকশা পেতে, কাজ শুরু হ'তে তখনও দেরি আছে। মোটা-মোটা অসংখ্য পাকা বাঁশের উপরে বাঁশের কাঠামোয় আটচালা উঠেছে একখানা। আপাতত তিন-চারটে ক্লাসের ব্যবস্থা হবে এরই নিচে। দশ-বারো জন ছুতোর ওই চালার নিচে করাত হাতুড়ি-বাটাল র‍্যাদার শব্দ হৈহৈ ক'রে বেঞ্চ তৈরি করছে ছেলেদের বসার। যেখানে তাঁতীপাড়ার সত্যপীরতলা ছিলো, সেটা স্কুলবাড়ির কাছেই, সেখানে অনেকটা জায়গাতে বাঁশের প্রাচীরের ঘেরের মধ্যে একটা নতুন বাড়ি উঠেছে। বাড়ির কাজ প্রায় শেষ হ'লো। ঘরামিরা চালে খড় দিচ্ছে। পাকা মেঝে, কাঠের দেয়াল, খড়ের ছাদ। জানলা-দরজাগুলিতে রং দিচ্ছে একজন ছুতোর। এটা হেডমাস্টারের বাড়ি। হরদয়াল স্থির করেছে স্কুল চালু হবার কিছুদিন আগেই হেডমাস্টার আসুন। গ্রামের দশজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করুন, নিজের মতো ক'রে স্কুলবাড়ি তৈরি ক'রে নিন। স্কুল যখন বসবে তখনো তাঁকে বাইরের লোক ব'লে যেন কেউ মনে না করে। বন্ধুকে ইতিমধ্যে একখানা তাগিদপত্রও দিয়েছে সে।

কয়েক দিন আগে গ্রামের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিত এসেছিলেন তার কাছে।

'হুজুর, বিদ্যার প্রসার খুবই হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপার।'

হরদয়াল তাঁকে দেখে অবাক হ'লো। জরাজীর্ণ দেহ, মলিন বেশ।

'আপনি ?'

'হুজুর, আমি এই গাঁয়ের পণ্ডিতমশাই।'

'বসুন, বসুন।'

হরদয়াল উঠে গিয়ে নিজে চেয়ার টেনে দিলো। পণ্ডিতমশাই দ্বিধা করতে লাগলেন।

'বসুন। আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে, আমি নিজেই আপনার কাছে যাবো-যাবো করছিলাম।'

পণ্ডিতমশাই বসলে হরদয়াল বললো, 'আগে আপনার বক্তব্য বলুন, তারপর আমার কথা বলবো।'

পণ্ডিতমশাই তবু সহজ হ'য়ে কথা বলতে আরও খানিকটা সময় নিলেন। অবশেষে এক-সময়ে বললেন, 'হুজুর, আমার পাঠশালা তা হ'লে উঠেই যাবে?'

'যাক-না উঠে, ক্ষতি কি?'

'এই বুড়ো বয়েস, জোত-জমাও নেই।' তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

'কষ্ট হবে, না? তা পরিবর্তনের সময় একটু কষ্ট সবারই হয়, কিন্তু সে দু-দিনেই স'য়ে যাবে, বরং নতুনটাই তখন ভালো লাগবে।'

'খাবো কি?'

হরদয়াল হাসতে গিয়ে থামলো। বললো, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে, এবার আমি যে-জন্যে আপনার পাঠশালায় যাবো বলছিলাম তা শুনুন: আপনার পাঠশালাটা তুলে দিতে হবে; তু'লে দেওয়া ঠিক নয়, তুলে নিয়ে আসতে হবে। স্কুলবাড়িটা তো দেখেছেন, ওইখানে একদিন আপনি আপনার সব ক'টি ছাত্র নিয়ে চ'লে আসবেন। পরে অন্যান্য গ্রাম থেকেও ছাত্ররা আসবে। সব ছাত্র তো আপনি একলা পড়াতে পারবেন না। কলকাতা থেকে একজন ইংরেজি-জানা মাস্টারমশাই আসবেন। পরে প্রয়োজন মতো আরও মাস্টারমশাইরা আসবেন।'

পণ্ডিতমশাই-এর দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক বোধ হ'তে লাগলো। এ-রকম উল্টো কথা তিনি আশা করেন নি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মেয়েটা পিছু ডেকেছিলো ব'লে ফিরে গিয়ে তাকে দু-ঘা দিয়ে বেরিয়েছিলেন

বাড়ি থেকে। একটু-সময় বোকা-বোকা মুখ ক'রে চেয়ে থেকে বললেন, 'তা হ'লে আমার জন্যও বৃত্তির ব্যবস্থা হবে?'

'আজকাল বৃত্তির ব্যবস্থা হয় না, বেতনের। বেতন বলুন, বৃত্তি বলুন, আপনার জন্যও ব্যবস্থা করা হবে।'

পণ্ডিতমশাই আনন্দে ছলছল চোখে উঠে দাঁড়ালেন, বোধ হয় খবরটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র ক'রে দেওয়ার জন্য তিনি আকুলতা অনুভব করছিলেন।

হরদয়াল বললো, 'কবে উঠে আসতে হবে আপনাকে জানাবো।'

পণ্ডিতমশাই চ'লে গেলে হরদয়াল ছাতি মাথায় দিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে রওনা হ'লো।

গোবর্ধনের ডাকঘরে ডাক এসে পৌঁছয় সন্ধ্যাবেলা। তখন ডাক বিলি করার ব্যবস্থা নেই। পরদিন সকালে গোবর্ধন ডাকের চিঠিপত্র ভাগ ক'রে বিলি করার জন্য গ্রামের মহিন্দির নাপিতকে দেয়। মহিন্দির তার বাঁধা মক্কেলদের দাড়ি কামিয়ে বেড়ানোর সাথে-সাথে চিঠি বিলির কাজও করে। চিঠির অধিকাংশ তিনটি ভাগে ভাগ করা থাকে। পিয়েত্রোর ভাগ নিয়ে যায় পিয়েত্রোর লোক, ডান্‌কানের বেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা, আর গোবর্ধন নিজে ডাকঘরের কাজ শেষ ক'রে বাড়ি যাবার আগে রাজবাড়ির চিঠিগুলো নিয়ে যায়।

গোবর্ধন অন্যান্য দিনের মতো চিঠি নিয়ে রাজকাছারির দিকে যাচ্ছিলো, পথে স্কুলবাড়িটার উঁচু আটচালার সামনে দাঁড়ালো। আটচালাটা দর্শনীয় হ'য়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। একটা বিষয়ে গোবর্ধনের মনঃপূত হয় নি ব্যাপারটা; এত উঁচু ঘর ঝড়ের মুখে টিকবে কিনা এ-বিষয়ে তার সন্দেহ আছে, যদিও এ-ব্যাপারে তার মাথা ঘামানো একেবারেই নিরর্থক। সাধারণ লোকের বাড়িঘর হ'লে বাড়ির কর্তার

সঙ্গে তবু এ-বিষয় নিয়ে খানিকটা আলাপ-আলোচনা করা যেতো। কিন্তু যে-বাড়ি হরদয়াল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তুলছে, তার সমালোচনা করাও চলে না, অথচ এ-প্রবৃত্তি এমনই অপরিহার্য যে কথাগুলো মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফেরে।

'হ্যাঁ হে, ডাক এসেছে তোমার?'

আহ্বানটা পেছন থেকে এসেছিলো, গোবর্ধন দাঁড়ালো।

'আছে হুজুর, এসেছে।'

দু-খানা চিঠি ছিলো। গোবর্ধন হরদয়ালের হাতে দিলো।

'হ্যাঁ গোবর্ধন, তুমি নাকি এর আগে উকিলের মুহুরি ছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।'

'তুমি তো ইংরিজি জানো, বাংলায় দরখাস্ত লিখতেও পারো।'

'কিছু-কিছু হয়।'

'এই স্কুলে মাস্টারি করতে পারবে? ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েদের পড়াবে?'

'হুজুরের হুকুম হ'লে পারি।'

'বেশ, কথা রইলো, পরে একদিন দেখা কোরো। তোমার ডাকঘর তো সকাল আর সন্ধ্যায়, দুপুরে স্কুল করতে পারবে।'

গোবর্ধন খবরটায় খানিকটা বিচলিত হ'য়ে চ'লে গেল। কিন্তু সে যতটা বিচলিত হয়েছিলো তার চাইতেও বেশি বিচলিত হ'লো হরদয়াল নিজে ডাকে-আসা-চিঠি খুলে। চিঠি লিখেছে তার কলকাতার বন্ধু। স্কুলের হেডমাস্টার ঠিক করেছে সে, তার নাম চন্দ্রকান্ত অ্যাণ্ড্রুজ বাগচী। সস্ত্রীক গ্রামে যেতে রাজী হয়েছে। তার স্ত্রীর নাম ক্যাথারীন। বাগচী বহুদিন মধ্যপ্রদেশে ও মদ্রদেশে মিশনারীর কাজ করেছে। লোকটি তেজস্বী ব'লেই মিশনারীদের সংস্রব ত্যাগ করেছে। ইত্যাদি।

হরদয়াল মিস্ত্রীদের ডেকে বললো, ‘হাত চালিয়ে কাজ করো। সাত দিনের মধ্যে সবগুলো বেঞ্চ ঠিক করা চাই। সাত দিন, শুনেছো ?’

হরদয়াল ভাবলো, এতদিন দরকার হয় নি, এখন দরকার হবে। সারাদিন এদের কাজের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে কাজগুলো করিয়ে নিতে হবে। সে স্থির করলো গোবর্ধনকেই নিয়োগ করা দরকার তদবির-তদারক করার জন্য।

হরদয়াল অপেক্ষাকৃত দ্রুতপায়ে বাড়ি ফিরে গেল। এত তাড়াতাড়ি হেডমাস্টার এসে পড়বে এ যে কল্পনাও করা যায় নি। হেডমাস্টারের বাড়ির ভেতরটা কিরকম হ'লো কে জানে। উঠোনটা গোবর দিয়ে নিকিয়ে, ঘরদোর ঝাড়পোঁচ ক'রে ঝকঝকে ক'রে রাখা দরকার। দশ জনের দৃষ্টিতে হেডমাস্টার হরদয়ালের বেতনভুক একজন কর্মচারীমাত্র, কিন্তু হরদয়ালের ব্যাকুলতা দেখলে মনে হবে যেন তার সমমর্যাদাবিশিষ্ট কোনো অতিথি আসছেন।

ক্যাথারীন্, বন্ধু লিখেছে, মাস্টারের স্ত্রীর নাম। ইউরোপীয়ান নাকি ভদ্রলোকের স্ত্রী! কি কৌতুকের ব্যাপার হ'লো। মেমসাহেবদের মতো, মতো আর বলা কেন, মেমসাহেবই যদি হয়, তাদের মতো গাউন প'রে উঁচু জুতো প'রে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াবে নাকি ?

কথাটা অকস্মাৎ মনে হ'লো। ডান্‌কান ইংরেজি শিক্ষারই প্রতিবাদ ক'রেছে। ফাদার এবং পাদরিদের ঘৃণা করে সে। স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা তো হবেই, উপরন্তু একজন মিশনারী-ঘেঁষা লোক আসছে শিক্ষকতা করতে, সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা। হয়তো তার বিলেতে বাড়ি নয়, হয়তো-বা তার পিতামাতার কেউ এ-দেশীয়ই ছিলো, তবু ডান্‌কানের রক্ত-কৌলীন্যের গর্বে সে পরোক্ষভাবে আঘাত দেবে।

একটা বিবাদ বেধে উঠতে পারে— অন্তত মনকষাকষি হবেই।

হরদয়াল ভ্রূকুটি ক'রে ভাবলো এবং চিন্তা করতে গিয়ে কোথায় একটা আঘাত খেয়ে হঠাৎ কড়া মুখে স্বগতোক্তি করলে— আমার স্কুলে আমি আমার খুশিমতো শিক্ষক রাখতে পারবো না, এ-নিয়ম কোথায় আছে? আর থাকলেই বা মানবো কেন।

হরদয়াল তখনই চিঠি লিখলো বন্ধুকে :

> ...স্কুলবাড়ি এখন পর্যন্ত তৈয়ারী শেষ হয় নাই, সম্ভবত আগামী মাঘিনার পূর্বে স্কুল বসিবে না, কিন্তু বাগচীসাহেবকে সস্ত্রীক রওনা করিয়া দিবে। এখনও বর্ষা আসিতে কিছু বিলম্ব আছে। নদীপথে যাত্রার প্রকৃষ্ট সময় ইহাই। আমি চার দাঁড়িযুক্ত একখানি বোট রওনা করিয়া দিতেছি। তাহারা স্টিমারের মতো দ্রুতগতি নয়, কিন্তু সঙ্গে যে চারিজন বরকন্দাজ যাইতেছে তাহারাও দাঁড় চালাইতে পারে। এবং বোটে দাঁড়িদের জন্যও আরও চারিটি বন্দুক থাকিবে। অর্থাৎ প্রয়োজনে আট জন দাঁড়ি এবং আট জন বরকন্দাজ পাইবে। ইহা আমার নিজস্ব বজরা জানিবে। আমি বলি কি, পারো তো একবার তুমিও চলিয়া আইস।......

চিঠি লেখা শেষ ক'রে হরদয়াল গোবর্ধনকে ডেকে পাঠালো, সে এলে জিগ্যেস করলো, 'তোমার ডাকের থলে কবে যাবে, সদরে পৌঁছে কলকাতার ডাক ধরতে পারবে কি?'

গোবর্ধন বললো যে তার ডাক দু-দিন পরে রওনা হবে এবং তারও একদিন পরে সদরে সে-ডাকের ঝোলা খোলা হবে। ফলে, কাল শুক্রবারে কলকাতা যাবার ডাক ধরতে পারবে না, তিন দিন পরে মঙ্গলবারের ডাক ধরবে।

গোবর্ধনকে বিদায় দিয়ে হরদয়াল তার খাস-ভৃত্যকে ডেকে পাঠালো।

'একবার সদরে যেতে হয় রে। ডাক ধরতে হবে।'

'আজই, আজ্ঞে?'

'এখনই না বেরুলে পৌঁছতে রাত হ'য়ে যাবে। তুই ঘোড়া চালাতে পারিস?'

'কিছু-কিছু।'

'তাতেই হবে, আমারটাই নিয়ে যা।'

চিঠিটা আর-একবার প'ড়ে খামে ভ'রে খাস-ভৃত্যের হাতে রওনা ক'রে দিলো হরদয়াল। তখনো হরদয়ালের স্নান-আহার হয় নি।

দুপুরের রোদ প'ড়ে গেলে কাছারি থেকে রানীর দরবারে খবর পাঠালো দেওয়ান। দরবার মঞ্জুর হ'লে হরদয়াল রানীর খাস-কামরায় উপস্থিত হ'লো।

হরদয়াল বললো, 'একটু মুশকিলে পড়েছি।'

'মামলা বাধলো নাকি? অনেক দিন বড়ো মামলার তোড়জোড় করো নি।'

'আজ্ঞে সে-সব নয়, রানী। আপনার স্কুলটার বিষয় নিয়েই—'.

রানী হাসলেন, 'পিয়েত্রোর সেই জ্ঞানদা বিদ্যালয়ের?'

'হ্যাঁ। ডান্‌কানসাহেবের সঙ্গে বিবাদ না লেগে যায়।'

'কেন?'

'হেডমাস্টার আসছেন একজন খ্রীস্টান মিশনারী।'

'খ্রীস্টান মিশনারী কেন?'

'ভদ্রলোক হেডমাস্টার হিসাবে উপযুক্ত হবেন ব'লে মনে হচ্ছে।'

'তবে?'

'ডান্‌কান চায় না সত্যিকারের শিক্ষায় কেউ শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে, অন্যায়কে অন্যায় বলতে শেখে। ভালো খ্রীস্টান মিশনারীদের সে সেই জন্য ঘৃণা করে। মিশনারীদের নাম শুনলে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। যে-হেডমাস্টার আসছেন তাঁর স্ত্রী সম্ভবত ফিরিঙ্গি। আমার ভয় হচ্ছে হয়তো-বা ডান্‌কান এ-সব কারণে বিবাদ শুরু করতে পারে।'

'ছাখো হরদয়াল, ওদের দেশ, ওরা রাজা—'

সহসা হরদয়ালের মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠলো, কিন্তু রানীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে উষ্ণতা প্রকাশ করা চলে না। সে মাটির দিকে চোখ রেখে বললো, 'দেশ ইংরেজের বটে, ডান্‌কানের নয়। যে-দেশে বাকু জন্মায়, যে-দেশের মাটিতে ফিলিপ সিড্‌নি জন্মায়, যে-দেশের লোক বীটনসাহেব, সে-দেশে ডান্‌কানদের মতো মূর্খ জন্মায় বটে, তাই ব'লে সে-দেশের প্রতিনিধি হয় না।'

'কি করতে হবে?'

'আপনার আশ্রয় পেলে আমি ডান্‌কানের বিরুদ্ধতা সহ্য করতে পারবো।'

'বিরুদ্ধতা যদি শুরু করেই, পিয়েত্রোর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ কোরো। বিদ্যালয়টাতে তো তারও কিছু-কিছু উৎসাহ আছে।'

'তা আছে, কিন্তু ভদ্রলোক যেন কেমন নির্জীব।'

'ওতেই হবে। চিরকালই অমনি লোকটি, কিন্তু—'

হঠাৎ রানী কথার মাঝখানে থামলেন। মুখ নিচু ক'রে বুটিদার জাজিমের একটা বুটিতে আঙুল ঘষতে-ঘষতে বললেন, 'তোমাদের কথা শুনে-শুনে লোকটির সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হয়েছে, তাতে আমার মনে হয় লোকটিকে নির্জীব মনে হ'লেও তার সাহস বা শক্তির অভাব নেই।'

হরদয়াল বললো, 'আপনার কথা মনে রাখবো। আজই বোট রওনা ক'রে দিচ্ছি হেডমাস্টারকে আনার জন্য। বাতাস পেলে যেতে-আসতে পনেরো দিন, বাতাস না পায়ও যদি তিন সপ্তাহে ফিরবে।'

হরদয়াল চ'লে গেল। রানী ভাবলেন, বয়সেই লোকের প্রৌঢ়ত্ব আনে না; তা যদি আনতো তবে হরদয়ালের কথায় এমন উচ্ছলতায়

হর থাকতো না। প্রায় প্রৌঢ় হয়েছে হরদয়াল বয়সের হিসাবে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ব্যাপার নিয়ে সে সম্ভব-অসম্ভব কত কল্পনা করছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কোথায় কোন দেশ থেকে খ্রীস্টান হেডমাস্টার আসছে, তার নাকি আবার ফিরিঙ্গি স্ত্রী।

॥ তেরো ॥

বুজরুক আলি ফিরে এসেছে। জেলখানার দরজায় একটা আট-বেহারার পালকি থামতে দেখে কয়েদিরা অবাক হয়েছিলো, এমন কি জেলের কর্মচারীরাও। কয়েদির পোশাক পরা একটা লোক, তার নামের লেবেল-আঁটা সেরোয়ানি আচকান প'রে কয়েদির পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়ালে নতুন বোধ হয়। ধূলিমলিন বিবর্ণপ্রায় আচকান সেরোয়ানিতে বুজরুকের চেহারায় আশ্চর্য হবার মতো খুব বড়ো রকমের কিছু-একটা ছিলো না, বরং বিবর্ণ রুগ্ন চেহারার লোকটিকে দেখে মন বিমুখ হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু অবাক করলে পালকি এবং পালকির সঙ্গে যে-লোকটি এসেছিলো সে। কুল্লাযুক্ত পাগড়িটা বগলদাবা ক'রে ন্যাড়া-মাথায় বেরিয়ে জেলের লোহার দরজার বাইরে বুজরুক আলি দাঁড়াতেই ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে সসম্মানে তাকে গ্রহণ করলো। ভদ্রলোকটি এই শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও বিচক্ষণ উকিল ব'লে সুখ্যাত।

বুজরুক আলি মলিন মুখে হাসলো, তারপর পালকিতে গিয়ে উঠলো। উকিল তার ঘোড়াগাড়িতে গিয়ে উঠলো। পরস্পরকে শান্তি ও শুভ-যাত্রা কামনা ক'রে পালকিতে বুজরুক ও টমটমে উকিল বিপরীত দিকে রওনা হ'লো।

গ্রামে ফেরার ব্যাপারও এমনি নিঃশব্দে। বরং একটু কৌতুকের আভাস ছিলো সেই নিঃশব্দতায়। ঘোড়ায় ফিরছিলো রাজু পিয়েত্রোর কুঠি থেকে। কিছুদিন ধ'রে সে পিয়ানো নিয়ে মেতে উঠেছে। সকালে এসে খানিকটা অনুশীলন ক'রে রোদ কড়া হবার আগেই ফিরে যায়। পিয়েত্রোর মতে মাসখানেক অনুশীলন করলে মোজার্টের সেই বিশেষ সুরটুকু তার হাতে শুনবার মতো হ'য়ে ফুটবে।

রোজকার মতো ফিরতে-ফিরতে রাজু ঘোড়ার গতি কমাতে বাধ্য

হ'লো। পথটা চওড়া বটে, তাই ব'লে রাজুর ঘোড়া আর উল্টো-দিক থেকে এগিয়ে আসা চওড়া আট-বেহারার পালকিটা একই সঙ্গে পথের উপরে থেকে পরস্পরকে পার হবে এমন সম্ভব ছিলো না। রাজু ঘোড়াটাকে একেবারে থামিয়ে দিলো, কিন্তু লাগামের টান কড়া হওয়ায় কিংবা সামনের বেহারাদের হুম্‌হুম্‌ শব্দে বিচলিত হ'য়ে তার ঘোড়া পেছনের দু-পায়ে বার-বার সোজা হ'য়ে উঠতে লাগলো। ওদিকে বেহারারাও পথ ছেড়ে নিচে নামতে নারাজ।

কিন্তু সহসা সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল। রাজুর ঘোড়া হঠাৎ রাস্তার ধারে নেমে পড়লো, পালকির বেহারারাও তাদের বাঁ-দিকে নেমে প'ড়ে জায়গাটুকু পার হ'লো।

রাজু রাস্তায় উঠে ভ্রূকুটি ক'রে বললো, 'কে যায় ?'

ঝাঁকুনিতে বুজরুকের তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়েছিলো, সে-ও বললে, 'কে চলে ?'

কিন্তু ফিরে গিয়ে মান-অপমানের ফয়সলা করার মতো জেদ রাজুর তখন নেই, বুজরুকেরও তরোয়াল নিয়ে পালকি থেকে বেরুবার মতো শক্তি ছিলো না। পরস্পরের পথ অতিক্রমণ করার কালে যে-হাসি, গল্প ও হৃদয়োচ্ছ্বাস স্বাভাবিক হ'তো সেটা একটা নিঃশব্দ দ্বন্দ্বের মধ্যে অতিক্রান্ত হ'লো।

পরদিন পিয়েত্রোর ঘরে ঢুকে রাজু দেখলো, পিয়েত্রো গালে হাত দিয়ে ব'সে চিন্তা করছে।

'বড্ডো চিন্তা করছেন যেন !'

'বুজরুক এসেছে কাল।'

'কখন এল ?'

'তুমি যাবার কিছু পরে।'

'কোথায়, কোথায় সে ?'

'ওই ঘরে ঘুমুচ্ছে ; থাক, থাক, আর-একটু ঘুমিয়ে নিক।'

'সে কি, এখন তো আলি খাঁর এক প্রহর বেলা। জেল খেটে কি সময়ের জ্ঞানও নষ্ট হয়েছে নাকি ?'

পিয়েত্রোর দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

রাজু বলতে যাচ্ছিলো— অসুখ করেছে নাকি, কিন্তু মাঝ-পথে তাকে থামতে হ'লো। ঘরের দরজা খুলে বুজরুক আলি প্রবেশ করলো। খালি-গা, একটা প্রকাণ্ড কাঠামো ব'লেই শীর্ণতা যেন অত প্রকট। রাজু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দু-হাতে বুজরুক আলির দু-হাত ধ'রে বললো, 'আলি খাঁ!'

সহসা রাজুর কি হ'লো ; কি জন্য বলা কঠিন, তার চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠলো। কথা বলতে কষ্ট হ'তে লাগলো।

বুজরুক হাসলো।

রাজু চোখের জল হাতের পিঠে মুছে বললো, 'এ হে, জেলখানায় খেতে দেয় নি।'

বুজরুক হেসে বললো, 'শ্বশুরবাড়িতে খেতে দেয় না, এ কি বিশ্বাস্য ?'

'কিন্তু শরীর সারতে অনেক দিন লাগবে। এখন কিছুদিন খাওয়া-দাওয়া করো আর শুয়ে থাকো।'

'তা বটে। শুধু তাই নয়। ঘুম, ঘুম, কেবল দিনরাত্রি ঘুমবো।'

'জেলখানায় ঘুমুতে না ?'

'ওইটি কিছুতেই পারতাম না। ঘুমনোর আগে ওদের এক ঘুম-তাড়ানি মন্ত্র পড়তে হ'তো, তারপর আর ঘুম আসতো না।'

'কি সে মন্তর ?'

'ওদের সরকারকে সেলাম কিংবা ওইরকম একটা কথা ভাঙা-ভাঙা উর্দুতে বলাতো।'

পিয়েত্রো বললে, 'বুজরুক, আর কথা বোলো না। বোসো। আগে খাও।'

একান্ত বাধ্য ছেলের মতো টেবিলে বসলো বুজরুক। বাবুর্চি প্রস্তুত ছিলো। পরাতে ক'রে একবাটি সুরুয়া এনে দিলো।

বুজরুক মুখ কাঁদো-কাঁদো ক'রে বললো, 'আজও এই?'

পিয়েত্রো শাসনের ভঙ্গিতে বললো, 'আগে খেয়ে নাও। ওই খেয়ে নেপোলিওঁর সেনাপতিরা দিনের-পর-দিন যুদ্ধ করেছে; আর যুদ্ধ নেই, তবু ওটুকুতে তোমার পোষায় না।'

চামচ দিয়ে সুরুয়া নাড়তে-নাড়তে সেটুকু শেষ ক'রে বুজরুক বললো, 'আমার উপরে খুব ঘৃণা হয়েছে, না রাজাভাই? ঘৃণা হওয়া খুব স্বাভাবিক। মনসেনের মুখে শুনে ভারী ভালো লাগলো। এমন যদি দেশের রাজা হয় তবে আবার হাতিয়ার ধরি।'

রাজু কি বলতে যাচ্ছিলো এমন সময়ে আবার বাবুর্চি ঢুকলো। থালায় ক'রে পাখির মাংসে আর চালে রান্না করা কি-একটা খাদ্য। পিয়েত্রো উঠে এসে পরীক্ষার নজর দিয়ে দেখলো।

পিয়েত্রো আবার বললো, 'আগে খেয়ে নাও।'

বুজরুক সুবোধ বালকের মতো আহারে মন দিলো। হুঁকাবরদার হুঁকা দিয়ে গেল। গড়গড়ার নলটা নিয়ে পিয়েত্রো ধোঁয়ায় ডুবে গেল।

আহার শেষ হ'লে বুজরুক বললো, 'কাল থেকেই এইরকম শুরু হয়েছে। বাবুর্চি বলছে স্বাভাবিক খাদ্যে পৌছুতে আমার একপক্ষ কাল যাবে। মনসেনের চোখে আমার আর সাবালক হওয়া হ'লো না।'

রাজু বললো, 'তুমি বাইরে আসায় আমি কিন্তু শেষপর্যন্ত খুশি হয়েছি।'

'কে বলবে হন নি। আমার বাইরে-আসার পদ্ধতিটা অনুমোদন করেন নি। আমি নিজেও খুব-একটা করি নি। কিন্তু উকিলসাহেবের সঙ্গে কথায় পারবে কে। শিবাজীর গল্প শুনিয়ে দিলো। আলমগীরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলো শিবাজী, কাজেই যে-কেউ ছল ক'রে পালাতে পারে শত্রুর কয়েদখানা থেকে।'

'কিন্তু ওদের কিরকম দম্ভ দেখ! ওদের নিশানকে সেলাম না করলে ওরা তোমাকে ছাড়তো না।'

'তা করলেও ছাড়তো না। ওরা দাম্ভিক বটে, কিন্তু যত-না দাম্ভিক তার চাইতেও বেশি ধূর্ত। নিশান-সেলাম ছলমাত্র। আসলে সবটুকুই আমাদের উকিলের প্যাঁচ। মামলা নিয়ে কলকাতার বড়ো আদালতে এবং সেখান থেকে বিলেতের কোর্টে যাবার তোড়জোড় করছিলো। আর এদিকে মামলায় সাক্ষীসাবুদে নাকি গোলযোগ ছিলো। সে-কথা জানলাম পরে। ততক্ষণে উকিল এবং কালেক্টরে নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে। আমিও ক্ষমা প্রার্থনা করবো, ওরাও আমার অপরাধ মকুফ করবে। আসলে যে আমার অপরাধ পিনালকোডের আওতায় পড়ে নি এটা ওরা স্বীকার করলে না। এ ছাড়াও আসলে কি হয়েছে কে বলবে! জালিয়াতিতে ওরা সবাই ক্লাইভের চেলা। প্রয়োজন হ'লে সব কাগজ জাল করতে পারে। এত সব কথা কেন বললাম, জানেন রাজাভাই? অন্য লোকে ঘৃণা করলে আমার কষ্ট নেই, কিন্তু আপনি ঘৃণা পোষণ করলে কষ্ট হবে।'

রাজু একমনে বুজরুক আলির কথা শুনছিলো। সে বললো, 'আলি খাঁ, তুমি ভয় পেয়ে অন্যায়কে মেনে নেবে এ-বিশ্বাস আমি কোনোদিনই করবো না।'

বুজরুকের ইচ্ছা হ'লো সে একটু রসিকতা করে, ব্যাপারটা লঘু ক'রে আনার চেষ্টাও করলো কিন্তু পারলো না, বললো, 'আপনার এ-বিশ্বাস যেন রাখতে পারি ভাই।'

অবশেষে আবহাওয়াটা হাল্কা ক'রে দিলো পিয়েত্রো গ্রামের কথা তুলে। রাজবাড়ির নাচের কথা বললো সে, রাজুর পিয়ানো শেখার কথা, ডান্‌কানের সঙ্গে রাজুদের কি রকম সদ্ভাব হয়েছে। সাধারণ ঘটনাকে গল্পের মতো জমিয়ে তোলা একটা অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, পিয়েত্রোর এ-ক্ষমতা ছিলো। ঘটনাগুলি বুজরুকের কাছে তো নতুন লাগবারই কথা, রাজুর কাছেও নতুন লাগতে লাগলো।

তারপর দেওয়ানের স্কুলের কথাও উঠলো।

বুজরুক বললো, 'ইংরেজি শেখার জন্যই স্কুল?'

পিয়েত্রো বললো, 'ভাষা নয় শুধু, জ্ঞান-বিজ্ঞান।'

'তা বটে, ওরা রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে। স্কুলে কি রেলগাড়ি তৈরি করাও শেখানো হবে?'

'তা হবে না? ভাষাটা আয়ত্ত করতে পারলে ওদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের খোঁজখবরও ছাত্ররা নেবে।' রাজচন্দ্র বললো।

পিয়েত্রো হাসতে-হাসতে বললো, 'তুমি কি ভয় পাচ্ছো সারা দেশ খ্রীস্টান হ'য়ে যাবে?'

'হ'তে পারে তো।'

'এ-দেশে সবই উল্টো হয়। আর যা-ই হোক, এ-দেশে ধর্মমত বদলাবে, সারা দেশ অন্য ধর্ম মেনে নেবে, এমন মনে হয় না। দু-তিন শ' বছরে খ্রীস্টান রোম সারা য়ুরোপকে খ্রীস্টান করেছিলো, পাঁচ শ' বছরেও ভারত ইসলামী হয় নি। বরং এ-দেশে এসে কান পেতে এদের কথা শুনলে নিজেদের পৈতৃক ধর্মটাই বদলে যায়। এরা অত্যন্ত পুরনো,

ঠাকুরদাদাকে যেমন আধুনিক করা যায় না যতই আধুনিক পোশাক পরাও, এ-ও তেমনি।'

বুজরুক পিয়েত্রোর কথাগুলি ধীরভাবে শুনে বললো, 'জেলের খাঁচায় ব'সে এই কথাটা প্রায়ই ভাবতাম। ছোটোবেলায় মৌলবীসাহেবের কাছে শুনেছিলাম মাহমুদ গজনি আর মাহমুদ ঘোরী এ-দেশে ইসলাম এনেছেন। কথাটা উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে আমাদের পীরসাহেবের ছেলে যে-কেচ্ছা বলেছিলো তা-ও মনে পড়লো। মাহমুদ ঘোরী কুফ্‌রি শাসন ক'রে গাজি হবার আগে স্বদেশে গজনিরাজ্য উৎখাত করেছিলো, ভারতে প্রবেশ ক'রেও শত-সহস্র ইসলামী বধ ক'রে গজনিসাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিলো। আর তার পরও ভারতে ইসলামী বাদশারা যত যুদ্ধ করলো তাতে মুসলমান সৈন্য যত বধ হয়েছে, হিন্দু সৈন্য তত নয়। রাজ্যবিস্তার আর ধর্মবিস্তার এক নয়, এক সঙ্গে হয় না।'

পিয়েত্রো বললো, 'তা হ'লে দেওয়ানের এই স্কুল করা তুমি সমর্থন করো এদিক থেকে?'

বুজরুক হাসতে-হাসতে বললো, 'দেখা যাক, দেখা যাক। দেওয়ান-সাহেব যে অন্তত খ্রীস্টান নয়, এ তো আপনিই কিছুক্ষণ আগে বললেন। আমি শুধু ভাবছিলাম যুদ্ধের সময় ধর্ম-জ্ঞান থাকে কিনা, আর রাজ্য মানেই যুদ্ধ। হজরত শের শাহের হিন্দু সেনাপতির দাপটে হুমায়ুঁ বাদশার প্রাণ যায়-যায়। এদিকে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টানের ষড়যন্ত্রে মুসলমান নবাবী শেষ হ'লো, মুসলমান নবাবের জন্য হিন্দু প্রাণ দিলো, ফরাসী খ্রীস্টানও দিয়েছিলো দু-একজন।'

পিয়েত্রো টিপ্পনি কাটলো, 'যুদ্ধ-জ্ঞানটা তোমার ঠিক আছে, ধর্ম-জ্ঞান না থাকলেও।'

বুজরুক গম্ভীর হওয়ার ভান ক'রে বললো, 'তা-ও যদি থাকবে তবে

কি আর জেল খাটি! দেখা যাক।' —ব'লে বুজরুক যতই বিষয়টিকে পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করুক তার বক্তব্য আদৌ শেষ হয় নি। কিছুক্ষণ অন্য কথা ব'লে আবার সে স্কুলের কথায় ফিরে এল।

সে বললো, 'স্কুলের পণ্ডিতরা কি বলবেন না, ইংরেজ-জাতের মতো এমন আর কোনো জাত নেই?'

'তা খানিকটা বলবে বৈকি।' পিয়েত্রো বললো।

'কিন্তু তা-ও যদি না বলে? শুধু ইংরেজদের এই-এই সদ্‌গুণ আছে, অন্য জাতের নিন্দা না-ক'রেও যদি বলে?'

'কি ফল হবে তার?'

বুজরুক কথাটা ভেবে নিলো মনে-মনে, তারপর বললো, 'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার হবে, ছাত্ররা নিজেদের ছোটো ভাবতে শিখবে। আমার এই রাজাভাই-এর কথাই ভাবুন না! ইংরেজি-ভাষাজ্ঞান আমাদের দু-জনেরই সমান। আমরা তো মূর্খ ভাবতে আরম্ভ করবোই নিজেদের, আর সেই ছাত্ররা যারা নিজেদের ইংরেজদের চাইতে ছোটো মনে করতে শিখবে তারাও আমাদের ছোটো ভাববে।'

সেদিন আর পিয়ানোর অনুশীলন করা হ'লো না।

রাজুকে ঘোড়ায় তুলে দিতে-দিতে বললো বুজরুক, 'রাজাভাই, শরীর একটু সারলে আবার একদিন শিকার খেলতে যাবো। যাবেন তো?'

'নিশ্চয় যাবো।' ঘোড়ার উপরে লাফিয়ে বসতে-বসতে হাসিমুখে বললো রাজু, 'কাল সকালে আবার আসবো।'

রাজু চ'লে গেলে বুজরুকও স্নান করতে গেল। পিয়েত্রো তখন স্কুলের প্রসঙ্গটা ভাবলো: পলাশি-যুদ্ধের বিষয়-নিয়ে কতকগুলি ছড়া রচনা করেছে কয়েক জন সংস্কৃতিবিহীন গ্রাম্য ছড়াকার, তাতে ইংরেজজাতিকে বীরশ্রেষ্ঠ ব'লে বর্ণনা করেছে। যারা সত্যিকারের ইতিহাস জানে না,

তারা ভাবতে শিখবে ছড়াকাররা যা বলছে সেটাই সত্য। ইংরেজ এ-দেশ জয় করেছে বাহুবলে। এ-দেশের লোকদের স্বাস্থ্য ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে, তার পরে মনেও যদি ইংরেজদের শক্তির স্বীকৃতি বাসা বাঁধে— চিরদাসত্ব ছাড়া অন্য কোনো পথই থাকবে না এদের ঠিক এমনি ভাবেই জ্ঞান-গরিমাতেও যদি জাতি হিসাবে ইংরাজের শ্রেষ্ঠত্ব এরা শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে মেনে নেয় তা হ'লে ভাবের দাসত্ব চিরস্থায়ী হবে। তার চাইতে বড়ো অধীনতা আর কি আছে? বিশেষ ক'রে ইংরেজের শিক্ষাপদ্ধতি ও তাদের কলকাতা-সংস্কৃতিকে বিচার ক'রে দেখা দরকার।

কিন্তু হয়তো শেষপর্যন্ত এদের মধ্যেও, এই কুশিক্ষার মধ্যেও এমন বীজ রোপিত হবে যাতে সত্যিকারের মহত্ত্ব পুষ্পিত হবে।

পিয়েত্রোর হাসি পেলো কথাটা মনে প'ড়ে যাওয়ায়। গতবার কলকাতায় বণিকমহলে সে কয়েক ঘণ্টার জন্য গিয়েছিলো। সেই বণিকদের একজন দুঃখ ক'রে বলছিলো, তার এক এতদ্দেশীয় ক্লার্ক নাকি তার মুখের ওপর ন্যায় ও নীতি নিয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছে। এবং সে-বক্তৃতায় সে নাকি বলেছিলো— বার্ক ও শেরিডানকে আদর্শস্থানীয় ব'লে মনে করি ব'লেই যদি মিস্টার হজ্ সেই শ্রদ্ধা চান তবে তার চাইতে মূর্খতা আর কিছুতেই নেই।

সাধারণের পক্ষে এ-শিক্ষার কিছুমাত্র যৌক্তিকতা নেই, তবে কিছু নেতা তৈরি করছে। ইংরেজি-জ্ঞান তাদের মনকে উন্নত করছে তা নয়, তীক্ষ্ণ করছে; প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে হ'লে যে-যোগ্যতা দরকার সেগুলি তারা আহরণ করছে ইংরেজদের কাছ থেকে। ঠিক যেন বারুদের ব্যবহার শত্রুর কাছে শিখে নেওয়া।

পিয়েত্রোর তামাক বদলে দিয়েছিলো হুঁকাবরদার। নতুন তামাকে

মুখ দিয়ে পিয়েত্রো ভাবলো: যেমন ধর্মের ব্যাপারে। নিজস্ব সংস্কৃতি যাদের নেই তারাই খ্রীস্টান হয়েছে। তেমনি শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজদের অনুকরণ তারাই করবে যাদের শিক্ষার ঐতিহ্য নেই। যাদের সেটা আছে তাদের সঙ্গে প্রতি মিটার জমির জন্য ঝগড়া হবে। ইংরেজি শিক্ষার দ্বন্দ্বপ্রবণতা এদিক দিয়ে মন্দ নয়। রাজা চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের কথা, ফরাসীদেশের রেভল্যুশন, বার্কের বক্তৃতা এদের জানা থাকা ভালোই। মানসিক উন্নতি না হোক, ইংরেজদের রাজনীতির সমকক্ষ হোক।

বুজরুক স্নান শেষ ক'রে ফিরলো। সাঁতারের পরিশ্রমে তার মুখমণ্ডল রক্তাভ।

'কি ভাবছেন? স্নান কখন হবে? দুপুরের টেবিল পেতেছে দেখলাম।'

'এত বেলা হয়েছে?' পিয়েত্রো হুঁকার নল ফেলে উঠে দাঁড়ালো। 'তুমি আমার জন্যে দেরি কোরো না। ওরে, গোসলখানায় জল দে।'

সেদিনটা শেষ হবার আগেই আর-একবার স্কুলের কথা উঠলো পিয়েত্রোর কুঠিতে।

রাত্রির আহারাদির শেষে বুজরুক টেবিলে ব'সেই বললো, 'একবার যাবো নাকি দেওয়ানসাহেবের কাছে স্কুলের কথা বলতে?'

'কি বলবে? স্কুলের ফল ভালো হবে না?'

'এটাই তো সোজা এবং সরল এবং আসল কথাও।'

'কিন্তু দেওয়ানের কাছে প্যাঁচে তুমি এখনো শিশু, বুজরুক।'

'কি রকম?'

'স্কুলটা হচ্ছে আমাদেরই জমিতে, স্কুলের নামটাও আমাদেরই দেওয়া। বোধ হয় ট্রাস্ট-দলিলে আমাদেরও নাম থাকবে।'

'কী অন্যায় কথা, আপনি মত দিলেন ?'

পিয়েত্রো তিরস্কার শুনে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

বুজরুক বিচলিত হ'য়ে বারংবার বলতে লাগলো, 'কী অন্যায়, কী অন্যায় !'

পিয়েত্রো বললে, 'অবশ্য সে আমার ব্যক্তিগত মতই নিয়েছে, তোমার এ-বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'

'ওটা কি আর কোনো দামের কথা হ'লো, মন্‌সেনে ?'

পিয়েত্রো অতি সন্তর্পণে মদের গ্লাসটা পূর্ণ করতে-করতে বললো, 'বুজরুক, যদি তুমি ইংরেজবিমুখী কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষা দিতে চাও, আমার ওই আটচালায় স্কুল বসাও।'

'পাণ্টা স্কুল ?'

'মন্দ কি ?'

দেখা হবার সুযোগ ছিলো, তবু দেখা করে নি। দুপুরে মহাভারত পড়া শেষ ক'রে রানীর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি নিজের বাসায় না ফিরে নয়নতারা আজকাল কখনো-কখনো রাজবাড়ির আশ্রিতদের, পরিজনদের ঘরে গিয়ে বসে। তারা ডেকে নিয়ে যায়। আট-দশ দিন দেখা হয় নি রাজুর সঙ্গে। মহাভারত পড়ার সময় নয় এমনি এক সময়ে সে একদিন নয়নতারার বাড়িতে গিয়েও খুঁজে পায় নি তাকে। সে-অভিমান এখনো আছে রাজুর মনে। মহাভারত পড়া শেষ ক'রে আজ অন্য কারো ঘরে না গিয়ে নয়নতারা পা টিপে-টিপে রাজুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। আশা করেছিলো রাজুকে ঘরেই পাবে, কিন্তু ঘরে সে ছিলো না।

নিজের বাড়িতে ফিরে, তখনো দুপুরবেলা পার হয় নি, নয়নতারা চরকা নিয়ে বসলো। এটা নয়নতারার শখ। এক তাঁতীর সঙ্গে কথাও বলেছে। তাঁতী বলেছে সুতো দেখলে তবে সে কথা দিতে পারে। জরি তার কাছে নেই, সদর থেকে আনিয়ে নেবে। রাজুর ধুতি-চাদরের সুতো কাটছে নয়নতারা। তার চাইতে ভালো কাটুনি নেই তা নয়, দামী ভালো ধুতি কিনতে পাওয়া যায় না, এমনও নয়। দাম দিয়ে কিনে রাজকুমারকে দিতে পারে রাজকন্যা। নয়নতারার দাম দিয়ে কিনে দেওয়ার কথা মনেই হয় নি। দাম দিয়ে কেনার মধ্যে জরিটুকু আর দাম দেওয়ার মধ্যে তাঁতীর মজুরি। চারখানা কাপড়ের সুতো কেটে দেবে নয়নতারা, তার পরিবর্তে নয়নতারার পরিকল্পনা মতো জরি বসিয়ে এক জোড়া ধুতি-চাদর তৈরি ক'রে দেবে তাঁতী। সুতো দেখে তাঁতী জিগ্যেস করেছিলো— কার জন্যে মা, এত দামী জিনিস কার জন্যে হবে?

—দামী কোথায়, কাপাসের আবার দাম কি!

'কি হচ্ছে ?'

কথাটা কানে গিয়েছিলো নয়নতারার। সুতোর খেইটা তখনো হাতে, টাকুতে জড়িয়ে রেখে মুখ তুলে নয়নতারা হাসলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাজকুমার।

নয়নতারা উঠে চরকা ও তুলো একটা বড়ো বেতের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পালঙ্কের তলায় সরিয়ে রাখলো, উঠে এসে রাজুর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালো। নয়নতারার ঠোঁট দুটি একটা মৃদু হাসিতে ভ'রে উঠলো, 'বড্ডো রাগ হয়েছে। কোথায় ছিলে সারাদুপুর, খুঁজে পেলাম না। তোমার ঘরেও গিয়েছিলাম।'

রাজকুমারের মুখ বিমর্ষ।

নয়নতারা কথার সুর বদ্‌লে ফেললো, 'শিকারে যাচ্ছো? বড্ডো রোদ্দুর যে।'

'নয়ন!'

'বলো। আমি তো তখন থেকেই শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

'না, কিছু না। চলো, দু-জনে বেড়িয়ে আসি।'

'সে কি, এই দুপুর রোদ্দুর মাথায় ক'রে কোথায় বেড়াতে যাবে?'

'অনেক দিন আগে যেন আমাদের এই রকম কি-একটা কথা হয়েছিলো মনে পড়ছে। চলো। দুপুর রোদে একা-একা বেড়ালাম খানিকটা। ভালো লাগলো না। মনে হ'লো তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ভালো লাগবে। সেখানে চলো যেখানে আর-কেউ নেই। আমি রূপচাঁদকে ব'লে দিই, রামপিয়ারীকে সাজিয়ে আনুক।'

'এখানে বোসো, গল্প করি।'

'না, নয়ন, এখানে বসতে ইচ্ছে করছে না।'

নয়ন একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'মেয়েমানুষ কি বেড়াতে পারে! লোকে নিন্দে করবে যে, তোমার নিন্দে হবে। সে ভালো নয়।'

'আংটি-বদল তা হ'লে তোমার ছল, নতুবা আমার সঙ্গে পথে কেন, নরকে যেতেও আপত্তি করতে না।'

'শোনো, শোনো।'

রাজু অভিমানে মুখ লাল ক'রে চ'লে গেল।

খানিকটা সময় বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে নয়নতারা তার প্রতিবেশী একটি বালককে ডেকে পাঠালো। সে এলে বললো, 'রাজবাড়ি চিনিস তো, সেখানে রূপচাঁদ ব'লে একজন চাকর আছে। তাকে ডেকে আনবি। যদি খুঁজে ডেকে আনতে পারিস খইচুরের মোয়া দেবো খেতে।' ছেলেটির বুদ্ধি ও তৎপরতা খইচুরের মোয়ার আকর্ষণ জাগ্রত করেছিলো নিশ্চয়ই। রূপচাঁদকে সত্যি ধ'রে আনলো ছেলেটি। তাকে মোয়া দিয়ে বিদায় ক'রে নয়নতারা রূপচাঁদকে বললো, 'রাজকুমার কোথায় জানো রূপচাঁদ?'

'আজ্ঞে, তা জানি বৈকি?'

'কোথায় আছেন?'

'রাজবাড়িতেই।'

নয়নতারার কৌতুক বোধ হ'লো রূপচাঁদের মিথ্যা ভাষণের চেষ্টায়। সে বললো, 'তা হ'লে তুমি খবর রাখো না। আমি কিছুক্ষণ আগেই রাজবাড়ি থেকে এসেছি। রাজকুমার বন্দুক নিয়ে শিকারে গেছেন। কোথায় গেছেন তা জানো?'

মিথ্যা ধরা পড়ায় বিপন্ন মুখে রূপচাঁদ বললে, 'আজ্ঞে খোঁজ ক'রে দেখি। আপনাকে খবর দেবো।'

'হ্যাঁ। খবরটা আমি চাই। আর তুমি যে খবর রাখো নি সে-খবরটা আমার জানা রইলো।'

আজকাল রাজকুমার বড়ো হয়েছেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় চলাফেরা করেন, সঙ্গে লোক থাকা পছন্দ করেন না— এই রকম কতকগুলি কৈফিয়ত মিনমিন ক'রে বলতে-বলতে রূপচাঁদ পালালো।

বহুদিন পরেও রূপচাঁদ স্বীকার করেছে— সেই একদিনেই নয়নতারাকে চিনে নিয়েছে সে, দ্বিতীয়বার চিনবার দরকার নেই। বাকি জীবন বাধ্য হ'য়ে কাটিয়ে দিলেই চলবে।

সন্ধ্যার আগে-আগে রূপচাঁদ এল। সঙ্গে দু-জন লোক। তাদের হাতে লাঠি ও হারিকেন। লোক দুটিকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে রূপচাঁদ নয়নতারার দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'রাজকুমার শিকারে গিয়েছিলেন, মা। বড়ালের জঙ্গলে।'

'সে তো শুনেছি মস্ত বন। একা সেই বনে গিয়েছিলেন? কী সর্বনেশে ব্যাপার!'

'আর বলবেন না, মা, সেই দুপুর থেকে ছুটতে-ছুটতে লোকের কাছে সুধোতে-সুধোতে জঙ্গলে গিয়ে তবে— সে যা হয়েছে, হয়েছে। সইস ঘোড়া নিয়ে গেছে। এবার আমরা যাচ্ছি শিকার কুড়োতে। বনজঙ্গল চ'ষে ফেলার মতো অবস্থা। আমাকে বললেন— ঘোড়া নিয়ে আয়, আর সঙ্গে লোক আনিস, শিকার নিয়ে যাবে। পাখি যে কত মরেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, একটা চিতল হরিণও দেখলাম শিকার হ'য়ে গেছে।'

নয়নতারা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে শুনলো, ধীরে-ধীরে বললো, 'রূপচাঁদ, ফিরবার পথে তুমি একা একবার এসো। আমার একটু রাজবাড়িতে যাবার দরকার আছে।'

'আমাদের ফিরতে রাত অনেক হবে মা, এখন কাউকে ডেকে দিয়ে যাবো?'

'তার দরকার নেই।'

রূপচাঁদ আবার এসে যখন ডাকলো তখন রাত হয়েছে। আকাশে একটা ধূসর জ্যোৎস্না উঠেছে। রাতের দিকে তাকিয়ে সময়ের মাপ বোঝা যাচ্ছে না, যতটা প্রকৃতপক্ষে গভীর তার চাইতেও গভীর বোধ হচ্ছে জ্যোৎস্নাটার জন্য।

রূপচাঁদের ডাক শুনে একটা মোটা বড়ো চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে নয়নতারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, ঘরের শেকলটা তুলে দিয়ে বললে, 'চলো।' নয়নতারা আগে যাচ্ছে, পেছনে নিঃশব্দে রূপচাঁদ।

রূপচাঁদ বললো, 'মা, রানিমাকে যেন বলবেন না দুপুরবেলার কথা। আমি ভেবেছিলাম রাজকুমার আপনার বাড়িতে এসেছেন।'

রূপচাঁদের কথায় একটু বিব্রত বোধ করলেও নয়নতারা স্বাভাবিক গলায় বললো, 'ভয় নেই তোমার। কিন্তু একটা কথা তুমিও মনে রেখো। খিড়কি দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কেউ যদি আমার পরিচয় জিগ্যেস করে, কি বলবে?'

রূপচাঁদ একটু ইতস্তত করলো, তারপর বললো, 'বলবো আমার মাসিমা। মা নেই, নতুবা মা-ই বলতাম।'

ধূসর একটা ছায়ার মতো রূপচাঁদের পেছন-পেছন নয়নতারা খিড়কি পার হ'য়ে, রান্নার মহল ঝি-দের মহল পার হ'য়ে অন্দরের চত্বরে এসে দাঁড়িয়ে রূপচাঁদকে বললো, 'এবার তুমি যাও।'

রূপচাঁদ চ'লে গেলে একবার ইতস্তত দেখে নিয়ে রানিমহলের পথের দিকে যেতে-যেতে একটা দেয়ালের আড়াল পেয়ে নয়নতারা রাজকুমারের ঘরগুলির দিকে চলতে আরম্ভ করলো। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে দুটি ভৃত্যের গলা শুনতে পেয়ে নয়নতারা একবার থমকে দাঁড়ালো, এ ছাড়া আর-কোনো অসুবিধা হয় নি রাজকুমারের ঘরে পৌঁছতে।

রাজকুমারের ঘরে দেয়ালগিরির আলো। লাল রং-করা কাঁচকড়ার দেয়ালগিরির ডোম, লাল আলোয় ঘরটা ভ'রে আছে। পালঙ্কে রাজকুমার ঘুমের মতো নিথর নিস্পন্দ হ'য়ে শুয়ে আছে।

নয়নতারা মৃদু গলায় ডাকলো, 'রাজকুমার, আমি এসেছি।'

'কে?' রাজু ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসলো। 'কে তুমি?'

নয়নতারা মোটা চাদরটার অবগুণ্ঠন না খুলে শুধুমাত্র মুখ দেখা যায় এমন ক'রে অবগুণ্ঠনটা টেনে দিয়ে বললো, 'আমি, তোমার নয়ন।'

রাজকুমার বিছানা ছেড়ে উঠে এল, নয়নতারার কাছে এসে তার চোখে চোখ রেখে বিস্মিত হ'য়ে গেল। এমন চোখ আর সে কখনো দেখে নি। রাজকুমার তারপর বোকার মতো প্রশ্ন করলো, 'এখন রাত্রি নয়?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে?'

'হ্যাঁ। তুমি তো আমাকে অভ্যর্থনা করলে না?'

রাজকুমার করবার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে নয়নতারার হাত ধরলো, হাত ধ'রে দু-জনে বিছানায় গিয়ে বসলো।

নয়নতারা বললো, 'রাজকুমার, তুমি একা বনে গিয়েছিলে শিকার করতে? কাজটা ভালো করো নি। ভেবেছিলাম তোমাকে খাণ্ডববিজয়ী পার্থ বলবো, কিন্তু খুব রাগ হ'লো। খুব কষ্ট দিলে আমাকে। শুধু বনে যাওয়া নয়, পাখি আর হরিণ মেরে বন জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো নাকি করেছো?'

'এ-সব কথা তোমাকে কে বললে?'

'তুমি ভাবো আমার বুঝি দূত নেই?'

'দূত?'

'রাজকুমার, রাজকন্যেরও দূত থাকে। আমি রাজকন্যে নই, তবু

আমারও দূত রাখতে হবে। কিন্তু এমন বেপরোয়া হ'য়ে তুমি বেড়াবে তা কি আমার ভালো লাগে ?'

'তোমার ভয় কি, নয়ন, পাখি বা হরিণ মানুষের কিছু করতে পারে না।'

'তা পারে না। তুমি কি মদ খাও নি ?'

'না তো। মদ খাবো কেন ? মন খারাপ ছিলো। তখন কি আর মদ খেতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হচ্ছিলো একটা-কিছু করি।'

'কেন এমন মন খারাপ হয় ? এত কি মন খারাপ হ'লো যে পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে হবে।'

'সে কিছু নয়, নয়ন।'

'কিছু নয় কি হ'তে পারে! আমার কাছে কি গোপন করতে আছে!'

'তুমি কি সত্যি আমার ?'

'তা না হ'লে এত রাত্রিতে আর-কারো ঘরে আমি যেতে পারি ?'

'তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞের চাইতেও বেশি। এ-ঋণ কোনোকালে শোধ হবে না।' রাজু ধীরে-ধীরে বললো।

রাজকুমার একটু চিন্তা করলো।

'একটা কৌতুকের ব্যাপার হয়েছে, নয়ন, তুমি নিজে বিদ্বান, তোমাকে তো কেউ বলবে না। বলবার কি-ই বা আছে তাদের।'

'হেসে বাঁচি না। তোমাকে কে কি বলেছে ?'

'কিছু বলে নি। কিন্তু ভাবছি লোকে ধীরে-ধীরে তাই ভাবতে শুরু করবে। স্কুলের কথা শুনেছো ?'

'শুনি নি তো।'

'গ্রামে স্কুল হচ্ছে। সেখানে ইংরিজি পড়ানো হবে। গ্রামের সকলকেই বিনা বেতনে শিখতে দেওয়া হবে। কিছুদিন বাদে গ্রামের ছোটো ছেলেরাও যা জানবে আমি তা জানবো না। মূর্খ রাজকুমার। সে-রকম একটা গল্প শুনেছো তো?'

'এরই জন্যে মন খারাপ?'

'মন খারাপ হওয়ার কথা নয়?' রাজু হাসি-হাসি মুখে বললো।

নয়ন বললো, 'রাজকুমার!'

'তুমি আমাকে প্রবোধ দিতে পারো, কিন্তু সত্যিটাকে মিথ্যে করতে পারবে না।'

নয়নতারা ঝিকমিক ক'রে হাসলো, বললো, 'রাজকুমার, আমি কি মিথ্যে?'

'তা নয়।'

'আমাকে ভালোবাসতে কি তোমার বিদ্যার দরকার হয়েছিলো?'

'তা কারো হয় না।'

'প্রজাদের ভালোবাসতে কি তোমার বিদ্যার দরকার হবে?'

'তা-ও হয় না।'

'তা হ'লেই আমার হবে। বাকি জীবনটা আমার তাতেই চলবে।'

রাজকুমার নয়নতারার চোখ দুটির দিকে চেয়ে-চেয়ে খানিকটা চিন্তা ক'রে নিলো।

'কী আশ্চর্য, নয়ন, তুমি আমার মনের কষ্ট দূর করার জন্যই এমন ক'রে এসেছো?'

সোজাসুজি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নয়নতারা বিপন্ন বোধ করলো। তার কথা হারিয়ে যেতে লাগলো।

রাজু বললো, 'নয়ন, আর তোমাকে আমি যেতে দেবো না।'

'সে কি কথা, লোকে বলবে কি ?'

'যা বলার তা এতক্ষণে তারা বলছে। তুমি ভেবেছো তারা জানে না তুমি আমার বন্ধু ?'

'তা হয়তো কেউ-কেউ জানে। আজ নয়, আর-একদিন এসে তখন থাকবো অনেকক্ষণ।'

'কিন্তু তুমি যাবে কি ক'রে ? এতটা পথ একা-একা! চলো আমি এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'তুমি-ই বা একা-একা কি ক'রে আসবে ?'

'আসবো কেন, আসার দরকার কি ? তুমি রান্না করবে, দু-জনে একসঙ্গে খাবো, তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করবো।'

'তা কেন করবো না। কাল দুপুরে আমার ঘরে তোমার নিমন্ত্রণ রইলো।'

একটা ছোটো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজকুমার বললো, 'কিন্তু এখনই তো যাচ্ছো না। আর-একটু বোসো।'

দু-জনে পাশাপাশি ব'সে একথা-সেকথায় আলাপ শুরু করলো। পিয়েত্রোর কথা হ'লো, বুজরুকের কথা হ'লো। বুজরুকের কথায় আবার লেখাপড়ার কথা উঠলো। নয়নতারা বুঝলো এ-বিষয়ে কোথায় একটা লুকানো বেদনা আছে রাজচন্দ্রর। সান্ত্বনা দিতে-দিতে এক-সময়ে সে বললো, 'রাজ্যটা চালাতে, লোকের উপকার করতে যে-দয়ার দরকার, অন্যায়কে চুরমার ক'রে দিতে যে-সাহস থাকা দরকার তা বিদ্যালয়ে না-প'ড়েই পাওয়া যায়।'

তারপর শিকারের কথা উঠলো। রাজু বললো সে বনকে ভয়ও যেমন করে, ভালোও তেমনি বাসে।

তখন নয়ন বললো যে, সে একদিন যাবে।

'কি ক'রে যাবে, তুমি তো ঘোড়ায় চড়বে না।'

'কে বললো চড়বো না!'

'সে কি! তুমি আমাকে আজ শুধু অবাক ক'রেই দেবে! কবে যাবে শিকারে তাই বলো।'

'এর পর আবার যেদিন কখনো তোমার মন খারাপ হবে।'

'তা হ'লে সেদিন দুটো ঘোড়া নিয়ে তোমার বাড়ি যাবো। বন্দুক যে একটা। মানে, ভালো বন্দুক। হাসছো মনে-মনে, না?'

'না, হাসবো কেন!'

'এইজন্য যে, মন খারাপ হ'লে কারো লটবহর সাজিয়ে শিকারে যাবার কথা মনে থাকে না। একদিন কিন্তু সত্যি তোমাকে নিয়ে বনে বেড়াতে যাবো। গাছের ছায়ায়-ছায়ায় কী ভালো যে লাগে, কি বলবো তোমাকে। তখন তোমার কথা মনে হয়, নয়ন। তুমি সঙ্গে থাকলে হাঁটতে-হাঁটতে বনের শেষপর্যন্ত যাওয়া যায়।'

'বেশ, তাই হবে একদিন।'

নয়নতারা উঠে দাঁড়ালো।

রাজু বললো, 'তুমি কি ক'রে যাবে এ ভেবে আমার লাভ নেই। তুমি নিজেই বুদ্ধি ক'রে ফিরে যাবে আমি জানি।'

নয়নতারা চ'লে গেল।

নিজের বাড়িতে ফিরে নয়নতারা চাদর খুলে ফেলে বিছানায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে একগ্লাস জল খেলো। কেমন-একটা চাপা গরম লাগছে।

কিন্তু তার অভিসারপর্ব তখনো শেষ হয় নি। অত রাত্রিতে রাঁধবার ইচ্ছা ছিলো না। দরজা দিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে সে শুতে যাবে এমন

সময়ে পাড়ার সব কয়েকটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠলো। নয়নতারার প্রতিবেশী পুরুষদের গলার সাড়া পাওয়া গেল। নয়নতারার ভয়-ভয় করলো কিন্তু তার মধ্যেও অন্য ধরনের এক আশঙ্কা হ'লো, রাজু নয়তো!

সে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলো পাঁচ-ছ'জন সশস্ত্র লোক তার আঙিনায় এগিয়ে আসছে। কিন্তু রূপচাঁদকে চিনতে পারা গেল।

রূপচাঁদও নয়নতারাকে দেখতে পেয়েছিলো। সে বললো, 'মা ঘরে ফিরেছেন?'

'হ্যাঁ। কি খবর?'

'আজ্ঞে আপনি ফিরেছেন কিনা জানতে এলাম।'

'এত লোক কেন?'

'আজ্ঞে তাই হুকুম। আমরা চললাম, মা।'

রূপচাঁদ চ'লে গেল হ্যাই-হ্যাই ক'রে কুকুর তাড়াতে-তাড়াতে।

প্রতিবেশিদের একটি জোয়ান ছেলে ডাকলো, 'দিদি ঘরে?'

'হ্যাঁ, বলা, ঘরেই আছি।' নয়নতারা আবার জানলার কাছে এল, 'ওরা রাজবাড়ির লোক। আমি ফিরেছি কিনা খোঁজ নিতে এসেছিলো।'

'রাজবাড়িতে কাজ ছিলো বুঝি?'

'একটু দরকার ছিলো।'

বলাই লাঠিটা কাঁধের উপরে ফেলে চ'লে গেল।

নয়নতারা শুতে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে ভাবলো, ভাগ্যে কুকুরগুলো রাজুকে দেখলে ভয় পায় না, নতুবা কবে কোন কৌতুকের ব্যাপার ঘ'টে যেতো ঠিক ছিলো না।

কিন্তু সে-রাত্রিতে ভালো ঘুম হ'লো না রাজুর। এক-একটা অদ্ভুত দিন আসে মানুষের রোজকার দিনগুলির সঙ্গে মিলেমিশে। আজ

তেমনি একটা দিন এসেছিলো রাজুর। সকালে গিয়ে দেখা হ'লো বুজরুকের সঙ্গে। দীর্ঘ দিনের পরে বুজরুকের সঙ্গে দেখা হওয়াই এমন একটা ঘটনা যা সে কোনো-একটি দিনকে বহুদিনের মধ্যে বিশিষ্ট ক'রে চিহ্নিত ক'রে দিতে পারে। তারপর সেই উষ্ণ ক্ষোভের জন্ম। এটা বুজরুকের সঙ্গে দেখা হওয়া বা অন্যান্য ঘটনাগুলির মতো সুস্পষ্ট নয়, প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু অনুভবের গভীরতায় অনন্যসাধারণ। বিদ্যালয়ে গ্রামের প্রজাসাধারণ শিক্ষিত হবে। কিন্তু শিক্ষিত হবার বয়স তার চ'লে গেছে। মর্মবেদনায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিলো মন। নয়নতারার অভাব বোধ কি ক'রে এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলো। যেন নয়নতারাও এ-জন্যই দূরে থাকছে। স্বপ্নে একটা গভীর খাদে ডুবে যাওয়ার মতো অনুভব হয়েছিলো তার। তারপর শিকার। শিকার নয়, সে-উদ্দেশ্য ছিলো না— নিজেকে ক্লান্ত করা, ভয়ংকর কিছু ঘটিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিলো। নৃশংস হওয়ার মতো মনের অদম্যতা ছিলো, নিজেকে রেহাই দেওয়ার ইচ্ছা ছিলো না। পাখি শিকার করতে গিয়ে কাঁটার খোঁচায় পা দিয়ে রক্ত পড়েছে, এক-হাঁটু কাদায় দাঁড়াতেও ঘৃণা করে নি। বরং বেদনা ও ঘৃণার অনুভূতিতে মনের অন্য-একটি অংশকে পীড়ন ক'রেই সুখ পাচ্ছিলো। চিতল হরিণটার মৃত্যুতেই চূড়ান্ততায় উঠলো ব্যাপারটা। আহত হরিণটার সাথে ছুটোছুটি ক'রে ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হয়েছিলো রাজু, হরিণটা যখন প'ড়ে গেল তখন সে-ও ব'সে পড়েছিলো একটা শুকনো গাছের গুঁড়িতে। দেহের সাথে-সাথে মন। হরিণটার চোখে জলের ধারা ছিলো। মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাণীমাত্রেরই চোখে জল আসে নাকি? কিন্তু ঈষৎ রৌদ্রতপ্ত সবুজ পৃথিবীতে যে-অভিজ্ঞতা সে পেয়েছে, সেটা শিকারের চাইতে বড়ো, তার মানসিক ক্ষোভের তুলনায় তা অনন্ত। তার পদশব্দের প্রতিধ্বনিও যখন

ডুবে গেল তখন বনের মর্মর শব্দের সঙ্গে পাখির ভাষা জেগে উঠলো; পাখি নয় শুধু— পতঙ্গের ভাষাও। দূরে কোথায় দুটি বনবিড়াল অনেকক্ষণ ধ'রে ঝগড়া করলো। কতকটা মিনি বিড়ালের মতো, কিন্তু তাদের স্বরে মিনি বিড়ালের আভাসটুকুই আছে। হরিণকে সাধারণত বোবা মনে করা হয় এ-অঞ্চলে, কিন্তু চিতলের ডাকও কানে এল তার। পাতাগুলো গাছের থেকে পড়ার সময়ে ঘুরে-ঘুরে পড়ছে, যেন এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে যাওয়ার একটা চেষ্টাও আছে তাদের গতিতে। বনের নেশা কথাটা জানা ছিলো না রাজুর, কিন্তু একটা বোবা আনন্দে সে বার-বার শিহরিত হ'য়ে উঠেছিলো।

আর তারপর এল, সবার শেষে উত্তুঙ্গ আনন্দের মতো নয়নতারা। কেউ কি কল্পনা করতে পারে সে এমন ক'রে আসতে পারে। শুধু দুটি মধুর কথা বলার জন্যই এসেছিলো। শাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা কঠিন আবরণের মধ্যে মুক্তার মতো নয়নতারা। অবগুণ্ঠন সরালে নয়নতারার মুখ ঘরের রাঙা আলোয় যে-রকম দেখিয়েছিলো তার তুলনা নেই। ভেবে দেখতে গিয়ে রাজুর মনে হ'লো, সব চাইতে মধুর এ-লুকোচুরি, এই গোপনতা। গোপনে এসেছিলো ব'লেই বোধ হয় এমন সৌরভ রেখে গেছে সে। সৌরভ ছাড়া অন্য কোনো কথায় অনুভবটা প্রকাশ করা যায় না।

'আমাকে ভালোবাসতে কি তোমার বিদ্যার দরকার হয়েছিলো?'

রাজু কথাটা এবং সেই সুরটা মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। এমন কথা রাজু আর কারো কাছে শোনে নি। পিয়েত্রোর যখন খেয়াল হয় তখন সে ভাষায় শ্যাম্পেনের ঝাঁজ আনতে পারে, বুজরুক আনতে পারে অসীম ঔদ্ধত্যে ভরা দুঃসাহস। কিন্তু এমন স্নিগ্ধ কথা!

রূপচাঁদ ঘরে ঢুকলো।

'হুজুর, মা ঘরে গেছেন।'

'কাল সকালে মনে করিস— তোর বকশিশ নিবি।'

রূপচাঁদ চ'লে গেলে রাজুর মনে হ'লো এতক্ষণে নয়নতারা বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু মোটা চাদরে তাকে যেমন অপূর্ব দেখিয়েছিলো এমন আর কোনোদিন তাকে দেখে নি সে।

॥ পনরো ॥

ঘাটে পাহারায় লোক ছিলো। পালা ক'রে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। ভোররাত্রিতে যে পাহারায় ছিলো তারই কপাল খুললো। সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বজরাটা তার চোখে পড়েছে। পালে হাওয়া পেয়েছে। সন্‌সন্‌ ক'রে এগিয়ে আসছে বজরা, পেছনে সূর্যের গোলক। চোখে অন্ধকার লাগে, তবু ঠাহর ক'রে দেখলো সে, এবং তারপর ছুটে খবর দিতে চললো দেওয়ানকে। অবশ্য তার আগে ঘাটের অন্যান্য পাহারাওয়ালাকে সে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো।

দেওয়ান শুনে বললো, 'ঠিক দেখেছিস ?'

'হুজুর, এত বড়ো বজরা এ-অঞ্চলে আর কার।'

'তুই বুঝি বকশিশ চাস ?'

পাহারাওয়ালা বরকন্দাজটি বোকা-বোকা মুখে চেয়ে রইলো, কিন্তু পায়ের কাছে হলুদ রঙের টাকার চাইতে ছোটো একটা কি ঠুং ক'রে মাটিতে পড়লো এসে। সে কুড়িয়ে নিয়ে ভাবলো— একেই কি মোহর বলে !

আয়োজন ঠিক করাই ছিলো। দেওয়ান খাস-ভৃত্যকে ডেকে বললো, 'পোশাক আন্।'

চুনট-করা ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, পায়ে কালো পাম্প-সু, দেওয়ান পালকিতে উঠলো। আগে-পেছনে দু-জন দু-জন চারজন বরকন্দাজ দৌড়তে লাগলো। নদীর ধারে ঘাটের উপরে ইতিমধ্যে শামিয়ানা টাঙানো হ'য়ে গেছে। সদর-নায়েব তার খাস-আমলাদের সঙ্গে নিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলেছে। বড়ো বজরা তীরে ভেড়ে না। জলের মধ্যে খুঁটি পুঁতে-পুঁতে তার উপরে পাটাতন ফেলে জেটি তৈরি হয়েছে। তিন হাত চওড়া সমতল কাঠের রাস্তা শামিয়ানার নিচে পর্যন্ত।

শামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে হরদয়াল, তার বাঁ-দিকে সদর-নায়েব অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালো। নৌকা ততক্ষণে জেটির গায়ে লেগেছে।

নৌকা থেকে প্রথমে কালো পোশাক পরা কালো চেহারার একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক নামলেন, মুখের পাইপ থেকে তামাকের ধোঁয়া উড়ছে। তারপর একরাশ শুভ্র ফেনার মতো শাদা মসলিনের লেস আর পাইপিং-এর মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় মেমসাহেব নামলো।

শামিয়ানার তলে হরদয়াল বললো, 'আমি নিশ্চয়ই মিস্টার বাগচীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।'

বাগচীসাহেব সাগ্রহে হরদয়ালের হাত চেপে ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'দেওয়ানসাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দিত।'

মিসেস বাগচীর সঙ্গে মিস্টার বাগচী অতঃপর সকলের পরিচয় ক'রে দিলো। আর-এক দফা আনন্দের উচ্ছ্বাস।

মিস্টার বাগচী স্ত্রীকে বললো, 'কেট, আমি তোমাকে বলেছিলাম এই গ্রামে আমাদের সুখে কাটবে। এমন অভ্যর্থনা যাঁরা সামান্য লোককেও করতে পারেন তাঁরা মহাত্মা।'

মিসেস বাগচী হরদয়ালকে বললো, 'আপনার বদান্যতায় আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ, দেওয়ানসাহেব। আপনি সত্যি মহৎ।'

মিসেস বাগচী বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করে। তার কথায় হিন্দী-উর্দু'র টান আছে। মিস্টার বাগচী পালকিতে উঠতে আপত্তি করলো। সে বললো, 'কতটুকু আর দূর হবে, হেঁটেই যাবো।'

'তা-ও কি হয়। পালকি প্রস্তুত।'

মিস্টার বাগচীর মুখে সংকোচের চিহ্ন প্রকাশ পেলো, সে হরদয়ালের দিকে অনুমতি চাইবার ভঙ্গিতে অগ্রসর হ'য়ে বললো, 'আমি হেঁটে গেলে

কি আপনার আপত্তি আছে, দেওয়ানসাহেব, আমি পালকিতে চড়তে অভ্যস্ত নই। কেট পালকিতে যাবে।'

ক্যাথারীন বললে, 'ডার্লিং, পালকি চড়তে আমারও ভয় করে।'

ক্যাথারীনের মুখে এমন একটা আতঙ্কের ছাপ পড়লো যে সমস্যার ভাবটা আর রইলো না। হরদয়াল হোহো ক'রে হেসে উঠলো।

সে বললো, 'আমরা সকলেই হেঁটে যাবো।'

ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে পরে গুরুত্ব অর্জন করেছিলো। অতঃপর শোভাযাত্রা ক'রে নতুন হেডমাস্টার ও দেওয়ান অগ্রসর হ'লো। প্রথম সারিতে দেওয়ান, মিস্টার বাগচী এবং তার বাহু-আশ্রিতা ক্যাথারীন, তার পেছনের সারিতে সদর-নায়েব এবং তার আমলার দল। সবার পেছনে বরকন্দাজরা ও খালি পালকিগুলো।

শোভাযাত্রাটি কিছুদূর অগ্রসর হ'তে না হ'তে পথের দু-ধারে ভিড় জ'মে গেল। বোধ হয় ক্যাথারীনই তাদের আকর্ষণ। দর্শকের দৃষ্টিতে সে-বেচারা ক্রমাগত লাল হ'য়ে উঠতে লাগলো। মিস্টার বাগচীর আনন্দের অবধি নেই। দেওয়ানের কাছে এটা-ওটার পরিচয় নিচ্ছে এবং আনন্দ প্রকাশ করছে।

দেওয়ান-ভবনে পৌছে কিছুটা শিষ্টাচারের পর সদর-নায়েব সদলে বিদায় নিলো। রইলো শুধু দেওয়ান ও বাগচী-দম্পতি। বাগচী-দম্পতি জলযোগে বসলো।

হরদয়াল বললো, 'মিস্টার বাগচী, একটা কথা আপনাকে ব'লে রাখি। আপনি শুধু স্কুলের হেডমাস্টার নন, প্রতিষ্ঠাতাও। আমি চাই স্কুলটি আপনার মনের মতো শিক্ষায়তন হ'য়ে গ'ড়ে উঠুক। আপাতত মাত্র দু-জন সহকারী আপনাকে আমি দিতে পারবো। বিদ্যায় তারা নগণ্য।

কিন্তু এক জন অর্থাভাবের জন্য, অপর জন বয়সের গুণে বোধ হয় আপনার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। অন্যান্য শিক্ষক তৈরি ক'রে নেওয়ার ভার আপনার নিজের। এমন নয় যে বেতন দিলেই উপযুক্ত শিক্ষক পাবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্তই আপনাকে খাটতে হবে। তবে প্রথম দিকে ছাত্রসংখ্যা খুব বেশি হবে না।'

বাগচী বললো, 'আমি কেটের জন্য একটি ঘরের চেষ্টা করছিলাম, আমার মনে হচ্ছে এই গ্রামে তা পাওয়া যাবে। শিক্ষকতা আমার বৃত্তি নয়, কিন্তু বৃত্তি হিসাবে সেটাকে আমি খুব উচ্চ স্থান দিই। আমার মনে হচ্ছে আপনার সাহায্য পেলে শিক্ষকতার কাজে নিজেকে উপকৃত করতে পারবো।'

হরদয়াল বললো, 'এখানে শহরের আমোদ-প্রমোদের কোনো বন্দোবস্ত নেই, শহরের মতো উচ্চশিক্ষিত প্রতিবেশী কদাচিৎ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া সব চাইতে বড়ো অসুবিধা, এখানে চার্চ নেই। আপনাদের উপাসনার অসুবিধা হবে।'

'এ-সব নিয়ে আপনি আদৌ কুণ্ঠিত হবেন না। প্রথমত আমরা এর আগে মধ্যপ্রদেশের এমন জায়গায় ছিলাম যেখানে পুস্তক জিনিসটার নামও কেউ শোনে নি, দ্বিতীয়ত আমোদ-প্রমোদে আমরা অভিজ্ঞ নই। চার্চের কথা যা বললেন, তার উত্তরে বলা যায় উপাসনার পক্ষে চার্চ অপরিহার্য নয়। আর তা ছাড়া আমাদের চার্চ স্বতন্ত্র।'

'মানে, আপনারা রোমান ক্যাথলিক নন?'

'প্রথম আলাপেই এতটা ব'লে বোধ হয় আপনার আতিথ্যের প্রতি অবিচার করছি, কিন্তু দেওয়ানজি, কথাটা যখন উঠেছে ব'লে রাখাই ভালো। ওটা আমাদের একটা অপরাধের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, আপনার আতিথ্যে আর বেশি জড়িয়ে পড়ার আগে স্বীকার করাই ভালো। আমরা

রোমান ক্যাথলিক নই, প্রোটেস্ট্যাণ্টও নই, আমরা ইউনিট্যারিয়ান। শুনেছি য়ুরোপে কোথাও-কোথাও আমাদের মতবাদের লোক চার্চ তৈরি করছে, ভারতে তা নেই।'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমরা রোমান ক্যাথলিকদের ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মতো বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমাদের মতবাদে যিশাস ক্রাইস্ট মহামানব কিন্তু দেবতা নন, দেবতার পুত্রও নন। আমরা মনে করি যিশাস যে-অর্থে ঈশ্বরের সন্তান ব'লে নিজেকে মনে করতেন তাঁর জীবনচরিতকাররা সে-অর্থ বুঝতে পারেন নি। আমরা মনে করি ঈশ্বর একমাত্র, এবং অদ্বিতীয়, এবং তিনিই মাত্র মানুষের উপাস্য।'

'আপনাদের ধর্ম তা হ'লে ইসলামধর্মের মতো কতকটা—'

'ইসলামধর্ম কেন বলছেন, সনাতন হিন্দুধর্মও বলতে পারেন।'

'সে কি!'

'আপনি রাজা রামমোহনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লেখা খান দু-তিন চিঠির প্রতিলিপি পাই কেটদের বাড়িতে। আমার শ্বশুর ফাদার অ্যাণ্ড্রুজ্ তখন জীবিত ছিলেন। তাঁকে কৌতূহলী হ'য়ে জিগ্যেস করায় রাজার লেখা খানকয়েক বই তিনি আমাকে পড়তে দেন। আমার এত ভালো লাগে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যে, তিনি জীবিত থাকলে বোধ হয় তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মশিক্ষা করার চেষ্টা করতাম। আমার শ্বশুরের সঙ্গে আলাপ হ'তো, দেখতাম, তিনিও রাজার মতকে সমর্থন করেন। আমার শ্বশুর এবং আমিই বোধ হয় মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইউনিট্যারিয়ান। আমার শ্বশুর তাঁর স্টাইপেণ্ড প্রত্যাখ্যান করেন এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছেড়ে দিয়ে মধ্যপ্রদেশের ভিলদের এক গ্রামে চ'লে যান।'

বাগচী পাইপ ধরালো।

হরদয়াল বললো, 'এখন আপনাদের স্নান ও বিশ্রামের সময়। পরে কিন্তু আপনার শ্বশুর ও এই ধর্মের কথা নিশ্চয়ই আমাকে বলতে হবে। আশা করছি আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হবে।'

বাগচী ধর্মভীরু খ্রীস্টানের মতো বললো, 'আমেন।'

হরদয়াল অতঃপর কেটকে বললো, 'মিসেস বাগচী, আপনার স্বামীর কাজে আপনার সহায়তা আমি আশা করছি। গ্রামের পুঁটে-পুঁটে ছোঁড়াদের মানুষ করার ভার আপনাদের।'

ক্যাথারীন বললো, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

বাগচী-দম্পতির জন্য দেওয়ান-ভবনের দু-খানা ঘর আপাতত নির্দিষ্ট হয়েছে। তাদের নিজেদের জন্য যে-বাড়ি উঠেছে সেটার কাঠের রং এখনো কাঁচা আছে। এখনো তেমন ভালো ক'রে ঝাড়পোঁছ হয় নি। যতক্ষণ না তারা নিজের বাড়িতে উঠে যায় ততদিন একই টেবিলে খাবে হরদয়ালের সঙ্গে।

হরদয়াল কাছারিতে গিয়ে বললো, 'আজ তোমাদের ছুটি। তোমরা বাড়ি যাও।' কাছারি থেকে ফিরতে-ফিরতে হরদয়াল বললো, 'ওরে, কে আছিস ?'

সব চাইতে কাছের বরকন্দাজটি ছুটে এল।

'পিয়েত্রোসাহেবকে একটু খবর দিবি, আচ্ছা একখানা চিঠি নিয়ে যা।'

ঘরে ফিরে হরদয়াল পিয়েত্রোকে চিঠি লিখে দিলো :

হেডমাস্টারমশাই সস্ত্রীক এসে পৌঁছেছেন। আগামী সোমবার, অর্থাৎ পরশু দিনটি খুব ভালো। সেদিন থেকেই স্কুল বসবে। সকালে স্কুলের উদ্বোধন করতে হবে আপনাকে।

কয়েক দিন নৌকার দুলুনিতে কষ্ট হয়েছে, দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বাগচী-দম্পতি একটু ঘুমিয়েছিলো।

দুপুরবেলা ছোটো একটা ঘুম দেওয়া অভ্যাস ছিলো হরদয়ালের। কিন্তু আজ সে ঘুমুতে পারে নি। শুয়ে-শুয়ে স্কুলের কথাই ভাবছিলো। মাঝে-মাঝে বাগচী-দম্পতিদের খবরও করছিলো। বহুদিনের একটা পরিকল্পনা আজ সার্থক হ'তে চলেছে। বাল্যকাল থেকে আজপর্যন্ত এই যে বেঁচে থাকা, সবগুলি দিন যেন আজকে এসেই মূল্যবান হ'য়ে উঠলো।

চমৎকার লোক এই বাগচীরা। যেমনটি কল্পনা করা গিয়েছিলো তার চাইতেও যেন ভালো। কথা বলার কী সরল ধরন। গ্রামের মধ্যে এদের উপস্থিতি সমগ্র গ্রামকেই আলোকিত ক'রে রাখবে।

ভৃত্য এসে খবর দিলো বাগচীসাহেবের ঘুম ভেঙেছে। পাইপে তামাক ভরছেন।

হরদয়াল চোখে-মুখে জল দিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে নিলো। হরদয়ালের গলার শব্দ পেয়ে বাগচী নিজেই উঠে এল।

'আসুন, শরীর খানিকটা ঝরঝরে হ'লো তো?'

'তা হয়েছে। আচ্ছা দেওয়ানজি, স্কুলের পাঠ্যবিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে নিশ্চয় আপনি স্থির ক'রে ফেলেছেন ইতিমধ্যে?'

'না। এমন-কিছু স্থির করি নি। আপনিই করবেন। হিন্দু স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের একটা তালিকা যোগাড় ক'রে রেখেছি। আপনি অনুমোদন করলে সে-সব বই আনিয়ে নিতে হবে।'

পুস্তক ও পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলাপ করতে-করতে ছাত্রদের বিষয়ে কথা উঠে পড়লো। হরদয়াল বললো, 'ছাত্রদের মধ্যে বেশির ভাগই হবে চলতি ভাষায় যাদের অন্ত্যজ বলে। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর কিছু-কিছু ছাত্রও পাবেন

না এমন নয়। যাতে ছাত্ররা আসে সে-জন্যই স্কুল অবৈতনিক রাখার ইচ্ছা আছে।'

বাগচী বললো, 'গ্রামটা কি খুব পুরনো?'

'তা দেড় শ' বছর হবে। আমি যেটুকু খবর সংগ্রহ করেছি তাতে মনে হয় নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামের অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে ক্রমশ উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রাম স'রে-স'রে এসেছে। এই রাজবাড়ির পত্তন হয়েছে প্রায় এক শ' বছর আগে। এঁদের পারিবারিক বাড়ি পশ্চিম দিকে মাইল তিন-চার দূরে।'

'গ্রামের লোকসংখ্যা কি রকম হবে?'

'নিজগ্রামে প্রায় চার হাজার। তারপর আশেপাশে আরও চাষীপল্লী আছে। এ ছাড়া এই গ্রামেরই লাগোয়া দুটি য়ুরোপীয় আবাদ আছে। একটি ফরাসী, অপরটি ইংরেজদের।'

'আপনার এই চার হাজারের উচ্চবর্ণের সংখ্যা বোধ করি চার-পাঁচ শ' হবে, না?'

'প্রায় সে-রকমই হবে।'

বাগচী লঘুস্বরে প্রশ্ন করলো, 'আপনার স্কুলে কুমোর-কামার-তাঁতিদের ছেলেরা পড়লে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ পড়তে আপত্তি করবে না তো?'

হরদয়াল বললো, 'যারা পড়বে না তাদের আর আমরা কি ভাবে উপকার করতে পারি?'

হরদয়ালের নিজের একটু কাজ ছিলো। কিছু চিঠি লেখা, কিছু হিসাবপত্র দেখা, কিছুটা একা-একা চিন্তার দরকার ছিলো তার। রোদ পড়তে বাগচীসাহেব সস্ত্রীক একজন বরকন্দাজ সঙ্গে ক'রে স্কুলবাড়ি দেখার নাম ক'রে বেরিয়েছিলো। কিছুক্ষণ চলার পরই বাগচীসাহেব

টের পেলো— তারা দু-জনেই গ্রামের লোকদের কাছে দর্শনীয় ব্যাপার।

বাগচীর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিলো, সে হাসতে-হাসতে মৃদুস্বরে বললো, 'এটা অখ্রীস্টানের কাজ হচ্ছে কেট। এদের এমন ক'রে প্রলুব্ধ করা কি উচিত হচ্ছে তোমার?'

কেট সলজ্জ কণ্ঠে কিছু ব'লে বাগচীর আর-একটু গা ঘেঁষে চলতে লাগলো।

বাগচী ইংরেজিতেই আবার বললো, 'কেট, এখানে কি তুমি সুখী হবে?'

'তুমি কি স্থির হ'তে পারবে?'

'পারবো কিনা বলতে পারি না, চেষ্টা করবো। মনে হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে মনিব মিশনারী সোসাইটির মতো টাকাটাকে শর্তকণ্টকিত ক'রে তুলবে না।'

'একটা কথা তোমাকে বলি, ডিয়ার, এখানে কিন্তু তোমার মতবাদ-গুলো অত প্রখর ক'রে প্রচার কোরো না।'

'না, না, তা করবো কেন। তখন ওরা সকলে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলো, তারই প্রত্যুত্তর দিয়েছিলাম বৈ তো নয়।'

'সেই কথাই তো তোমাকে আমি বলেছি। প্রকৃতপক্ষে তোমার রক্তে ব্রাহ্মণদের তর্কযুদ্ধের ধারা এখনো আছে।'

ওরা আলাপ করতে-করতে স্কুলবাড়ির ঘরের কাছে এসে পড়েছিলো। সঙ্গের বরকন্দাজটিকে বাগচী জিগ্যেস করলো, 'হেডমাস্টারের বাড়িটা কোথায় জানো?' বরকন্দাজ দেখিয়ে দিলো।

'চলো কেট, তোমার ঘরদোর দেখে আসি।'

'কিন্তু ওরা কি আমাদের অত্যন্ত লোভী ভাববে না?'

'বাহ্, আমার লোভ হয়েছে, তখন ওদের ভাবতে দোষ কি ? এসো।'

কেট ও বাগচী ঘুরে-ঘুরে ঘরদোরগুলি দেখলো।

'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো, কেট ?'

'কি ?'

'বাড়িটার গড়ন দেওয়ানের বাড়ির মতো নয়। না, না, তাঁর ঘরের দামী আসবাব বা ইট-পাথরের কাজের কথা বলছি না, হেডমাস্টারের বাড়ি আর দেওয়ানের বাড়ি এক হওয়া উচিত নয় ; বলছি ঘরগুলির বিন্যাসের কথা। তোমার মনে আছে রাইগড়ের বাংলোর কথা ?'

'কতকটা যেন সেই রকমই। নয় ?'

'ভারী মজার ব্যাপার তো, এ যেন তোমার মন জেনে তৈরি করেছে।'

'তা হবে কেন ?'

'তাই হয়েছে। জানো কেট, এমনি একটা বাড়িতে সারাজীবন কাটানো মন্দ নয়।'

'কেন বলো তো ?'

'এটা আমার কয়েক দিন থেকেই মনে হচ্ছে। নৌকো নদী-পথ বেয়ে যতই গ্রামের দিকে যেতে লাগলো আমার ততই মনে হচ্ছিলো— দেশের অন্তঃকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আমি তো গ্রামেরই ছেলে।'

'বেশ তো। আমি এতদিন শুনেই এলাম তোমার দর্শন। এবার সেটা কাজে লাগুক দেখি। শান্তি কত গভীর হ'তে পারে তাই অনুভব করা যাবে।'

ওরা রাজবাড়ির দিকে ফিরছিলো। তখন আলো প'ড়ে আসছে। সহসা ঘোড়ার খুরের প্রচণ্ড শব্দ কানে এল ওদের। কেট পেছন ফিরে সওয়ারদের দেখতে পেয়ে বললো, 'স'রে এসো।'

'কি ব্যাপার ?'

'স'রে এসো বাপু, ঘোড়া আসছে।'

'ঘোড়ার ভয়ে মানুষ পথ ছেড়ে জঙ্গলে যায় সে কোন্ দেশ?'

'আহ্।'

কেট বাগচীকে টেনে নিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়ালো, আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ধুলোর ঝড় সৃষ্টি ক'রে পাশাপাশি দুটি ঘোড়া রাজবাড়ির সদরের দিকে উড়ে গেল।

'বেশ ঘোড়া তো।' বাগচী বললো।

'তা না-হয় দেখলাম, কিন্তু এই নাকি তোমার শাস্তি?'

'কেন, কি হয়েছে, কি অন্যায় করেছি?'

'ঘাটে নামতে-নামতেই পালকিতে ওঠার ব্যাপারে একবার, এখন ঘোড়ার পথে দাঁড়ানোতে আর-একবার দেখা দিলো।'

বাগচী হোহো ক'রে হেসে উঠলো, 'ত্যাখো, পালকিতে উঠি না কেন জানো, সে এক মজার গল্প। শুনলে পালকি চড়বে না। রাজা নহুস ছিলো মস্ত বড়ো রাজা। তার ভারী শখ হ'লো পালকি চ'ড়ে স্বর্গে যাবে। কিন্তু কি হ'লো জানো? কিছুদূর গিয়ে সে সাপ হ'য়ে মাটির দিকে পড়তে লাগলো। সেই চিরকালের সাপের ব্যাপার। সাপকে আমি বড়ো ভয় করি।'

কেট শিউরে উঠলো, 'তুমি কি সেই সাপের কথা বলছো?'

'তা নয়তো কি? সে ছাড়া আর কার শখ হ'তে পারে মানুষের কাঁধে চেপে স্বর্গে যায়।'

'তা বটে। তুমি কি গল্পটা বানালে?'

'আরে, কি বিপদ! এটা হিন্দু মিথোলজিতে আছে, তুমি যাচাই ক'রে দেখো।'

'তুমি তা হ'লে সাপের ভয়ে পালকি চাপো না? কিন্তু এ-কথা যেন বোলো না কাউকে। এ-দেশে যারা পালকি চড়ে সবাই বড়োলোক।'

'বড়োলোক সম্বন্ধে ক্রাইস্টের মত ভালো ছিলো না।'

আর কিছুদূর গিয়ে বাগচী বললো, 'সাপকে কখনো-কখনো আমি ভালোও বাসি।'

'কি রকম?'

'যখন সাপরা তোমাদের বিপথে চালনা করে। তোমরা কল্টি-আস্টা তোলো।'

'সবটাই তোমার রসিকতা, তাই নয়?'

বাগচী প্রাণ খুলে হেসে উঠলো।

হরদয়াল তার ঘরে ব'সে বই পড়ছিলো। 'আসতে পারি?'—ব'লে বাগচী ঢুকলো সেই ঘরে।

'বেড়ানো হ'লো?'

'হ্যাঁ। আমার থাকবার জায়গাও দেখে এলাম।'

'কি রকম লাগলো? অসুবিধা হবে একটু-একটু, পরে পাল্টে নেওয়া যাবে ধীরে-ধীরে।'

'পাল্টাতেই বরং আমার আপত্তি। কেউ বলছিলো এমন নকশা কোথায় পাওয়া গেল ঘরের?'

'মিসেস বাগচীর পছন্দ হয়েছে?'

'খুব। নিজেই আপনাকে ধন্যবাদ দেবে।'

'ওতে আমাদের কৃতিত্ব কিছু নেই। আমাদের প্রতিবেশী মরেলগঞ্জের সাহেবদের কুঠির নকশায় করা। কেবল তাদের ঘরগুলো আরও উঁচু ও বড়ো। নকশা ও মাল-মসলা এক।'

খানিকটা সময় চুপ ক'রে রইলো বাগচী। অন্য কথায় গিয়ে বললো: 'আপনার কাছে একটা অনুমতি নেওয়া হয় নি।'

'কি ব্যাপারে ?'

'আমার ছাত্রদের মধ্যে জরজারি এবং অন্যান্য পীড়া কি রকম ?'

'মাঝে-মাঝে প্রাদুর্ভাব হয়। বিশেষ ক'রে দুর্গাপূজার পর থেকে অনেক জরে ভোগে।'

'আমি যদি তাদের চিকিৎসা করি আপনার আপত্তি আছে ?'

'আপত্তি কি, সে তো আনন্দের কথা। রোগমুক্তি কে না চায় !'

সেদিন রাত্রিতে কেট বললো, 'ডিয়ারি, আমাদের এই দেওয়ানজিকে কি তোমার উচ্চশিক্ষিত ব'লে মনে হয় নি ?'

'উচ্চশিক্ষিত না হ'লে শিক্ষার জন্য এত অজস্র ব্যয় কেউ করে ?'

'কিন্তু কলেজের কথায় বললেন, কোনো কলেজে পড়ার সৌভাগ্য ওর হয় নি।'

তখন বাগচী কেটকে একলব্যের কথা বললো। এই কাহিনীটায় যা আছে তার মূলতত্ত্ব দেওয়ানজির জীবনেও হয়তো আছে।

'তোমার মিথোলজিগুলি এত সুন্দর !'

'এটা মিথোলজি নয়, কেট, মহাভারত ব'লে যে-মহাকাব্য আমার শ্বশুর অনুবাদ করছিলেন তারই একটা গল্প। তবে আমাদের ভালোবাসার চোখে দেখা সবটুকু দেখা নয়, কেট। যেমন তুমি আমার কালো রং দেখতে পাও না।'

'ঠিক বলা হ'লো কি মাস্টারমশাই ? কালো রং-ই যে আমার নেশা।'

স্কুলের উদ্বোধনের ব্যাপারে ভিড় হবার যতগুলি কারণ ছিলো তার মধ্যে একটি হ'লো মেমসাহেবের প্রতি কৌতূহল। এ-কথা অস্বীকার

ক'রে লাভ নেই। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ঘরেই একবার আলোচনা হয়েছে। গ্রামে মেমসাহেব এসেছে। শিলাবৃষ্টির শিলার মতো তার রং, আলতা টুকটুকে ঠোঁট, সোনার মতো চুল, কে? কে আবার, নতুন হেড-মাস্টারের স্ত্রী। বাঙালীর মেমসাহেব স্ত্রী। এদের মধ্যে যারা একটু কল্পনা-প্রবণ তারা বললে, হেডমাস্টার বিলেত থেকে বিয়ে ক'রে এনেছে, ওদের দেশের এক জমিদারের মেয়ে। তা হ'লে সে-হেডমাস্টারও দর্শনীয়। গোবর্ধন দত্ত-র দলের এক ছোকরা সুর ক'রে বললো, 'বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে।'

উদ্বোধনের ঘটনাটিতে খুব দীর্ঘ সময় লাগলো না। সকাল থেকেই নহবত বাজছিলো। হেডমাস্টার পালকি চড়ে না, কাজেই সস্ত্রীক হেঁটে গেল। দেওয়ানজি তার পালকিতে ক'রে আগেই পৌঁছেচে। পিয়েত্রো হাওরমুখো পালকির পাশে-পাশে বুজরুক এল হাতিতে, তার সেই বেঁটেখাটো হাতি নিজেই চালিয়ে এসেছে। রাজকুমার এল ঘোড়ায়, ঘোড়ার গায়ে কিংখাবের জামা। ডান্‌কানও ঘোড়ায় এল। ঝকঝকে চামড়ার সাজ সে-ঘোড়ার।

স্কুলবাড়ির আটচালার নিচে টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাল বনাতে জায়গাটার তিন দিক ঘেরা। বিশিষ্টদের আসন সেটা। টেবিল-চেয়ারগুলোর ডান-দিকে কতকগুলি বেঞ্চে গ্রামের কৈলাস পণ্ডিত কয়েক জন পড়ুয়া নিয়ে ব'সে আছেন। ক্ষারে-কাচা-ধুতি প'রে এসেছে ছেলেগুলি, মন্দ দেখাচ্ছে না তাদের। চেয়ারগুলোর বাঁ-দিকে নিমন্ত্রিত ইতর-ভদ্রর আসন।

পিয়েত্রো সভাপতির আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'বিদ্যালয় আজ থেকে উদ্বোধন করা হ'লো ব'লে আমি ঘোষণা করছি।' বক্তৃতা আর এগুলো না। কৈলাস পণ্ডিতের একটি শিশুছাত্র নাকের উপরে

অঙুল রেখে পিয়েত্রোর দিকে চেয়ে ছিলো। পিয়েত্রো নাকের উপরে ত্র মতো আঙুল রেখে বললো, 'তোমাদের জন্য দেওয়ানজি অনেক মিষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। আমি দেখেছি, খইচুরের মোয়া। শুধু খৈ নয়, তার মধ্যে শুনলাম ছানা এবং ক্ষীরও আছে।'

সকলের উচ্চহাস্যের মধ্যে পিয়েত্রো আসন গ্রহণ করার আগে বললো, 'আমাদের প্রিয় বন্ধু সম্মানার্হ মিস্টার ডান্‌কান হোয়াইট আপনাদের কিছু বলবেন এর পর।'

বক্তা হিসাবে ডান্‌কান হোয়াইট কোনো ইতিহাসেই বিখ্যাত নয়। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বুট-জুতোর উপরে রুপো বাঁধানো ঘোড়ার চাবুকের বাঁটটা ঠুকতে-ঠুকতে যা বললো তার সারমর্ম এই রকম : ইংরাজ তার বাহু ও বুদ্ধিবলে অর্ধ পৃথিবীর ঈশ্বর। তার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। এ দেশে যে-নৈরাজ্য ছিলো তার থেকে ইংরাজশাসন এ-দেশের লোকদের রক্ষা করছে। বর্তমানে ভারতে এমন কোনো শক্তিই নেই যা ইংরাজের প্রতাপের সম্মুখে একমুহূর্তও দাঁড়াতে পারে। এ-দেশের লোকদের যে ইংরাজরা রক্ষা করছে শুধু, এমন নয়। তারা এ-দেশের লোককে ভালোও বাসে। তারা চায় এরা শিক্ষিত হ'য়ে উঠুক। নতুবা আফ্রিকার লোকদের মতো এদেরও জাহাজে ক'রে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে বিক্রি করতে পারতো। তা করে নি ইংরাজরা। ইংরাজ এবং ঈশ্বরের সহায়তায় এদের মঙ্গল হোক।

সভাপতি পিয়েত্রো অতঃপর দেওয়ানজিকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করলো। হরদয়ালের মনে হ'লো সে মাটিতে মিশে যাবে। কী আশ্চর্য ব্যাপার। যে-মাটির উপরে জীবনের এতগুলো বৎসর কেটে গেল সেটা কেন পায়ের তলায় ট'লে-ট'লে ওঠে। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলটা চেপে ধ'রে কথা বলতে গিয়ে তার কথা জড়িয়ে যেতে

লাগলো। অনেক কষ্টে সে বললো, 'আমি নিজে কেউ নই। আমি একজনের কর্মচারীমাত্র। এখানে রাজকুমার আছেন আমাদের মধ্যে, সমুচিত হ'তো যদি তিনি বলতেন। সকলের পেছনে রয়েছেন আমাদের রানী, যাঁর দয়ায় আমি এই গ্রামে আশ্রয় পেয়েছি। পিয়েত্রোসাহেব এই জমি দিয়েছেন। এই স্কুলের নাম তাঁর মত অনুসারে হয়েছে 'জ্ঞানদা-বিদ্যালয়'। তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ। আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী ডান্‌কানসাহেবের সহৃদয়তার আশ্বাসও আমরা পাচ্ছি। কৈলাস পণ্ডিতমহাশয়কেও ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তিনি নিজে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন।'

বলতে-বলতে দেওয়ানের গলা ধ'রে এল, চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। সে আসন গ্রহণ করলো। সদর-নায়েবের দল প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো। বহু কণ্ঠে একত্রিত জয়ধ্বনি উঠলো: রানিমার জয় হোক, রাজকুমারের জয় হোক, দেওয়ানজির জয় হোক।

কিন্তু সেদিনকার সভায় বাগচীও কথা বললো। সে বক্তৃতায় অভ্যস্ত এবং সুবক্তা। কেটের কথা মেনে নিলে সে তার্কিক। বাগচী উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যার প্রয়োজন নিয়ে অত্যন্ত সহজ ভাষায় তার নিজের মতগুলি ব্যক্ত করলো। ইংরাজি শিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষার পারস্পরিক সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করলো। অবশেষে বললো, 'বিদ্যার জাতি ও ধর্ম নেই। বিদ্যুৎতরঙ্গ যেমন সকলের চোখেই প্রতিভাত হয়, শূদ্র ভদ্র বিচার করে না, বিদ্যার আলো তেমনি। এ-কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে বিদ্যা কারও ক্ষতি করতে পারে। বিদ্যা বিভক্ত করে না, বিদ্যা দ্বেষ করে না, বিদ্যা অসূয়াপরায়ণ নয়। ঈশ্বর সহায়তা করলে আমরা বিশ্ববিদ্যা আহরণের ভিত্তিস্থাপন করতে পারবো— যে-বিদ্যা ইংরাজদের আছে, যে-বিদ্যা ফরাসীপ্রমুখ অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির

আছে, আর যে-বিদ্যা আমাদের ঘরে সংস্কৃত কাব্য-দর্শনে ছড়িয়ে আছে।'

গোবর্ধন দত্ত-র দল তুমুল করতালি দিয়ে উঠলো।

সভাভঙ্গ হ'লো। কৈলাস পণ্ডিতকে আজ আর তার ছাত্ররা ভয় করছে না। খইচুরের ঝুড়িগুলোর উপরে তারা হৈহৈ ক'রে এল।

সদর-নায়েবের তত্ত্বাবধানে কাছারির বারান্দায় আসন পেতে গ্রামের ভদ্রব্যক্তিরা জলযোগে বসলো।

দেওয়ান-ভবনের বড়ো হল্-ঘরটায় পিয়েত্রো ও ডান্‌কানপ্রমুখেরা। ওরা সকলে ঠিক খেয়াল করতে পারে নি, রাজকুমার বুজরুকের খোঁজ করতে গিয়ে দেখলো, হাতি এবং তার সওয়ার নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে ক্রমশ দূরে চ'লে যাচ্ছে।

॥ ষোলো ॥

রবিবার ধর্মের দিন। ছ'দিন কাজ ক'রে একদিন বিশ্রাম করবে এবং বিশ্রামের সঙ্গে-সঙ্গে ঈশ্বরের নাম করবে। প্রথাটা প্রথা হিসাবে গ্রহণ না ক'রে পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা অংশ ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। নারদমুনি তেলের বাটি নিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে গিয়ে ধর্মের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। নারদমুনির সেই বিভ্রাটে যাদের সহানুভূতি ছিলো তাদেরই একজন রবিবারে ধর্মের প্রথার কারণ। আর যারা নারদমুনির দুর্দশায় অপার আনন্দ লাভ করেছিলো তারাই এখন হিন্দু হ'য়ে, সময় নেই অসময় নেই, সুযোগ পেলেই ভগবানের নাম করে।

পথে চলতে-চলতে বাগচী এই কথাগুলিই ভাবছিলো। তার চিন্তার উদ্দেশ্য নিজেকে বোঝানো নয়, বাড়ি ফিরে কেটকে তাক লাগিয়ে দিয়ে হাসাহাসি করা।

ডান্‌কান হোয়াইট খবর পাঠিয়েছে— বাগচী-দম্পতি ইচ্ছা করলেই মরেলগঞ্জের ছোটো চার্চটায় ডান্‌কান-পরিবারের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতে পারে। বাগচী অবশ্য পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতে যাচ্ছে না। কারণ কোনো চার্চেই সে উপাসনা করে না। শীতের সকাল ব'লে সময়টা তত অনুভব করা যাচ্ছে না, কিন্তু বাগচীর ট্যাকঘড়িতে তখন বেশ বেলা হয়েছে। এতক্ষণে পারিবারিক উপাসনা শেষ হ'য়ে যাবারই কথা।

শনিবার দিন একটা ঘটনা ঘ'টে গেছে। ঘটনাটা সামান্যই, কিন্তু বাগচীর মনে হয়েছে তার জন্য একবার ডান্‌কানের কাছে যাওয়া দরকার। মরেলগঞ্জ থেকে তিনটি ছেলে বাগচীর স্কুলে পড়তে আসতো। শনিবার দিন সংখ্যাটা বেড়ে পাঁচ-এ দাঁড়ালো। বাড়তি ছেলে দুটি

স্কুলের আটচালার বাইরে ব'সে ছেলেদের পড়া দেখছিলো। প্রথমে তারা গোবর্ধন দত্ত-র চোখে পড়লো, তারপর বাগচীর।

বাগচী ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'তোরা কি করছিস রে ?'

ছেলে দুটির মুখ ভয়ে কালো হ'য়ে গেল।

বাগচী বললো, 'পড়া শুনবি, আয়।'

ছেলে দুটিকে নিচু-ক্লাসের একটিতে বসিয়ে দিয়েছিলো বাগচী। ঠিক এমন সময়ে মরেলগঞ্জের দু-জন পেয়াদা এসে উপস্থিত। তাদের হাঁক-ডাকে আবার বাগচী বেরিয়ে এল।

'কি হয়েছে ?'

'ওই ছোকরা দুটোকে চাই।'

'কেন, ওরা কি করলো ?'

'ওদের চীনাকল চালানোর কথা।'

'চীনাকল ? সেটা কি ?'

'হৌসে জল তোলার কল।'

'তাই ওরা চালাতে পারে ? বেশ তো ! আচ্ছা, আজ ওরা এত দূর চ'লে এসেছে, থাক না-হয়। অন্য কোনো লোক নিয়ে কাজ চালিয়ে নিলে হ'তো।'

'তা হ'লে কুঠি নিলেম হ'য়ে যাবে।'

'ওরে, তোরা তা হ'লে যা। চীনাকলের কাজ শেষ হ'লে আসিস।'

পেয়াদারা যে কি বস্তু তা বাগচীর জানা ছিলো না।

ছেলে দুটি বেরিয়ে আটচালার বাইরে দাঁড়াতেই একজন পেয়াদা হাতের কাছে যেটিকে পেলো তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলো। অত্যন্ত বেদনায় সে হাঁ করলো কিন্তু কাঁদতে পারলো না। অন্য ছেলেটি চতুর, সে দৌড়তে আরম্ভ করেছিলো। একটি পেয়াদা একটা ঢিল

তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো তার দিকে। ঢিলটির লক্ষ্য অব্যর্থ, কিন্তু সৌভাগ্য এই, মাথায় লাগলো না। পায়ে লাগায় সে অব্যক্ত যন্ত্রণায় পা ধ'রে একই জায়গায় লাফাতে লাগলো। বাগচী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে আবার ক্লাসে ঢুকলো।

স্কুলের পর ক্যাথারীনের কাছে ঘটনাটা উল্লেখ ক'রে বলেছিলো বাগচী— 'কাল একবার ডান্‌কানের কাছে যাবো।'

'না, না, ডালিং ; এ কি শান্তির পথ ?'

'শান্তির জন্যই তো যাবো। কাল রবিবারের উপাসনার নিমন্ত্রণ আছে। সেই সুযোগে শান্তিস্থাপন করা যায় কিনা চেষ্টা করবো।'

'দোহাই তোমার, বিপদের সূচনা কোরো না। এই তো সেদিন মাত্র এসেছি।'

বাগচী হেসে বলেছিলো— 'পাগল ! আমি কি অত বোকা।'

ছাতিমাথায় বাগচী গুটিগুটি ডান্‌কানের কুঠিতে প্রবেশ করলো। একজন ভদ্র-চেহারার লোককে দেখতে পেয়ে বাগচী বললো, 'বড়ো-হুজুর কোথায় গো ? একটু বলবে বাগচীমাস্টার দেখা করতে চায়।'

'আজ্ঞে, যান না, উদিকে যান। নীলের হাউসের কাছে আছেন সাহেব।'

লোকটি বোধ হয় বাগচীর বিনয়ে বিস্মিত হ'লো। যার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হ'য়ে ইংরেজ-ললনা তার গলায় মালা দেয় সে-লোকটির এমন বিনয় যেন অস্বাভাবিক।

নীলের হাউসগুলির কাছে ডান্‌কানের দেখা পাওয়া গেল।

পাশাপাশি আটটা চৌবাচ্চা, চৌবাচ্চা না ব'লে ট্যাঙ্কই বলা উচিত। মানুষের বুক-সমান উঁচু দেয়ালের মধ্যে বিশ-ত্রিশ হাত লম্বা ও

প্রায় তদনুরূপ চওড়া চৌবাচ্চা। সেই চৌবাচ্চাগুলিতে নীলের কাজ হচ্ছে।

ডান্‌কানের কাছে গিয়ে বাগচী বললো, 'আমি বাগচীমাস্টার, হুজুর, দেখা করতে এলাম।'

'আসুন।'

কথোপকথন ইংরেজিতে হ'তে লাগলো।

বাগচী বললো, 'আপনাদের কাজগুলো দেখতে খুব কৌতূহল আছে আমার। গাছ থেকে কি ক'রে নীল হয় ভাবতেও অবাক লাগে।'

'যান না, দেখে আসুন।'

একজন সরকারকে ডেকে ডান্‌কান বললে, 'বাগচীকে হাউসগুলো ঘুরিয়ে আনো।'

সরকারের পেছন-পেছন বাগচী সব চাইতে দূরের চৌবাচ্চাটার কাছে গেল।

'এটা জলের চৌবাচ্চা। এটার মেঝে অত্যন্ত উঁচু। নদীর জল তুলে রাখা হয় এখানে। আজ জল তোলা হচ্ছে না। ঢেঁকি-কলে জল উঠিয়ে এটাকে ভ'রে রাখা হয়। প্রয়োজন মতো নল দিয়ে এটা থেকে জল অন্য চৌবাচ্চায় চালান করা হয়। এই দেখুন, এটায় নীলের গাছ জাগ দেওয়া আছে। এটাতেও নীলের গাছ পচছে। এইখানে দেখুন কেমন কাজ হচ্ছে।'

বাগচী দেখলো হাউসটার চারদিকে অন্তত পঞ্চাশ জন লোক বসেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে বৈঠা। তারা হাউসের জলে বৈঠা মারছে। যেন হাউসটাই একটা বিরাট নৌকো, কোনো অদৃশ্য সমুদ্রে তীরবেগে অগ্রসর হচ্ছে। একটা দুর্গন্ধে চারিদিক আচ্ছন্ন।

'কাছে যাবেন না।'

নিষেধ না শুনে বাগচী কাছে এগিয়ে গেল। হাউসটার ভেতরে ফেনিল দুর্গন্ধ জল বৈঠার তাড়নায় উত্তাল হ'য়ে ঘুরছে। লোকগুলোর কণ্ঠ অবধি তো বটেই, মুখে-চোখেও সেই ফেনিল দুর্গন্ধ জলের বুদ্বুদ। কয়েক পা গিয়ে বাগচী থামলো। সেই ছেলে দুটিই বটে। একেই তা হ'লে চীনাকল বলে। কাঠের ঘোড়ার মতো আসনে ব'সে তারা অবিরত পা ছুঁড়ছে একটা চৌবাচ্চার ধারে। বাগচী জিগ্যেস করলে, 'এটায় কি হয় ?'

'জলের স্রোত চালানো হচ্ছে নীলের উপর দিয়ে। নীল থিতিয়ে যাবার আগে এই চৌবাচ্চায় নীল ধোয়া হয়।'

বাগচী লক্ষ্য ক'রে দেখলো, একটি ছেলের পিঠে তখনো কালশিরের দাগ। তারপর সরকারকে বললো, 'চলুন, সাহেবের কাছে যাই।'

ডান্‌কানের কাছে আসতে ডান্‌কান বললো, 'কেমন দেখলে মিস্টার বাগচী ?'

'ভালো, খুবই ভালো বন্দোবস্ত।'

একটু পরে বাগচী বললো, 'হুজুর, কাল আপনার হাউসের দুটি ছোকরা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছিলো।'

'কি করেছিলো ?'

'হুজুর, তারা আমার স্কুলে পড়তে গিয়েছিলো।'

'তাই নাকি ? তা হ'লে তো ভালো নয়। কোন ছোকরারা ?'

'আজ্ঞে ওই চীনাকল চালাচ্ছে, ওরা।'

'তারপর কি হ'লো ?'

'পেয়াদারা ওদের মেরেছে। একটির পায়ের পেছন দিকটায় একটা কাটা দাগ দেখলাম, আর-একটির পিঠে এখনো কালশিরে প'ড়ে আছে।'

'ছাখো বাগচী, মারধোরটা অনেক সময়ে বাধ্য হ'য়েই করতে হয়।'

'তা হয়, হয় বৈকি। আমি সে-জন্যই ক্ষমা চাইতে এসেছি আপনার কাছে।'

'তুমি ক্ষমা চাইবে কেন? তুমি কি অন্যায় করেছো?'

'যারা মেরেছে এবং যারা মার খেয়েছে, সকলের জন্যই ক্ষমা চাচ্ছি হুজুর। আমার নিজের জন্যও।'

'কী বিপদ! দোষ যদি কিছু ক'রেও থাকে, ক্ষমা তারা চাইতে পারে। তুমি কি জন্য ক্ষমা চাইবে এ আমি বুঝতে পারছি না।'

ডান্‌কানের মেজাজ ভালো ছিলো, সে চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'চুরুট খাবে?'

'অনুমতি করেন তো আমি পাইপ খাই।'

'স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে।'

বাগচী পাইপে তামাক ভরতে লাগলো।

ডান্‌কান বাগচীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। লোকটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারতীয়দের মতো রং কিন্তু সুশ্রী চেহারা। কালো টেইল্‌-কোট, টাই ও টপ্‌-হ্যাটে নিখুঁত ও পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত।

তামাক টানতে-টানতে বাগচী বললো, 'সম্পূর্ণ ব্যাপারটাতে যে গভীর অপরাধপ্রবণতা ছিলো, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার জন্য আমাকে ক্ষমা করেছেন।'

ডান্‌কান হাসিমুখে বললো, 'তোমার মুখে ইংরেজি ভাষা এত নিখুঁত যে ক্ষমা কথাটার অর্থ তুমি জানো না বলতে দ্বিধা হয়। কিন্তু তোমার প্রস্তাব শুনে মনে হচ্ছে, তুমি ও-কথাটিকে অন্য কোনো কথার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছো।'

'আজ্ঞে না, সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্য আমিই দায়ী। প্রথমত এই

স্কুলে আমি শিক্ষকতা না করলে ছেলেরা যেতো না, দ্বিতীয়ত আমি তাদের ডেকে নিজে ভেতরে না বসালে তারা বসতো না, তৃতীয়ত আমি তাদের পেয়াদাদের হাতে মার খেতে দেখেও থামাতে পারি নি, এবং শেষ কথা, ওদের দুঃখ দূর করবার কোনো চেষ্টাই আমি করি নি।'

'আমার মাথা ঘুরছে, বাগচী। থামো, থামো। তুমি কি চাও সংক্ষেপে বলো।'

'ওই তো বললাম, আমাকে ক্ষমা করুন। নতুবা আপনার প্রতি যে বিদ্বেষ হয়েছে আমার তা' যাবে না।'

ডান্‌কান কৌতুকের স্বরে বললো, 'আচ্ছা ক্ষমা করলাম। কিন্তু তোমার বিদ্বেষ আমার কি ক্ষতি করতে পারে?' ডান্‌কান হোহো ক'রে হাসলো।

বাগচী বললো, 'করবেনই তো। এত বড়ো কারবার ভগবান আপনার হাতে দিয়েছেন, এত লোকের সঙ্গে আপনার দৈনন্দিন সংস্রব। এমন ক্ষমা-গুণ যদি আপনার না-ই থাকবে, ঈশ্বর আপনাকে এত শক্তি দেবেন কেন!'

ডান্‌কান বললো, 'তোমরা খ্রীস্টান নিশ্চয়ই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্রাইস্টের ধর্মই আমাদের ধর্ম।'

'তোমাদের ওদিকে তো চার্চ নেই।'

'আপনার নিমন্ত্রণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমরা চার্চে যাবার কোনো যোগ্যতা এখনো অর্জন করি নি ব'লে কোথাও যাই না।'

'তোমার কি পিপাসা পেয়েছে, বাগচী? বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

'আজ্ঞে, সুরা আমার সহ্য হয় না। যদি কিছু মনে না করেন, সেই ছোকরা দুটি আর পেয়াদা দুটিকে আমার কাছে আসতে দেবেন?'

ডান্‌কান একটু চিন্তা ক'রে বললো, 'তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাও ?'

'আপনি ক্ষমা করেছেন, সেই কথাটা বলবো।'

'আচ্ছা যাও, ওদের সঙ্গে কথা ব'লো গে। কিন্তু বেশি কথা বোলো না, লাই পেয়ে যাবে।'

'কথাটা আপনার সামনে হ'লেই ভালো হ'তো।'

ডান্‌কান বললো, 'আমার সামনে আমার অধস্তনদের বাজে কথা বলা উচিত মনে করি না।'

'তা বটে। কথাটাও ঠিক। আমিই যাচ্ছি।'

চীনাকলের কাছে গিয়ে বাগচী ছেলে দুটির মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো। তারপর বললো, 'কাজ থামা, একটু কথা বলি।'

ছেলে দুটি বিস্মিত হ'য়ে কাজ থামালো। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বললো, 'কাজ না করলে বিপদ আছে, মাস্টারসাহেব।'

'মারবে ? তা মারবে বৈকি। কাজ না করলে আমিও ব'কে দিই ছেলেদের। তোরা আমার স্কুলে পড়তে গিয়েছিলি ?'

'দেখতে গিছলাম।'

'খইচুরের মোয়ার লোভে ?'

ছেলে দুটি হাসলো।

'তা বেশ করেছিলি। পালিয়ে গেলি কেন ? ব'লে গেলি না কেন ?'

'বললে কি যেতে দেয় ?'

'সে আবার কি কথা! তোর যাওয়ার ইচ্ছে কে ঠেকাতে পারে ? বলবি— "যাবো।" মারবে তো ? মারুক। তবু বলবি— "যাবো।" যদি আরো মারে তবু বলবি— "যাবো"।'

'পিঠের খাল তুলে দেবে।'

'দিক-না, যাওয়া বন্ধ করবে কি ক'রে ?'

'বেঁধে রাখবে।'

'ব'সে-ব'সে বলবি— "যাবো. যাবো, যাবো"।' বাগচী হাসলে ; ছেলেদের বায়না-ধরার সুরটা সে নিখুঁত নকল করেছিলো।

ছেলে দুটিও হাসলো।

'তা শোন্, আর কখনো পালিয়ে যাবি নে। আর-একটা কথা, যারা তোদের মেরেছে তাদের মুখ ভ্যাঙাস্ নে কিন্তু। আমি খইচুরের মোয়া পাঠিয়ে দেবো তোদের সেখোদের হাতে। যদি তারা খেয়ে ফেলে দেয় আমাকে খবর দিস। আচ্ছা, কাজ কর।'

পেয়াদাদের খুঁজে বার করতে দেরি হ'লো। একজনকেই পাওয়া গেল।

'কাজটা তুমি অন্যায় করেছো। উদ্দেশ্য ভালোই ছিলো, নিয়মানুবর্তিতা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু শিশুকে মারতে নেই ও-ভাবে। বড্ডো জোর মার হয়েছিলো, কি বলো ?'

'ওরা ভারী বাঁদর।'

'এক শ' বার বাঁদর। বাঁদর সব ছেলেই। ছোটোবেলায় বাঁদর থাকাটাই উচিত। তুমি-আমিও বাঁদর ছিলাম। শাসন করো, করবে বৈকি। ছেলেকেও তো শাসন করে লোকে। তেমনি আর-কি, বুঝলে না ? তা শোনো, একটা কথা বলি। ওরা যদি আবার তোমাদের মুখ ভ্যাঙায়, মেরো না যেন। যাও, কাজে যাও।'

বাগচী খুশিমনে ডান্কানের কাছে উপস্থিত হ'লো।

'আলাপ হ'লো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার দয়া মনে থাকবে।'

বাগচী বিদায় নিলো। টপ্-হ্যাটটা মাথায় ফেলে ছাতিটা দোলাতে-দোলাতে দ্রুতগতিতে সে রাস্তা পার হ'তে লাগলো।

ডান্‌কানের হঠাৎ হাসি পেলো। বদ্ধ উন্মাদ লোকটা। সামনের টেবিলটায় পা তুলে দিয়ে ডান্‌কান সীলিং-এর গায়ে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে দিলো। নীলের চৌবাচ্চায় বৈঠা মারার থাড়্-থাড়্-থাস্ শব্দ ভেসে আসছে, চীনাকল ঘরঘর শব্দে চলছে।

কিন্তু, ডান্‌কান ভাবলো, মেয়েটি এমন বাঁদরের হাতে পড়েছে। ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটি একটা দেশীয় উন্মাদের হাতে পড়লো। ডানকান অনেকটা সময় ক্যাথারীনের কথা চিন্তা করলো। মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে লাবণ্যময়ী। এমন সুন্দরী যে, চট ক'রে তুলনা দেবার মতো কাউকে পাওয়া যায় না।

বাগচী যখন ডান্‌কানের কুঠিতে গিয়েছিলো তখন কেটও একা ছিলো না। সে তার পোশাক পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় বাইরের ঘরে কে ডাকলো, 'মাস্টারমশাই।' কেট উঁকি মেরে দেখলো, একটি অপূর্ব সুন্দরী। ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল, গলায় জড়োয়ার চিক ঝকঝক করছে। ছোট্টো কপালে ঢাকা সিল্কের মতো চকচকে চুল। কী অদ্ভুত গড়ন, ঠিক যেন খোদাই-করা একটি মূর্তি। বয়েস হয়েছে, কিন্তু এ-বয়সের সাধারণ হিন্দু-মেয়ের মতো কপালে সিঁদুর নেই, মাথায় ঘোমটা নেই। স্নিগ্ধ ডাগর চোখ। কেট যেন তাকে দেখামাত্র ভালোবেসে ফেললো। বাইরের ঘরের ভেতরের দিকের দরজার কাছে গিয়ে সে বললো, 'আসুন, মাস্টারমশাই বাড়ি নেই।'

'তবে তো ভালোই হ'লো। আমরা দু-জনে গল্প করতে পারবো অনেকক্ষণ।'

'আর আমি বুঝি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো?' —বাইরের ঘরের দরজার বাইরে থেকে একটি সুবেশ সুঠাম তরুণ মুখ বাড়িয়ে বললো।

কেট দেখলো এবং দেখে চিনতে পারলো, স্কুলের সভায় একেই রাজকুমার ব'লে সম্বোধন করেছিলো দেওয়ানজি।

কেট বললো, 'আপনিও আসুন। আমাদের অসীম সৌভাগ্য।'

রাজকুমার ঘরের ভিতর গিয়ে ব'সে হাসতে-হাসতে বললো, 'আপনি বাংলা জানেন না, আর আমরা জানি না ইংরেজি।'

'এটুকু বোঝার মতো বাংলা আমি বুঝি। বলতে কষ্ট হয়। ব্যাকরণ দোষ হ'য়ে যায়।'

'তা হোক। ব্যাকরণের দোষ না হ'লে কবিতাই হয় না।' বললো নয়নতারা।

কেট বললো, 'বাগচীকে কত বলছি আমাকে ভালো ক'রে বাংলা শিখিয়ে দিতে, তিনি বলেন, ও শেখাতে হবে না, আপনি শিখবে।'

নয়নতারা বললো, 'আপনার সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল আপনি কেমন লোক জানার জন্য আমরা দু-জনে এসেছি।'

হাসতে-হাসতে কেট বললো, 'আমি আপনাদের মতো মানুষ, তবে গরিব মানুষ, এই যা।'

'তাই ভেবে বুঝি জড়োসড়ো হ'য়ে আছেন? বলুন তো আমি কে আমরা কে?' নয়নতারা প্রশ্ন করলো।

'উনি রাজকুমার। আমাদের মনিব। আর আপনি—'

'বলুন। চট ক'রে তো ব'লে দিলেন আমরা বড়োলোক।'

'আপনি— আপনাকে আমি ঠিক ঠাহর করতে পারছি নে রাজকুমারের খুব নিকট কেউ নিশ্চয়।'

'তা হ'লে আমাকেই বলতে হ'লো।' নয়নতারা বললো, 'আমি এ গ্রামের একটি ব্রাহ্মণকন্যে। এবং অত্যন্ত দরিদ্র। আর আপনাদে মনিব সম্বন্ধে একটা কথা ব'লে রাখি, ভবিষ্যতে আপনার কাজে লাগবে

দরিদ্রদের ঘরে চড়াও হওয়া ওঁর মস্ত একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এখানে আসতে-আসতে সে-সব গল্পই হচ্ছিলো। দারিদ্র্যে ওঁর ভয়ংকর লোভ।'

দুটি চতুর মেয়ের চঞ্চল দৃষ্টি ও মধুর জিহ্বার আওতার মধ্যে রাজু অস্বস্তি বোধ করছিলো। সে বললো, 'নয়ন, আর যদি আমাকে খুঁড়বে আমি কিন্তু অনেক কথা ব'লে দেবো। তুমি কত দরিদ্র আর কেমন দীন ব্রাহ্মণকন্যা, এ জানতে কারো বাকি থাকবে না।'

'কী সর্বনাশ!' নয়ন কপট ত্রাস অভিনয় করলো, কিন্তু শেষপর্যন্ত খানিকটা ভীতও হ'লো। বলা যায় না, রাজকুমার সেই আংটির গল্পটা উত্থাপন ক'রে বসতে পারে। সে বললো, 'আচ্ছা বাপু, আমরা অন্য কথা বলছি।'

এদের এই মধুর কলহে কেট রিণরিণ ক'রে হেসে উঠলো এবং এদের সম্পর্ক সম্বন্ধেও একটা ধারণা ক'রে নিলো।

নয়নতারা বললো, 'আপনি কি ক'রে সময় কাটান ভাই? বাগচী-সাহেবের সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে তিনি ঘরে খুব-একটা থাকেন ব'লে মনে হয় না। ছাত্র পড়ান আর গ্রামের লোকের কথাবার্তা নিয়ে মেতে থাকেন। তখন আপনি কি করেন?'

'একার সংসার। কাজ, নেই বলতে নেই, ধরতে গেলে শেষ হয় না। তাই নিয়ে থাকি।'

'আজ তো স্কুলের ছুটি, আজও বাগচীসাহেব বাড়িতে নেই। আমি কিন্তু এ-সব পছন্দ করি না।'

কেট মনিব-পক্ষের কথায় বিব্রত হ'লো। কি অপছন্দ হ'লো কে জানে। 'কি বললেন ঠিক ধরতে পারলাম না।' সে বললো।

নয়নতারা বললো, 'কর্তাকে কিন্তু ছুটি-ছাটার দিনে বার হ'তে দিই নে, যদি আমি হতাম।'

কেটের মুখ লাল হ'লো। সে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো।

রাজু বললো, 'আপনি গান জানেন?'

রাজু শুনেছিলো, গান জানা, সাহেবি-বাজনা বাজানো মেমদের একটা সাধারণ গুণ।

কেট লজ্জিত মুখে বললো, 'জানি না। ইনি বোধ হয় ভালো জানেন?'

'কে, নয়ন? গানের গ-ও নেই ওর মধ্যে। কিন্তু আপনি বাজাতে জানেন, যেমন ধরুন, পিয়ানো?'

'তাকে জানা বলে না।'

'তা হ'লেও কিছু জানেন।'

'ওটা অত্যন্ত দামী যন্ত্র। নিজের যন্ত্র আমার কোনোদিনই ছিলো না। ভালো ক'রে শেখা হয় নি।'

রাজু ঝোঁকের মাথায় একটা প্রস্তাব ক'রে ফেললো, 'আপনি যদি নিজে অভ্যাস করার সঙ্গে-সঙ্গে এই অকেজো মেয়েটিকেও কিছু-কিছু শিখিয়ে দেন, আমি একটা পিয়ানো জোগাড় ক'রে দিতে পারি।'

'দু-জনে একসঙ্গে অভ্যাস করতে পারি, শেখানোর দায়িত্ব নিতে পারি না।'

নয়ন বললো, 'আর-একটা কাজ করতে হবে। আমাকে খানিকটা ইংরেজিও শিখিয়ে দিতে হবে।'

'হঠাৎ?' রাজু বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলো।

'গ্রামের ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েরাও বিদ্বান হ'য়ে গেল, আমিই শুধু মূর্খ হ'য়ে থাকবো নাকি?' নয়নতারা রাজুর কথাবলার ভঙ্গিও অনুকরণ করলো।

'তুমি তো ভয়ংকর লোক নয়ন, তোমাকে বিশ্বাস ক'রে কারো কোনো কথা বলা উচিত নয়।'

নয়নতারা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। হাসি থামলে বললো, 'আপনি কিছু মনে করবেন না বাগচী-জায়া, এটা আমাদের একটা ঘরোয়া রসিকতা।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে কেটের কাছে বিদায় নিয়ে রাজু ও নয়নতারা পথে বেরুলো।

রাজু বললো, 'বেশ লোকটি।'

'আমার চাইতেও ভালো?'

রাজু হাসিমুখে নয়নতারার দিকে মুখ তুলে চাইলো।

'বলবো?'

'না, বলতে হবে না।'

দু-জনে নীরবে পাশাপাশি চললো খানিকটা পথ।

রাজু বললো, 'এই হার কোথায় পেলে নয়ন, এমনি একটির কথা আমিও ভাবছিলাম।'

'রানী দিয়েছেন।'

'পারিশ্রমিক বুঝি মহাভারত পড়ার?'

'হ্যাঁ, রানীর হুকুমে প'রে থাকতে হয়, যেমন তোমার হুকুমে মেমসাহেব হ'য়ে দিনের বেলায় পথেও তোমার পাশে-পাশে হেঁটে যাচ্ছি।'

'কী সুন্দর বিনয় তোমার! নয়ান কবরেজ কি এর আগে গ্রামের পথে হাঁটতো না?'

'সঙ্গে তখন রাজকুমার থাকতো না।'

'তা হ'লে রাজকুমারেরই ঘোমটা দেওয়া উচিত।'

পথের বাঁক নিয়ে বললো নয়নতারা, 'আচ্ছা, রাজকুমার, আমরা কেন গিয়েছিলাম বলতে পারো কেটের সঙ্গে আলাপ করতে?'

'আলাপ করার জন্যই।'

'ও কি তোমার সাধারণ একজন কর্মচারীর স্ত্রী নয়? ওর স্বামীর বিদ্যাবত্তার জন্যেই কি গিয়েছিলাম?'

'তুমি কি এই কথাই ভাবছিলে এতক্ষণ?'

'হ্যাঁ, হঠাৎ আমার মনে হ'লো। কেট তোমার কথায় বার-বার মনিব ব'লে উল্লেখ করছিলো। তখন ভাবি নি। পরে পথ চলতে-চলতে মনে হ'লো, ও য়ুরোপীয় ব'লেই গিয়েছিলাম কি? কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে-কৌতূহল যদি স্ত্রীলোক ব'লে হ'তো, তুমি বোধ হয় আমাকে নিয়ে যেতে না।'

'নয়নতারা, তুমি কি বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয়, রাজকুমার, ও ইংরেজ অথচ দেশী লোকের স্ত্রী, এ-ঘটনাটায় এক মোহ সৃষ্টি করেছে। তোমার কি মনে হয়?'

'আমার কিছু মনে হয় না। বেশ লাগলো; তুমি ছিলে, কেট ছিলো, বেশ কাটলো সময়টা। যদি তুমি শেখো, আমি পিয়ানোর ব্যবস্থা সত্যিই করবো।'

নয়নতারা ঈষৎ হেসে বললো, 'ইংরেজিও শেখাবে?'

'একটু দাঁড়াও।'—ব'লে রাজকুমার পাশের জঙ্গলটার দিকে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তার ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ফিরে এল।

'সে কি! ঘোড়া কি এখানে বাঁধা ছিলো নাকি?'

রাজু বললো, 'এখন যাই, তুমি এ-পথটুকু একা-একা যাও, বরং আমি দাঁড়িয়ে দেখি। তুমি বাড়িতে ঢুকলে আমি ঘোড়ায় চড়বো।'

নয়নতারা বললো, 'স্নানাহারটা আজ আমার বাড়িতে হ'লে হ'তো না? আচ্ছা, তুমি যাও। বেলা হয়েছে। বিকেলে যেন একবার দেখা পাই।'

বাগচী ফিরে এসে দেখলো রান্না শেষ ক'রে কেট একটা পুরনো পত্রিকা নিয়ে পড়ছে। হ্যাট কোট ভেস্ট খুলে সার্ট গায়ে কেটের পাশে গিয়ে বসলো বাগচী।

মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে কেট বললো, 'কাজ হ'লো?'

'হ'লো। নীল কি ক'রে তৈরি হয় শিখে এলাম।'

'তাই শিখতে গিয়েছিলে নাকি?'

'দূর, তা হবে কেন; কালকের সেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ক'রে এলাম। মনে খুব অশান্তি ছিলো। প্রচলিত ব্যবস্থার উপর বিদ্বেষ বোধ হচ্ছিলো। ডান্‌কানের কাছে ক্ষমা চাইলাম। ছেলে দুটির সঙ্গে কথা বললাম, তাদের তিরস্কার করলাম। নিয়মানুবর্তিতা লঙ্ঘন করা অন্যায়, তা বুঝিয়ে দিলাম। পেয়াদাদের একজনকে পেয়েছিলাম, তার কাছে সেই সাধারণ কথাটার পুনরুক্তি করলাম, শাসনে স্নেহ থাকা চাই।'

'বেশ করেছো।'

'তা মন্দ নয়, ডান্‌কানের উপর যে-রাগটা হচ্ছিলো সেটা আর নেই। বেশ লোক ডান্‌কান। আমি তো জানি আমাদের দেশের লোকেরা কেমন নিয়মানুবর্তিতাজ্ঞানশূন্য।'

'এবার খাবে তো?'

বাগচী জুতো-মোজা খুলে স্লিপার পায়ে দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলো, তারপর বললো, 'কেট, তুমি একা-একা কি করলে, কাগজ পড়ছিলে?'

'না। আজ রবিবারটা আমার ভালোই কাটলো। দু-জন লোক এসেছিলেন। একটি মেয়ে, একটি পুরুষ। আন্দাজ করতে পারো কা'রা?'

'কি রকম চেহারা?'

'দু-জনেই রূপে অসাধারণ। মনে হয় দু-জনে প্রেমে ডুবে আছে। এবং সে-প্রেম মলিন নয়।'

'বটে! কিন্তু রূপে অসাধারণ কাকে পেলে তুমি?'

'আজ আমি বলবো না। তুমি ঠাহর করার চেষ্টা করো।'

'দেখা যাক। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে চোখে পড়ে কিনা। অসাধারণ রূপ দূর থেকেই চোখে পড়বে।'

আহার শেষ হ'লে মুখ ধুয়ে এসে বাগচী বললো, 'কেট, ডার্লিং, আমি কি ধর্ম থেকে স'রে যাচ্ছি?'

'এ-কথা কেন মনে হ'লো?'

'আজ এ-পর্যন্ত একবারও ঈশ্বরের কথা মনে হয় নি।'

'আজ মনে না-হওয়ার কারণ আছে। রবিবার আজ। তোমার উপাসনা রবিবারবিমুখ। ওটা তোমার বিদ্রোহের ফল।' কেট হাসলো।

'কী সাংঘাতিক কথা!' বাগচীও হাসলো, 'আমাকে রবিবার-বিরোধ পেয়ে বসেছে।'

'তা খানিকটা সত্যি। রবিবারে তুমি ধর্মচিন্তা থেকে স'রে থাকতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছো। রবিবারের ধর্মের অভ্যাস থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আর-এক অভ্যাসে জড়িয়ে পড়লে।'

'সেটা আদৌ ভালো নয়। অভ্যেসমাত্রই খারাপ। এসো, একটু ঈশ্বরকে ডাকি।' বলতে-বলতে ঘরের খালি মেঝেতে জানু পেতে বসলো বাগচী, কেটকেও বসতে হ'লো। বাগচী উপাসনা শুরু করলো:

হে ঈশ্বর, হে পরম পিতা, আমাকে এত সুখ তুমি কেন দিলে আমি জানি না। আমি যেন দর্পিত না হই। আমার যেন অহংকার আসে। আমার ইতিমধ্যে মনে হচ্ছে ডান্‌কানের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে সত্যিকার বিনত হ'তে আমি পারি নি। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো আমি তার কাছে অকারণে নত হচ্ছি। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো আমি মিথ্যা ব্যবহার করছি, কারও শেখানো বাঁধা-বুলি বলছি। যে

...., তুমি আমার অন্তরের অভ্যন্তরে যা দেখেছো তাই সত্য। আমি .. তোমার কাছে মিথ্যা না বলি। ক্ষমা চাইবার মতো মহৎ না হ'য়েও ক্ষ.. চাইতে গিয়ে কিছু অপমানিত বোধ ক'রেছি, আমাকে ক্ষমা করো।

উপাসনা শেষ হ'লে বাগচী উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'কেট, ফিরে আসতে-আসতে ভারী একটা কৌতুকের অনুভূতি হয়েছে। চলো, বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে-করতে বলবো।'

দু-হাতে দু-গাল রেখে মাথা উঁচু ক'রে বাগচীর মুখ দেখতে-দেখতে অর্ধশায়িতা কেট বললো, 'কি মনে হয়েছিলো?'

'প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের একটা কথা।'

'কি কথা, সেই নভুসের মতো ব্যাপার নাকি?'

'মিথোলজি নয়, মনস্তত্ত্ব। তাতে লিখছে, মা সন্তানকে ভালোবাসে নিজের জন্য, স্ত্রী স্বামীকে শ্রদ্ধা করে নিজের জন্য। এমনি সব ব্যাপার।'

'সেটা আবার নতুন কি! নিজের স্বামী ছাড়া আর-কাউকে স্বামীর শ্রদ্ধা কি মেয়েরা দিতে পারে?'

'তা নয়, তা নয়।' বাগচী হাসলো, 'মা সন্তানকে স্তন্য দেয়, স্তন্য দেওয়াটা সুখজনক ব'লে, স্ত্রী স্বামীকে শ্রদ্ধা করে শ্রদ্ধা করা সুখজনক ব'লে। আমরা যদি ভগবানকে ভালোবাসি সেটাও স্বার্থের জন্য।'

'তা হবে। কিন্তু হঠাৎ সে-কথা মনে হ'লো কেন?'

'ভাবলাম কেটকে আমি ভালোবাসি, ভালোবেসে আমার তৃপ্তি ব'লে; সেখানে কেটের অপেক্ষা আমি ই প্রধান। কেটের মঙ্গলের চাইতে আমার তৃপ্তিই বড়ো।'

'কী সাংঘাতিক!'

'না, না, কথাটা ঠিকভাবে ভেবে ছাখো। ধরো, যদি তোমার মঙ্গলই ভাবতাম তা হ'লে যে-নীলকর তোমার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলো, আমার

উচিত হ'তো তার হাতে তোমাকে দিয়ে আসা। ঐশ্বর্যে ও ক্ষমতায় নীলকর আর আমাতে অনেক পার্থক্য। আজ তা উপলব্ধি করলাম।'

কেট খিলখিল ক'রে হাসলো। 'আমার স্বার্থেই আমি তোমাকে ছাড়তাম না, তা ভুলে যাচ্ছো কেন? আমার ভালোবাসাও তো স্বার্থপর, যদি তোমার মনস্তত্ত্ব সত্যি হয়।'

কিছু সময় বাগচী মুগ্ধ আনন্দে নির্বাক হ'য়ে রইলো। একটু পরে সে জিগ্যেস করলো, 'কি ভাবছো?'

'শান্তির নামে কি অশান্তির বীজ বুনে এসেছো তাই আন্দাজ করার চেষ্টা করছি।' বললো কেট।

॥ সতেরো ॥

অর্ধজাগ্রত অবস্থায় পিয়েত্রোর কানে সুরগুলি ভেসে আসছিলো— স্ট্রাম, ...। ঠিক পরিচিত বলা যায় না সুরটা, অথচ অনেক দিনের পুরনো মনে ...। এমন কি সুরটা কোনো যন্ত্রের তা-ও মনে হয়, হয় না।

হঠাৎ ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসলো পিয়েত্রো, পিয়ানোটায় কে ... দিলো? এমন দুঃসাহস হ'লো কার?

শোবার ঘরের দরজা খুলে পিয়েত্রো অবাক হ'য়ে দেখলো রাজুকে। ... মাথা নিচু ক'রে এক অদ্ভুত ছন্দে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

'তুমি? তা-ও ভালো, আমি ভাবি কে হাত দেয় পিয়ানোতে!'

'আপনার ঘুম ভাঙলো অসময়ে।'

'না, সময় ঠিকই আছে। একটু জ্বর-জ্বর বোধ হয়েছিলো কাল ...রেতে, তাই উঠতে দেরি হয়েছে। তুমি বাজাও, আমি আসছি।'

সেই নাচের সুরটায় এখানে-ওখানে পরিশোধন ক'রে পিয়েত্রো একটা সুর খাড়া করেছিলো, রাজু সেটা বাজাচ্ছিলো নিজে কিছু সংযোজন ক'রে। পিয়েত্রো ফিরে এসে বসলো রাজুর কাছে।

'জ্বর জ্বর মতো নয়, তা হ'লে জ্বরই হয়েছে। মুখ-চোখ অত্যন্ত শুকনো দেখাচ্ছে আপনার।'

'ও কিছু নয়। কুইনাইন ও কিছু ব্র্যাণ্ডিতে চ'লে যাবে। তোমাদের খবর বলো। ইস্কোল কেমন চলছে?'

'স্কুল ভালোই চলবে। হেডমাস্টারটি উচ্চশিক্ষিত। এরই মধ্যে গ্রামের লোকদের মনোহরণ করেছেন। ছাত্রসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন হয়েছে। ...তিনটি ছোটো মেয়েও স্কুলে পড়ছে।'

'কৈলাসপণ্ডিতের পাঠশালার চাইতে উন্নতি হয়েছে তা হ'লে?'

'কৈলাসপণ্ডিত একা ত্রিশ জন পড়ুয়াকে পড়াতো, এখন তিন জনে

পঞ্চাশ জনকে পড়াচ্ছে। গোবর্ধন দত্ত ওদের বাংলা পড়ায়। লোকটার বুদ্ধি আছে। পাড়ার লোকরা অবশ্য বলাবলি করে, ছেলেদের ওতে অপকারই হবে। দ্বিতীয় ভাগ একদম পড়ায় না। দেওয়ান সেদিন আমার সামনে জিগ্যেস করেছিলেন। গোবর্ধন বললে— অযথা সময় নষ্ট ক'রে কি হবে আর্কফলা মুখস্থ ক'রে। যে-ক'টি অপরিহার্য তাই শিখুক। বরং কলকাতায় খোঁজ ক'রে গল্পের বই আনিয়ে দিতে হবে ছেলেদের।'

'তোমাদের বাগচী কিন্তু একটু পাগলাটে। ইতিমধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটিয়েছে সে।'

'কি করেছে?'

'ডান্‌কানের কুঠিতে গিয়েছিলো। তুমি শুনেছো নাকি ডান্‌কানের দু-জন পেয়াদা এসে ইকোলের দুটি ছেলেকে মেরেছিলো; তারই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলো বাগচী।'

'তারপর?'

'প্রতিবাদ করেছে কিনা জানি না। তবে মরেলগঞ্জে বাগচী যত পরিচিত হয়েছে আমরা ত্রিশ বছরেও তা' পারি নি। কুঠির লোকজন তো বটেই, ডান্‌কানের সব চাষীরা পর্যন্ত বাগচীর নাম উল্লেখ ক'রে আলোচনা করছে, হাসাহাসিও করছে। ডান্‌কানের এলেকায় যে-সব লোক রেখেছি তারাই বলছিলো।'

'কি বলছে তারা?'

'তাদের একদল তাকে ঘোর উন্মাদ বলছে। কিন্তু সে যে সেই ছেলে দুটির পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়ার জন্যে ডান্‌কানের কুঠিতে ঢুকেছিলো, তাদের সঙ্গে কথা বলেছে, এটাই কারো-কারো কাছে বড়ো হ'য়ে উঠেছে। আমাদের এখান থেকে দুটি ছেলে পড়তে যায়। তারা বই

...ার টাকা চাইতে এসেছিলো। তাদের কাছে শুনলাম সেই মার-খাওয়া ...র দুটির জন্য মুড়কি-মোয়াও পাঠিয়ে দিয়েছিলো। মোদ্দা কথা, ...টা খুব জনপ্রিয় হবে ব'লে মনে হয়।'

'ভদ্রলোক লোকের উপকারও করছে, কাল শুনলাম ডাক্তারিও ...।' কথাটা মনে পড়ায় রাজু আগ্রহভরে উত্থাপন করলো প্রশ্নটা। 'শুনলাম স্কুলের নামকরণ আপনি করেছেন।'

'শুধু কি তাই?' পিয়েত্রো মৃদু হেসে বললো, 'আমি যে ট্রাস্টিও ... তার শর্ত ওই নামটুকু।'

'লোকে বলছে "জ্ঞানদা" নাম পিয়েত্রোসাহেব কেন রাখলো বোঝা যাচ্ছে না। গোবর্ধন বলছিলো— পিয়েত্রোসাহেব যদি বাঙালী হতেন, তা হ'লে বলা যেতো তাঁর কোনো নিকট-আত্মীয়ার নামে স্কুলের নাম রেখেছেন।'

'তোমার কি মনে হয় রাজু?'

'আমি জানি আপনি বাঙালী মায়ের সন্তান। সে-কথা আমি আর কাউকে বলি নি। শুনেই মনে হ'লো ওটা আপনার মায়ের নাম হ'তে পারে। বলুন তো সেটা ঠিক কিনা?'

'তুমি ঠিকই ধরেছো।'

রাজুর খুব আনন্দ হ'লো। একটু পরে সে বললে, 'আপনি যে কত ভালো লোক এটা তারই পরিচয়।'

'আমি যে ভালো লোক নই তারও অসংখ্য প্রমাণ আছে।'

'খ্রীস্টানদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলাতে শুরু করেছে।'

'হঠাৎ এ-রকম মনে হ'লো যে?'

'আপনি খ্রীস্টান হ'য়েও যদি আপনার ব্রাহ্মণ মাকে এত ভালোবাসতে পারেন, বাগচীর স্ত্রী কেট য়ুরোপীয় হ'য়েও যদি অমন খুশিমনে স্বামীর

সংসার করতে পারে, তা হ'লে খ্রীস্টানধর্ম কখনো উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম নয়। মন্‌সেনে—'

'বলো, শুনছি।'

'আপনি আমাকে বলেন নি কিন্তু আরো-একটা নাম আমি আবিষ্কার করেছি। আপনার পিয়ানোর ডালার ভেতর দিকে অস্পষ্ট অক্ষরে আর-একটা নাম লেখা আছে। সেটা আপনার কোনো নিকট-আত্মীয়ার। আমি উচ্চারণ করতে পারি না। কিন্তু অক্ষরগুলো প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গেছে। বাজাতে-বাজাতে প্রায়ই আমার চোখ দুটি লেখাটির উপরে গিয়ে পড়ে।'

পিয়েত্রোর চোখ দুটি চকচক ক'রে উঠলো। পরে শান্ত স্বাভাবিক স্বরে সে বললো, 'এখনো আছে নাকি? যখন পিয়ানোটা কিনি তখনো ওই নামটি আমার খুব মনে পড়তো। ওটা ইটালী দেশের এক কবির মানসসুন্দরীর নাম। বোধ হয় বাইস্ লেখা আছে, নয়?'

'সে-জন্য তো আর নামটি লেখেন নি!'

মনে হ'লো পিয়েত্রো কিছু বলবে, কিন্তু কথা না ব'লে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলো। একটু পরে বললো, 'রাজু, তুমি পিয়ানোটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে না? কবে নিয়ে যাবে বলো। আমি লোকজনকে ব'লে দেবো।'

'পিয়ানো বাজানোর আর-একজন লোক হ'লো এ-অঞ্চলে।'

'তাই নাকি, কে? ডান্‌কানের কুঠিতেও আছে নাকি?'

'না, আপনাদের স্কুলে।'

'বাগচী, না বাগচীর স্ত্রী?'

'পরেরটি।'

'বাহ্, বেশ ভালো কথা তো। একদিন গিয়ে শুনে আসবো। তাঁর কি পিয়ানো আছে?'

'না, নেই।'

'তা হ'লে তো অভ্যেস নষ্ট হ'য়ে যাবে।'

রাজু দুষ্টুমির স্বরে বললো, 'আমি ভাবছি একটা বাজনার স্কুল খুলবো, আপনি আমাকে একটা পিয়ানো আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।'

'সে তো চট্ ক'রে হবে না। কলকাতার কোনো দোকানে তেমনটি পাওয়া যায় না।'

'তা হ'লে যখন আবার আপনার জাহাজ যাবে, ব'লে দেবেন।'

'দেবো। কিন্তু ততদিন বাগচীর স্ত্রীকে তোমার পিয়ানোতেই বাজাতে দিয়ো। কিছু-কিছু স্বরলিপির বই বোধ হয় আমি আনিয়ে দিতে পারবো।'

'যদি পিয়ানোটা বাগচীর বৈঠকখানায় আপাতত রাখি?'

পিয়েত্রো হোহো ক'রে হেসে উঠলো, 'জিনিসটা দুষ্প্রাপ্য বটে, তাই ব'লে অত সতর্ক হবার দরকার নেই। তোমার জিনিস, তুমি যে-কোনো জায়গায় রাখতে পারো। আমার অনুমতি নিতে হবে না।'

'আর-একটা কারণ আছে বলার। আপনাকে মাঝে-মাঝে গিয়ে শিখিয়ে দিতে হবে।'

'সেটা কতদূর হ'য়ে উঠবে বলতে পারছি না।'

ঠিক এমন সময় সদরের দিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। তার পরই ভারী জুতোর শব্দ এবং মোটা গলায় কে পিয়েত্রোর খোঁজ করলো।

একজন ভৃত্য এসে খবর দিলো, 'ডান্‌কানসাহেব এসেছেন।'

'নিয়ে এসো।' পিয়েত্রো নিজেও উঠে গেল এগিয়ে আনার জন্যে।

'হাল্লো, নেইবার। হাউ-ডু ডু?'

'থ্যাংক্ ইউ ফর দ্য অনার।'

ডান্‌কানের করমর্দন ক'রে পিয়েত্রো তাকে বসবার ঘরে নিয়ে এল। রাজুকে দেখে ডান্‌কান তার করমর্দন করলো, 'গুড মর্নিং প্রিন্স্‌।'

ডান্‌কানের এত আনন্দিত হবার কারণ বোঝা গেল না।

পিয়েত্রো বললো, 'আপনি চিরকালই আমার কুটীরে স্বাগত, কিন্তু আজ আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?'

ডান্‌কান বললে, 'কিচ্ছু না। গল্পসল্প করতে এলাম। এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, একটু পিপাসা বোধ হ'লো। ভাবলাম, পথের ধারে প্রতিবেশী পিয়েত্রো আছেন, এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। দু-বছর হ'লো এসেছি, এখন পর্যন্ত একবারও যাওয়া হয় নি।'

'আমার এক মিনিট অনুপস্থিতির অপরাধ ক্ষমা করবেন।'

পিয়েত্রো চ'লে গেল এবং এক মিনিট পরেই ফিরে এল।

তার পেছনে-পেছনে একজন উর্দি-পরা ভৃত্য হাতে ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ট্রেতে সুরা ও গ্লাস। ডান্‌কানের চেয়ারের পাশে একটা টিপয়ে ট্রে-টা রেখে দিলো।

পরস্পরের স্বাস্থ্য ও সুখ কামনা ক'রে সুরাপান শুরু হ'লো।

ডান্‌কান বললে, 'মঁসিয়ে, ভালো স্কুলই করেছেন। হেডমাস্টারটি বদ্ধ উন্মাদ। তার খামোকা ক্ষমা চাওয়ার বহর দেখলে বুঝতেন ব্যাপারটা।'

'আমারও মনে হয় পাদরিদের কারো-কারো মতো লোকটার কতকগুলো কৌণিক বৃত্তি আছে।'

'কিন্তু তবু ভালো পাদরি নয়। কয়েকটা পাদরি যা করছে ক্যালকাটায় ও চব্বিশ পরগনায় তাতে দস্তুরমতো বিরক্ত বোধ হয়। আমি অ্যাংলো-বেঙ্গলীদের হেট্‌ করি। তারা অত্যন্ত উদ্ধত। খাঁটি বেঙ্গলীরা সাধারণত ভালো। তাদের ছল্‌-চাতুরি নেই। কিন্তু এই দো-আঁশলা শিক্ষায় শিক্ষিতরা অত্যন্ত কুটিলপ্রকৃতি। আপনি শুনে

থাকবেন, ফাদার লং ব'লে একজন নীলকরদের কাজের সমালোচনা করছে।'

'সমালোচনায় দোষ কি ?'

'পার্লামেণ্টে ভালো, পড়ার ক্লাসে ভালো, কিন্তু সমাজে যাতে দুর্নাম হয় এমন কাজ করা উচিত নয়।'

'তা বটে।'

'আপনার বাগচী অবশ্য সে-সব বিষয়ে ভালো। সে সম্মান রেখে কথা বলতে জানে। এ-রকম লোককে মেনে নিতে আমিও প্রস্তুত। সে ছোকরাদের কাছে নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে যে-বক্তৃতা দিয়েছে তাতে আমি খুশি হয়েছি।'

পিয়েত্রো বললো, 'দেখা যাচ্ছে দেওয়ান কাজটা ভালোই করেছে।'

'কিন্তু একটা কাজ বাগচী করছে যেটা না-করাই উচিত হ'তো। সে হিদেনদের চিকিৎসা করছে। ওষুধ ব'লে জল খাওয়াচ্ছে।'

'তাতে কি রোগ সারছে ?'

'কিছু-কিছু সারছে বৈকি।'

'তা হ'লে তো খুব ভালো কথা।'

'কিন্তু একটা বিপদ আছে। লোকে ওটাকে অন্য কিছু মনে না করে।'

'কি মনে করবে ?'

'ওষুধের নাম ক'রে খ্রীস্টানের জল খাওয়াচ্ছে।'

'তা হবে না। লোকে তো ইচ্ছে ক'রেই খাচ্ছে তার ওষুধ।'

'বয়স্করা কেউ খাচ্ছে না এখনো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিশুদেরই চিকিৎসা করে সে।'

'এ তার খুব দয়ার পরিচয়। কিন্তু আপনি যেন তথাকথিত হিদেনদের খ্রীস্টানদের ছোঁয়া থেকে বাঁচানোর জন্য বদ্ধপরিকর।'

পিয়েত্রো কথাটা মনে ক'রে বলার আগেই হেসে ফেললো। 'সদরে গিয়েছে।'

'কেন? উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে?'

'না, বরকন্দাজদের জন্য বন্দুক আনতে। দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।'

'হঠাৎ? লাঠি-সোঁটায় মানায় না নাকি বরকন্দাজদের?'

'বললে, আজকাল ডাকাত-ঠ্যাঙাড়েরাও বন্দুক ব্যবহার করে, তাদের সামনে লাঠিয়াল কি করবে।'

রাজু হাসিমুখে বললো, 'বন্দুকের দালালি করছে কিনা কে জানে।'

॥ আঠারো ॥

কয়েকটা মাস অতিবাহিত হ'য়ে গেছে। এখন বসন্তকাল। আমগাছগুলির মাথায় এবং বনের শালগাছগুলির সর্বাঙ্গে চৈত্র মাসের সূচনা দেখা দিয়েছে। পদ্মা ও বিলের দেশ, শেষরাতে এখনো শীত-শীত করে। দুপুরের রোদে হাত-মুখ খড়খড় করে শুকিয়ে। কিন্তু ঘরে ব'সে সহসা মনটা কেমন হাল্কা বোধ হয়। পথের ধুলোর ছোটো-ছোটো ঘূর্ণিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার ব্যাপারে যেমন, আমগাছে ডেকে ওঠা কোকিলের ডাকে সহসা উৎকর্ণ হওয়াতেও তেমনি রোজকার দিনের বাইরে এমন একটি অনুভব আছে যেটাকে অতিশয়োক্তি করতে পারলে কবিপ্রসিদ্ধির গদ্যরূপগুলি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বনদুর্গা ও চরণদাসের বিবাহ হ'য়ে গেছে। খুব সহজেই হয়েছে বিবাহটা। গোবর্ধন একদিন বাগচীকে বলেছিলো কথায়-কথায়। বাগচী বললো দেওয়ানকে। দেওয়ান বললো, 'এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। ছোকরাটা ভয় পাচ্ছে কেন? লাগিয়ে দিন বিয়ে।'

বিবাহের পর চরণদাসের মা বাগচীর বাড়িতে এসে কেঁদে পড়েছিলো। বিপন্ন বাগচী আবার দেওয়ানের কাছে গিয়েছিলো। অনুমতি পেয়ে একদিন বুড়ি দেওয়ানের ঘরে গিয়ে কেঁদে পড়লো— বুক চাপড়াতে লাগলো। চরণদাস তার একমাত্র ছেলে, শ্বশুরকুলের একমাত্র বংশধর। এ কি হ'লো? রাজা হ'য়ে এ কি করলো হরদয়াল। কিছুক্ষণ কান্না শুনে হরদয়াল বলেছিলো— শোনো চরণের মা, টাকা চাও? কাশী যাবে? কাশীতে যাও, টাকাও পাবে। রাজী? খবরদার, আর কাঁদবে না। গুনতে জানো? গুনে ছাখো পঞ্চাশ আছে ওখানে। ওঠো, পড়শি ঠিক করো গে। কাশীতে যাবার টাকা পাবে।

চরণের মা কাশী চ'লে গিয়েছে। যাবার সময় নাকি তার বাড়ির

দরজা ধ'রে আর-একবার চরণের হাত ধ'রে এমন কেঁদেছিলো যে, বনদুর্গার চোখ বেয়েও ধারা নেমেছিলো। এখন সবাই জানে চরণদাসের ব্যাপারটা। বনদুর্গা কপালে সিঁদুর দিয়ে শাঁখা হাতে জল আনতে যায় নদীতে। পড়শিদের মধ্যে অনেকে নখে আঙুল দিয়ে অবাক হ'য়ে তাকে ভাখে। তার সিঁদুররঞ্জিত সিঁথি ও সমুন্নত গর্ভের দিকে চেয়ে থাকে।

দ্বিতীয় খবর, একটা টাট্টু ঘোড়া কিনেছে বাগচী। বড়ো ঘোড়া দিতে চেয়েছিলো হরদয়াল, বাগচী রাজী হয় নি। সে ছোটো টাট্টু ঘোড়াটায় ব'সে স্কুল বসার আগে একবার, পরে একবার গ্রাম ঘুরতে বার হয়। তার পকেট-বোঝাই ছোটো-ছোটো শিশিভরা ওষুধ থাকে। শুধু যে নিজেদের গ্রামেই ঘোরে তা' নয়, ডান্‌কানের গ্রামে যায়, পিয়েত্রোর গ্রামেও।

ডান্‌কানের গ্রামের উপরে তার যেন একটা টান আছে। ইতিমধ্যে একদিন সে একটা কৌতুকের সৃষ্টি করেছিলো সেই গ্রামে। একটি চাষীর জ্বর হয়েছিলো। তাকে ওষুধ দিচ্ছিলো বাগচী। এমন একটা রোগের নাম করেছে সে, যে লোকে উচ্চারণ করতে পারে না। রোগটা নাকি টাইফয়েড। সে বলেছিলো, সান্নিপাতিক-টাতিক বুঝি না। এটা টাইফয়েড। দু-বেলা লেগে ছিলো জোঁকের মতো বাগচী। চাষীটি সাত দিন হ'লো অন্নপথ্য করেছে। ডান্‌কানের কুঠি থেকে লোক এসেছিলো ডাকতে। বাগচী বলেছিলো— সে কি! এক মাসের আগে ওর যাওয়া বারণ।

—বারণটা করলো কে ?

—কেন, আমি ডাক্তারি করলাম, আমি-ই বারণ করেছি।

—ভালো কথায় না যায় জোর ক'রে নিয়ে যাবো।

—বটে ? ভেবেছো আমি রাগতে জানি না। যাই দেখি সদরে।

রাগে কাঁপতে-কাঁপতে টাট্টু চ'ড়ে সেই অস্নাত অভুক্ত মুহূর্তেই রওনা হ'য়ে বাগচী সদরে পৌঁছে কালেক্‌টরের কাছে নালিশ করেছিলো। এবং ব্যাপারটা যে প্রকৃত, তার প্রমাণস্বরূপ ডান্‌কানের কাছে কালেক্‌টরের চিঠি এসেছিলো ব্যাপারটার অনুসন্ধান ক'রে। অবশ্য সে-চিঠিতে মামুলি উপদেশ অপেক্ষা হাসাহাসি ছিলো বেশি।

এই ঘটনার পরে একদিন তার রোগীটি এসে বাগচীকে বলেছিলো— সাহেব, বিশটা টাকা দরকার।

—কেন রে ?

—প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজে উঠতে হবে।

—প্রায়শ্চিত্ত ? তা' বটে, অনেক দিন রোগ ভোগ করলে করে বটে।

—আজ্ঞে না। জাত মেরে দিয়েছেন আপনি। আপনি জল খাইয়েছেন আমাকে ওষুধের সঙ্গে। আমরা জাতিতে সদ্‌গোপ। আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে কেউ আসছে না।

—বটে ! গেট-আউট, গেট-আউট ! অন্নপ্রাশন টু হেল।

লোকটা বাগচীর রাগ ও তার বিস্তৃত বক্ষের ওঠা-নামা দেখে ভয় পেয়ে স্কুলবাড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে বাগচী তার ছোকরা সহিসটাকে পাঠিয়ে দিলো— লোকটাকে ডেকে আন্ তো ! বলবি, সাহেবের কাছে না-এলে আরও চ'টে যাবে সাহেব।

লোকটি এলে তাকে টাকা দিয়ে বলেছিলো বাগচী— ছাখো বাপু, আমি বুঝতে ভুল করেছিলাম। সমাজের সঙ্গে বিবাদ করার চাইতে শাস্তিটা ভালো।

ডান্‌কানের সঙ্গেও একদিন দেখা হয়েছিলো বাগচীর।

ডান্‌কান বলেছিলো— এত কষ্ট করলে বাগচী, কি লাভ হ'লো? নিমকহারামটা নাকি তোমার কাছ থেকে টাকাও নিয়ে এসেছে?

—আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের দেশের লোক এমনি বটে।

—এতে তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত।

—হয়েছে বৈকি। আমি একজন হিন্দু-কম্পাউণ্ডার খুঁজছি। ওষুধ সে-ই দেবে, আমি দেবো না।

টাট্টু আরূঢ় বাগচীর পিঠের দিকে চেয়ে ডান্‌কান হোহো ক'রে হেসে উঠলো, কি কথার কি উত্তর! জড়বুদ্ধি।

তৃতীয় ঘটনাটা ঘটিয়েছে বুজরুক আলি। সে নৌকো বোঝাই ক'রে এক-নৌকো দেশি বন্দুক এনেছে পশ্চিম থেকে। বন্দুক বিক্রিই এখন তার পেশা ব'লে মনে হয়। শুধু বিক্রি করাই নয়, প্রয়োজন হ'লে ব্যবহারও শিখিয়ে দেয়। কিন্তু দামের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। রাজুর কাছে এসেছিলো— বন্দুক নেবে গো?

রাজু হেসে বাঁচে না। 'দিয়ো দশটা। কত দাম নেবে?'

'এক হাজার টাকা দিয়ো।'

কেনা-বেচা হ'য়ে গেল। পরদিন সকালে বুজরুকের একটি লোক এসে বন্দুক নিয়ে হাজির। সদর-নায়েব টাকা গুনে দিতে-দিতে বললো, 'এত কি হবে?'

'হুজুর, বরকন্দাজরা লাঠির বদলে এই নিক-না।'

'ওরা কি ছুঁড়তে জানবে?'

'আলি খাঁ শিখিয়ে দেবে।'

বুজরুক আলি শেখানোর ব্যবস্থাও সত্যি-সত্যি করেছে। আজকাল যেমন সেলাইয়ের কলওয়ালারা সেলাই শেখায়।

কিন্তু গোবর্ধন দত্ত শখ ক'রে একটা বন্দুক কিনতে গিয়েছিলো— পাঁচ শ' দাম হেঁকে বসেছে বুজরুক আলি।

ঘটনা ঠিক বলা যায় না। ঘটনার আয়োজন। এটা করেছে হরদয়াল। দু-বিঘে জমির মাটি কেটে ইটের ভাটা বসেছিলো। এখন রোজই কিছু-কিছু ক'রে ইট এসে জমা হচ্ছে স্কুলবাড়িটার কাছে। বহুদূর থেকে সেই ইটের পাঁজাগুলো চোখে পড়ে। বর্ষার পর হাজার-মণি নৌকোয় চুন এসেছে। বাঁশের চাটাই-এ ঢাকা চুনের স্তূপের পাশে সুরকির কল বসেছে। কলুর বলদের চালে ঘুরে-ঘুরে দুটি বলদ প্রকাণ্ড একটি লোহার চাকা ঘুরিয়ে সুরকি তৈরি করছে। আর এসেছে কাচ। সেগুলো সযত্নে তোলা আছে দেওয়ান-ভবনে। স্কুলবাড়ি বোধ হয় শিশার মহল হবে।

এ-সব ঘটনার পরে।

রাজু তার হাতিটায় চেপে পিয়েত্রোর আবাদ থেকে ফিরছিলো একদিন। খেলা দেখার নিমন্ত্রণ ছিলো রাজুর। বুজরুক আলি দু-দিন ধ'রে খেলার বন্দোবস্ত করেছে। রাজবাড়ির বরকন্দাজ এবং পিয়েত্রোর বরকন্দাজদের মধ্যে খেলা। দু-দিকেই দশজন-দশজন ক'রে খেলুড়ে। পিয়েত্রোর কুঠির নিচেই তিন-চার বিঘা মতো জমি থেকে আগাছা ও ঘাস উপড়ে ফেলে খেলার জায়গা করা হয়েছে, সুরকি ও নীল মেশানো চাখড়ির গুঁড়ো দিয়ে বড়ো-বড়ো চৌখুপি আঁকা হয়েছে মাটির উপর। যেন মস্ত একখানি দাবার ছক।

রাজুর বরকন্দাজরা রাত থাকতে উঠে চ'লে গেছে। রাজু গিয়ে দেখলো পিয়েত্রোর বরকন্দাজদের সঙ্গে মিলে তারা সেই মাঠের ধারে দৌড়চ্ছে, সকলেরই খালি গা। অত সকালেও তারা ঘর্মাক্ত হ'য়ে উঠেছে।

হাতি থেকে নেমে রাজু দেখতে পেলো বুজরুক আলি বরকন্দাজদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের উৎসাহিত করছে।

'খেলা শুরু হয়েছে নাকি ?'

'না, রাত্রির জড়তা কাটাচ্ছে এরা। আপনার বরকন্দাজরা ভেবেছিলাম ভেতো, এখন দেখছি তা নয়, রাজকুমার। বেশ দৌড়চ্ছে। আপনি এসেছেন, এখন খেলা আরম্ভ হবে। দাবার নিয়মে খেলা। পেছনে বল না থাকলে, নিজের কৌশলে বন্দী কিংবা নিরস্ত্র ক'রে ঘর দখল করা যেতে পারবে। আমি ওদের সকলকে কৌশলটা বুঝিয়ে দিয়েছি। দেখলাম প্রায় সকলেই জানে দাবা খেলার নিয়ম। ওরা নিজেরাই খেলতে পারে। তবু ওদের চালালে, মানে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করলে, ভালো হয়। আপনি একদিক চালাবেন আর আমি একদিক। রাজী ?'

'ঠিক আছে। কিন্তু দঙ্গলে মিশে গেলে কি ক'রে চেনা যাবে কোন দলে কে ?'

'তারও ব্যবস্থা আছে। এমনকি ওরা মাঠে নেমে অন্যায় যাতে না করে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মাঠের মাঝখানে থাকবেন পিয়েত্রো রাজ।'

কয়েক পা গিয়ে তারা পিয়েত্রোর আটচালায় বসলো। একজন ভৃত্য পাঠিয়ে বরকন্দাজদের ডেকে আনা হ'লো। তারা একটু বিশ্রাম করলে তাদের কিছু-কিছু আহার্য দেওয়া হ'লো। বরকন্দাজদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ছিলো। হিন্দু ও মুসলমানরা খানিকটা দূর তফাতে দুইদলে ব'সে হিন্দু ও মুসলমান রাঁধুনির হাত থেকে গরম হালুয়া ও রুটি খেলো। তারপর তাদের পোশাক দেওয়া হ'লো। নিজের-নিজের ধুতির উপরে দল হিসাবে তারা লাল নীল কুর্তা বেছে নিলো, মাথায় বাঁধার লাল নীল গামছা। দুই দলেরই নিজেদের সর্দার ঠিক করা আছে দেখা গেল। রং পছন্দের ব্যাপারে তারাই সকলের হ'য়ে মত দিলো। পিয়েত্রোর দল

পেলো নীল, রাজবাড়ির দল লাল। সর্দারদের ডেকে জিগ্যেস করা হ'লো তারা দাবার নিয়ম অনুসারে পদাতিক চালাতে জানে কিনা। তারা মাথা নেড়ে জানালো, জানে। তখন তাদের প্রত্যেককে ছোটো-ছোটো বেতের ঢাল ও ছোটো-ছোটো তরোয়াল দেওয়া হ'লো। রাজু পরীক্ষা ক'রে দেখলো, তরোয়ালগুলোর ধার মোটা, খেলার তরোয়াল সেগুলো। কিন্তু মানুষের প্রাণ তাতেই যেতে পারে। রাজু তার এই আশঙ্কার কথাও জানালো।

বুজরুক বললো, 'যেখানে বল আছে সেখানে কেউ যদি আক্রমণ করে তবে তো সে দু-তিনজনের সঙ্গে লড়ছে, তার ক্ষমতা কি সে কাউকে ঘায়েল করে। যেখানে একা-একা লড়াই হবে সেখানে বিচারক নিজে তার লম্বা তরোয়াল নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। তা ছাড়া মাঠে নামার আগে প্রত্যেককে ব'লে দেওয়া হবে খুন জখম যাতে না হয়।'

দু-দল বরকন্দাজ মুখোমুখি দাঁড়ালো। খেলা শুরু হ'লো। দু-দলের মাঝখানে লম্বা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে পিয়েত্রো।

দ্রুত চালে খেলা চললো। রাজুর বয়স বুজরুক আলির চাইতে কম হ'লেও, দেখা গেল, দাবার চালে সে-ও প্রায় তুল্য বিচক্ষণ। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল। রাজুর একটি পদাতিককে একা পেয়ে বুজরুক তাকে মারবার জন্য একটি পদাতিক এগিয়ে দিলো। রাজুর পদাতিকও ঝাঁ ক'রে খাপ থেকে তরোয়াল বার ক'রে দাঁড়ালো, কিন্তু টেরচা একটা ফাঁক পেয়ে রাজু তার সর্দারকে এগিয়ে দিলো তার সেই আক্রান্ত পদাতিকের কাছে। বুজরুকের যুযুৎসু পদাতিক খাপে তরোয়াল ভ'রে ফেললো। তখন রাজুর পদাতিকও তরোয়াল খাপে ভরতে-ভরতে খেলার আনন্দে বললে, 'ইন্‌সা আল্লা।' কিন্তু রাজু যখন এই প্যাঁচটার মুখে আর-একটার কথা ভাবছে তখন দেখতে

পেলো, একেবারে বাঁ-দিকে বুজরুকের একটি চাল মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে; বুজরুকের সর্দারের সহায়তা পেয়ে তার এক পদাতিক রাজুর এক নির্বল পদাতিককে পেয়ে বসেছে। এদিকে রাজু সর্দার সরাতে পারে না, এ-দিকের ঘর হাত ছাড়া হয়। রাজু হাতি ঘুরিয়ে নিয়ে সে-দিকে পৌঁছতে-পৌঁছতে একটি যুদ্ধ হ'য়ে গেল। যুদ্ধটা মারাত্মক হ'তে পারতো, ওদিকে দু-জন, এদিকে একজন। শান্তিরক্ষক পিয়েত্রো লম্বা তরোয়াল হাতে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তাদের, কিন্তু রাজুর মাথায় আর-এক চাল এল। এবার তার চালের সময়, সে তার সর্দারকে দু-ঘর পিছিয়ে দিলো টেরচা ক'রে। বুজরুক তার ঘোড়ায় ব'সে সেটা দেখতে পেয়ে হাঁ-হাঁ ক'রে ওদিকের যুদ্ধ থামিয়ে ছুটে এল। রাজুর সর্দারের সামনে তখন উন্মুক্ত ব্যূহ। পরের চালে, হয় সে পিয়েত্রোর একটা আনকোরা নতুন বরকন্দাজকে ঘায়েল করবে, কিংবা সে তার পদাতিক সঙ্গীদের দুটিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। চাল দেবার আগে বুজরুককে সারা মাঠের চারিদিকে বার দু-এক ঘোড়া ছুটিয়ে পদাতিকদের অবস্থান বিচার করতে হ'লো।

প্রায় এক ঘণ্টা খেলা চললো। কিন্তু খেলা থামাতে হ'লো। একটা কাগজের ছকে উভয় পক্ষের পদাতিকগুলির অবস্থান চিহ্নিত ক'রে নিয়ে বুজরুক বললো, 'আজ এই খেলা এই পর্যন্ত। রাজুর পক্ষের দুটি, বুজরুকের একটি পদাতিক মার গিয়েছিলো। বুজরুকের পদাতিকটি প্রায় পাঁচ মিনিট রাজুর সর্দারের সঙ্গে লড়েছে। সে একটু আঘাতও পেয়েছে। বেচারার বাহুমূল দিয়ে রক্ত পড়ছিলো। বুজরুক তার হাত বেঁধে দিয়ে বললো, 'সবাই বিশ্রাম ক'রে নাও। এর পর ফৌজ-ফৌজ খেলা।'

'সেটা কিরকম ব্যাপার ?' রাজু কৌতুকভরে প্রশ্ন করলো।

'বন্দুক নিয়ে খেলা। যে সবচাইতে তাড়াতাড়ি বন্দুক গেদে

ছুঁড়তে পারবে আর যার নিশানা সব চাইতে ভালো তারা এক-এক মোহর ক'রে বকশিশ পাবে।'

রাজু হাসতে-হাসতে বললো, 'আমাদের বরকন্দাজরা কি বন্দুক ধরতে শিখেছে?'

'দেখুন না কি হয়।'

চারজন বরকন্দাজ বুজরুকের ঘর থেকে রাশি-রাশি বন্দুক বার ক'রে আনলো।

বুজরুকের ফৌজি খেলা দু-ভাগে ভাগ করা যায়; এক হচ্ছে, দূরের একটা গাছের গায়ে ঝোলানো বালিভরা চামড়ার থলেতে গুলি বেঁধা। দ্বিতীয় হচ্ছে, পাঁচ মিনিটে কে কতবার বন্দুক গেদে ছুঁড়তে পারে।

খেলা শুরু হ'লো। রাজু ভেবেছিলো তাঁর বরকন্দাজরা পারবে না। দেখা গেল নিশানার বিষয়ে চতুর্থ পঞ্চম ও অষ্টম স্থান তারা পেয়েছে এবং গুলি ছুঁড়বার ব্যাপারে প্রথম হয়েছে তারই এক ছোকরা-বরকন্দাজ। পাঁচ মিনিটে সে পাঁচবার গুলি ছুঁড়েছে এবং ষষ্ঠ বারের জন্য গাদা শেষ করেছে।

এর পর পাচকরা এসে দু-পক্ষের বরকন্দাজদের ডেকে নিয়ে গেল। তারা শরবত খেয়ে যার-যার বাড়ির দিকে সেই রঙিন কুর্তা গায়েই চ'লে গেল।

বুজরুকেরও পিপাসা পেয়েছিলো। খানিকটা নামে সিরাজি কিন্তু আসলে ফরাসী মদ খেয়ে পিপাসা জুড়িয়ে সে পিয়েত্রোকে বললো, 'একটা সমস্যার সমাধান করতে আমি পারছি না।'

'কি সমস্যা?'

'যদি একদল ডাকাত এনফিল্ড্ রাইফেল নিয়ে চড়াও হয় আমাদের এই বরকন্দাজরা কি ক'রে আমাদের বাঁচাবে।'

পিয়েছো। হোহো ক'রে হেসে উঠলো।

'জেলখানায় কি তোমাকে পাগলের সঙ্গে থাকতে হ'তো ?' রাজু প্রশ্ন করলো।

বুজরুকও হাসলো। কিন্তু সে বললো, 'এনফিল্ড রাইফেল থেকে প্রতিমিনিটে ওস্তাদ বন্দুকবাজ কখনো-কখনো দুটো গুলি ছুঁড়তে পারে।'

'কেন, ফরাসী বিট্‌লোডার গুলি কিরকম মনে হয় তোমার ?'

'ভালো। কিন্তু মাত্র তিনটি আছে। একটি আপনার, একটি আমার, একটি রাজাভাই-এর।'

রাজু হাসতে-হাসতে বললো, 'ডাকাত এলে তিনটেই তোমাকে দেওয়া হবে, আলি খাঁ।'

রাজু হাতিতে ফিরতে-ফিরতে ভাবছিলো বুজরুকের কথা। প্রকৃত পক্ষে কেমন যেন একবগ্‌গা হয়েছে বুজরুক আলি জেলখানা থেকে বেরিয়ে। পাগল নয়। তার বুদ্ধিবৃত্তি কোথাও এতটুকু ভোঁতা হয় নি। বন্দুকের ব্যবসা ভালোই করছে। ইতিমধ্যে এদিকে-ওদিকে আরোও বন্দুক বিক্রি করেছে সে কয়েকজন সম্পন্ন গৃহস্থকে। বন্দুকের নেশা ধরেছে লোকের।

দূর থেকে ইঁটের স্তূপগুলো চোখে পড়ছিলো রাজুর। আট-দশ জন লোক ব'সে-ব'সে হাতুড়ি দিয়ে ইঁট ভেঙে-ভেঙে টুকরো করছে, সুরকি-কলের লোহার চাকা ঘুরছে বলদ দুটির টানে। স্কুলবাড়ির হলঘর উঠতে শুরু করেছে আটচালাটার পাশে। কত বড়ো হবে বলা যায় না এখনই। হরদয়ালের পরিকল্পনা, হরদয়ালই জানে। কিন্তু লোকটি বোধ হয় নিজের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় না ক'রে থামবে না।

স্কুলবাড়ির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে রাজু দেখতে পেলো, কেট তাকে

দেখতে পেয়ে তাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে নয়নতারাকে কি বলছে।

মাহুতকে হাতি থামাতে ব'লে রাজু সেখানেই নেমে পড়লো। মাহুত হাতি নিয়ে চ'লে গেল।

নয়নতারা বললো, 'এই এক-প্রহর বেলায় কে তোমাকে নামতে বললো— নট্ আই। ইউ গো ইয়োর ওন ওয়ে।'

রাজু বললো, 'অবাক করলে নয়ন, তুমি ঘটর-ঘটর ক'রে ইংরেজি বলছো। আমি তো এতদিনেও পারলাম না। বাট্ টু বিউটিস্ আর মাচ্ মেনি ফর্ এ ম্যান।'

কেট হেসে উঠলো। একটু থেমে বললো, 'রাজকুমার, নয়নতারার পাশে আমাকে সুন্দরী বলা তাকে অপমান করার মতো।'

হঠাৎ রাজুর কণ্ঠে সরস্বতী আশ্রয় নিলেন, সে বললো, 'মাতা, দুহিতা, পত্নী, ভগ্নি রূপে, হে নারী, তোমাদের সৌন্দর্যের হুকুমে পুরুষ জাতকে চালাচ্ছো। কেউ নয়নতারা, কেউ মাথার মণি।'

'এত!' বললো নয়নতারা।

নয়নতারা ও কেট খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

ঘরে ঢুকে রাজু পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলো। চৈত্রের দুপুর। আকাশে বাতাসে একটা মৃদু উত্তাপ। সে-উত্তাপে আলস্য আছে। স্নানে অবহেলা আসে। যাচ্ছি-যাবো ক'রে গড়াতে ইচ্ছা ক'রে আড্ডাটাকে আর-একটু চালিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়।

রাজু পিয়ানোর ডালা খুলে একটা স্বরলিপি সম্মুখে রেখে কতকগুলি ভারী ঝংকার তুললো।

ভ্রমরের পাখার আর মৌমাছির গুঞ্জনে এর সঙ্গে পার্থক্য আছে নাকি?

লাল চুলের গোছা নিজের কপাল থেকে সরিয়ে কেট জিগ্যেস করলো, 'সনাটা ?'

রাজু শুধু মোটা স্বরগুলি তুলতে-তুলতে বললো, 'বাজাও কেট। তুমি বোসো। আমি শুনি।'

কেটের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এল। ছোটো একটা টিপয় ছিলো হাতের কাছে, সেটা নিয়ে রাজুর গা ঘেঁষে ব'সে পিয়ানোয় হাত রাখলো। রাজু আর-একবার প্রথম দিকের মোটা স্বর বাজাতেই কেট চড়ার দিকের চাবিগুলিতে আঙুল চালালো। মোজার্টের স্বরলিপি সামনে। রাজু আবার খাদের দিকে বাজিয়ে এল, কেট মিষ্টি মধুর থেমে-থেমে-আনা স্বরে প্রতিধ্বনি তুললো চড়ায়। অপূর্ব লাগলো সে-বাজনা, শুধু নয়নতারার কাছে নয়, রাজু এবং কেটও আশ্চর্য হ'য়ে গেল। ঠিক যেন দু-জনে কথা বলছে, মোটা গলায় একজন অনুনয়-বিনয় করছে, আর-একজন মধুরকণ্ঠী কুপিতা দূরে স'রে যাচ্ছে। কখনো দু-জনের গলা মিলছে, স্বর মিলছে, কিন্তু আবার যেন ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে। কখনো মনে হ'লো দুটো প্রজাপতি, কখনো মনে হ'লো দুটি কপোত, কখনো-বা মনে হ'লো প্রায়ান্ধকার গাছের ছায়ায় একটি ছেলের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। তাদের কলহ আর মিটছে না।

বাজনা শেষ হ'লে গাল লাল ক'রে কেট উঠে দাঁড়ালো।

নয়নতারা বললো, 'আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম।'

রাজু বললো, 'তবুও তুমি শিখবে না ?'

নয়নতারা প্রসন্নমুখে বললো, 'রাজকুমার, সব কাজ কি সকলে পারে ?'

কাছে টেবিলের উপরে এক চুপড়ি ফল ছিলো। রাজু একটা আপেল তুলে নিয়ে কামড়াতে-কামড়াতে টেবিলের উপরে পা ঝুলিয়ে ব'সে বললো, 'তা বটে। কেট, তোমাকে একদিন নয়নের কাব্য পড়া শুনতে হবে।'

কেট বললো, 'কি কাব্য ?'

'যে-কোনো একটা।'

'আপনি তো আমাকে বলেন নি।'

নয়নতারা বললো, 'আপনি বুঝি তা জানেন না ? কোকিলার কাকবিনিন্দিত গলার স্বরও কোকিল সহ্য করে। পাশাপাশি থাকলে ও-রকম মোহ হয়।'

কেট বললো, 'আমি তো কোকিলা-গোষ্ঠীরই একজন। কিন্তু আপনার খুব খিদে পেয়েছে রাজকুমার। আপনাকে কয়েকটা ফল ছাড়িয়ে দেবো ?'

রাজু নিজে বিস্মিত ও লজ্জিত হ'লো— খ্রীস্টানের বাড়িতে ব'সে সে খাচ্ছে ? অন্যমনস্ক হ'য়েই আপেলটা সে খেতে আরম্ভ করেছিলো। জবাব দিলো, 'ছাড়াতে হবে কেন, এমনি খাচ্ছি।'

কিন্তু আড্ডা ভাঙতে হ'লো। রূপচাঁদ এসে উপস্থিত।

'কি রে ?'

'আজ্ঞে, রানিমা খোঁজ করছিলেন।'

'কেন রে ?'

'বেলা অনেক হ'লো, খালি হাতি ফিরে গেল। ছাতা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন রানিমা।'

'তা হ'লে চল। চলি কেট। যাবে নাকি নয়ন ?'

'চলো। বাগচী এখুনি ক্লান্ত হ'য়ে ফিরবেন।'

পথে বেরিয়ে রূপচাঁদ রাজুর মাথায় ছাতি ধ'রে পেছন-পেছন চলছিলো।

নয়নতারা রোদ-মাথায় পেছনে আসছিলো।

রূপচাঁদ বললো, 'মা, ছাতার তলায় আসুন। রোদে কষ্ট হচ্ছে।'

নয়নতারাকে বাধ্য হ'য়ে ছাতার তলায় আসতে হ'লো। প্রকাণ্ড ছাতা। লাল সিল্ক-এর উপর জরির কাজ করা।

রানী বললেন, 'কোথায় ছিলি রাজু? বেলা হ'লো, স্নান আহার নেই। শরীরের কি দশা করেছিস, দেখতে পাস নে?'

আদুর গায়ে দাঁড়িয়ে রাজু আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখলো। কাঁধ ও বুককে অত্যন্ত চওড়া ব'লে মনে হচ্ছে কোমরের তুলনায়। কিছুদিন আগে বুক, কোমর কাঁধের পরিমাপে এত পার্থক্য ছিলো না। ঠোঁটের উপরে গোঁফের রং কালো হ'য়ে উঠেছে, নীল-নীল নরম দাড়িতে গাল ও চিবুক ঢেকে আছে।

রানী বললেন, 'সময় মতো আহার, সময় মতো স্নান না-করলে পরে কষ্ট পাবি।'

'সময় মতোই সব করি।'

'তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিলো। এত বেলা ছিলি কোথায়?'

'তুমি ভেবেছো রোদ-মাথায় গাঁয়ের পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম? তা' নয়। পিয়েত্রোর বাড়িতে দাবা খেলার নিমন্ত্রণ ছিলো। বুজরুক আলি বরকন্দাজ নিয়ে দাবা খেলতে বলেছিলো। সে ভারী মজার খেলা।'

'তুই নাকি বাগচীমাস্টারের বাড়িতে যাস্?'

'তা' যাই, প্রায়ই যাই। এতক্ষণ সেখানেই কাটিয়ে এলাম।'

'ওরা তোর কর্মচারী, প্রজার সামিল; এত ঘন-ঘন ওদের বাড়ি যাওয়া ভালো দেখায়?'

'কর্মচারী হবে কেন? বাগচী তো হেডমাস্টার, শিক্ষার ব্যাপারে সে কারো কর্মচারী নয়। না, কর্মচারী নয়।'

'ওরা তো খ্রীস্টান; ওদের চাল-চলন আর আমাদের চাল-চলন তো এক নয়।'

'হুবহু এক। তুমি একদিন গিয়ে দেখে এসো, মা। কেটকে একখানা ভালো শাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। দেখবে কোনো পার্থক্য নেই।'

'যা, স্নান ক'রে আয়, আজ আমার ঘরে খাবি।'

'তখন কিন্তু ওদের রান্নাঘর থেকে এটা-ওটা আনিয়ে নিতে পারবে না।'

'না, তুই যা, দেরি করিস নে আর।' রানী হাসলেন।

বিকেলের দিকে রানী হরদয়ালকে ডেকে পাঠালেন।

'আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ। এইবার তোমাকে একটা কাজের ভার দেবো।'

'আজ্ঞা করুন।'

'একজন ভালো ঘটক চাই।'

'ঘটক? কি হবে, কার জন্যে?'

'তোমাদের রাজকুমারের বয়েস হয়েছে। আমি ভালো ঘটক চাই। সে যেন মূর্খ না হয় এবং মানুষ সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকা চাই। আজকালকার নতুন রাজা-মহারাজার ঘরে আমার কাজ হবে না। তোমার উৎসাহের একটু অভাব দেখতে পাচ্ছি!'

'এত কম বয়েসে বিয়ে দেওয়াটা ভালো ব'লে মনে করতে পারছি না।' আচ্ছা, রানিমা, ঘটকের খোঁজ করবো।'

আর ঠিক এমনি সময়ে রাজু বললো, 'নয়ন, এর পরদিন যখন ফরাসডাঙা থেকে খেলার নিমন্ত্রণ আসবে তোমাকে নিয়ে যাবো।'

সামনে দাবার ছক। ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করতে-করতে নীল গজের

মাথা ধ'রে গোনাগুন্‌তি তিন ঘর এগিয়ে দিয়ে বললো, 'সে-কথা পরে হবে রাজকুমার, কিস্তি-সামাল।'

রাজু নয়নতারার গলা চুল ঠোঁট প্রভৃতি থেকে তার চোখ ফিরিয়ে এনে দাবায় চোখ দিয়ে বললো, 'কী সর্বনাশ, তুমি ফাঁকি দিয়ে দু-এক চাল এগিয়ে দিয়েছো।'

রাজুর চালে নয়নতারার গজ ঢাকা পড়লো, তার একটি কিস্তি বেসামাল। রাজু বললো দাবার দিকে চোখ রেখে, 'এর পরদিন আরও বড়ো দাবার ছক হবে, আর রাজবাড়ির পদাতিক চালনা করবে তুমি হাতির পিঠে ব'সে।'

নয়নতারা চাল খুঁজতে-খুঁজতে বললো, 'ওরা বলবে, রাজার রাজ্যে পুরুষরা ভেরুয়া হ'য়ে গেছে, তাই।'

রাজু বললো, 'রাজবাড়ির লোকরা উত্তর দেবে, এ সামান্য খেলায় মেয়েলি বুদ্ধিই যথেষ্ট।'

রাজু দাবা থেকে চোখ তুললো, কিন্তু নয়নতারা তার বাঁ-দিকের তুরুকসওয়ারের আড়াই পায়ের দু-দিকের ঝোঁক বুঝে নিয়ে চাল দিয়ে বললো, 'অত গর্ব তো ভালো নয়, রাজকুমার। রূপচাঁদকে দিয়ে রানিমার কাছে ঘোড়া আর বন্দুক চেয়ে পাঠাতে হ'লো দেখছি।'

খেলা আর হ'লো না। রাজু বললো, 'কি বললে?'

নয়নতারা সম্ভবত কল্পনায় নিজের অশ্বারূঢ়া বন্দুকধারিণী মূর্তি প্রত্যক্ষের মতো দেখতে পেয়েছিলো। তার গালে লজ্জা নামলো, কিন্তু সে বললো, 'রাজকুমার, তোমার রাজ্যে যদি হামলা হয় আমি বোধ হয় বোরখায় মুখ ঢেকে পালাতে পারবো না।'

দাবার ছক সরিয়ে রাজু বললো, 'বুজরুক আলিকে তোমার অসাধারণ ব'লে মনে হয় না?'

'তার খেলাটা অবশ্য অভূতপূর্ব নয়। বাদশাহী আমলে মানুষ নিয়ে সতরঞ্চ খেলা হ'তো। খেলার হার-জিতে বাঁদী হস্তান্তর হ'তো।'

'তা হ'তো,' ব'লে রাজু একটু চিন্তা করলো। 'একদিকে দেওয়ান হরদয়াল অন্যদিকে পিয়েত্রো। দু-জনের পক্ষ থেকে দু-জন লোক গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগচীমাস্টার করছে ওষুধ বিতরণ, আর বুজরুক করছে বন্দুকি ব্যবসা।'

নয়নতারা চিন্তা করলো, তারপর ভ্রূ-দুটিকে কিছু বাঁকা ক'রে বললো, 'এই দুইয়ের মধ্যে নীলসাহেব ডান্‌কান নিজের অবস্থা ফিরিয়ে নিচ্ছে। সে নাকি জমিন্দারী খরিদ করার চেষ্টায় আছে।'

'তাই নাকি ?'

'তা হ'লে এ ডামাডোলের বাজারে লাভ কার ?'

সে আকাশ-বাতাসে চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় কিছু ছিলো অবশ্যই। নয়নতারা রাজুর একখানা হাত নিজের দু'খানি কোমলস্পর্শ হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'কেটকে জিগ্যেস করবো ? না, তার দরকার নেই।'

॥ উনিশ ॥

বাগচী যা বলে, তা' করে। চরণদাসকে সে তার কম্পাউণ্ডার করেছে। খ্রীস্টানের জল পাছে কাউকে খেতে হয়, কোনো রোগী রোগ-যন্ত্রণায় ওষুধ খেতে গিয়ে যদি সমাজে অপাংক্তেয় হবার যন্ত্রণাও অনুভব করে তার তুলনায় শুধু রোগ-যন্ত্রণা সুসহ। চরণদাসের বাইরের দিকের একটা ঘরে ডিসপেন্‌সারি তৈরি হয়েছে। কয়েকটি কাঠের বাক্সে তার ছোটো-ছোটো শিশি সাজিয়ে চরণদাস বাগচীর প্রেসক্রপসন অনুযায়ী ওযুধ দেয়। চরণদাসের ওষুধ দেবার জল সারারাত ফোটে, সারাদিন থিতোয়, পরদিন কাচের বড়ো-বড়ো বোতলে সেগুলো ভরে বনদুর্গা। কোনোদিন ওষুধ দিতে গিয়ে জল নেই দেখে চরণদাস ডাকে— 'বনদুর্গা, আর-একটা জল দিয়ে যাও তো।'

তার ঘরের বারান্দায় লম্বা দুটো বেঞ্চি পাতা, রোগীদের বসার জন্য। কখনো-কখনো অন্যথা হ'লেও সকালের দিকে প্রায়ই ঘণ্টাখানেক এখানে এসে বসে বাগচী।

একদিন সে হাসতে-হাসতে এক রোগিনীকে বলেছিলো— 'কি বলিস বুড়ি-মা, এখানে এখন আর জাত যাবার ভয় নেই, কেমন?'

সেই ডিসপেন্‌সারিতে এখন আড্ডা বসে, গোবর্ধনের পোস্ট-আপিসের আড্ডা উঠে এসেছে। গোবর্ধন কলকাতা থেকে এক সহচরকে লিখে একখানা পত্রিকা আনিয়েছে। তার মতো জ্ঞান চরণদাসের নেই। গোবর্ধন বলে, 'এ-পত্রিকা মেয়েদের জন্যেই। রাধা শিকদার আর কালিপ্রসন্নর। পড়তে দিস, হতভাগা, পড়তে দিস বনদুর্গাকে।'

'পড়বে কি রে? ও কি পড়তে জানে?'

'কৈলাসপণ্ডিতের পাঠশালায় ক-খ কি শেখে নি?'

'তা জানে।'

'তবে ?'

বনদুর্গাকে উঁচু-গলায় ডাকে গোবর্ধন, বনদুর্গা বেরিয়ে আসে। বই নিয়ে যায়। চরণদাস নিশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকে। কি-একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার মতো, দুঃসাহসের মতো মনে হয় যখন আড্ডার বন্ধু ক'টির সামনে বনদুর্গা হেসে-হেসে কথা বলে।

বন্ধুদের মনোভাবকে প্রীতির চোখে দেখলেও ঠিক ভদ্র বলা যায় না। বনদুর্গা যদি কম বয়সের হ'তো, যদি সে শিশু হ'তো তা হ'লে বোধ হয় তাকে নিয়ে ময়দার একটা তালের মতো লোফালুফি করতো সকলে। বনদুর্গা যেন তাদের বিজয়ের নিশানা। তাকে অবলম্বন ক'রে কম-বয়সীর দল সমাজের মাথাদের উপরে নিজেদের প্রমাণ করেছে। ইতিমধ্যে চরণদাসের অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত এক বন্ধু তাকে একটি শাড়ি কিনেও দিয়েছে।

সেই আসরে গোবর্ধন একদিন ঘোষণা করলো, 'আমরা সকলে খ্রীস্টান হই না কেন।'

'কেন, কেন, খ্রীস্টান হবি কেন ?'

আসর যতক্ষণ থাকলো কেউ কিছু বললো না। আড্ডা ভাঙলে গোবর্ধন নিচু-গলায় বললো, 'চরণ, তুই আমার বাল্যবন্ধু, প্রাণের প্রাণ, তোকে আমি বলতে পারি।'

'বল না !'

'তোর বৌ ধারে-কাছে নেই তো, খবরদার, যেন বৌকে বলবি নে।'

'না, তুই বল। তোর জন্য যে বৌ পেলাম, তার দাম কি তোর চাইতে বেশি ?'

'বিয়ে করতে চাই।'

'তার জন্য খ্রীস্টান হবি কেন?'

'নোলক-পরা, মূর্খ গবেট, কান্না-প্যাচপেচে একটা বারো বছরের মেয়েকে বৌ বলতে পারবো না।'

'তোরা তো কায়স্থ। কায়স্থদের ঘরে কি বড়োসড়ো মেয়ে পাওয়া যায় না?'

'না।'

'কিন্তু খ্রীস্টান হ'লেই যে পাবি এমন কি কথা আছে। জাত খোয়ানোটা আমি পছন্দ করি নে। তোর বন্ধু-বৌও করে না। তুই কিরকম মেয়ে হ'লে বিয়ে করিস, বল। আমরা খোঁজ করি।'

'শুনলে তোর ভয় লাগবে।'

'তোর অনেক ডাকাতে-কথা আমি জানি।'

'বনদুর্গার মতো যদি মেয়ে পাই বিয়ে করি।'

কথাটা শুনে চরণের মুখ মলিন হ'লো। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললো, 'বনকে তুই ভালোবাসিস গোব্‌রা?'

'দূর পাগল! সে আর-একজন। তাকে দেখি নি। তবে আমার কি মত জানিস? নোলক-পরা আদুরি কোনো কুমারী মেয়ের চাইতে শাদা কাপড় পরা নিরাভরণ অল্পবয়েসী বিধবারাই যেন বেশি আপন মনে হয়। তোর বনদুর্গার রূপের ঐশ্বর্য আমি চাই নে ভাই। তবে তার মতো দুঃখ-পাওয়া মেয়ে যদি হয়, তার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করি।'

চরণ ব'সে-ব'সে দুলে-দুলে ভাবলো। তার মনে হ'লো, কোথায় যেন শুনেছে কথাটা। একটা ফারসি বয়েৎ বোধ হয় আছে। শ্বেত করবী ফুলের সঙ্গে কে-এক কবি নিরাভরণার তুলনা দিয়েছে।

চরণ হেসে বললে, 'তুই খ্রীস্টান হ'। কিন্তু ভাই, বিয়ে করার আগে আমাদের বলিস। আমি আর বনদুর্গা দু-জনে পছন্দ ক'রে দেবো।'

গোবর্ধন বললো, 'কিন্তু যা বললাম তা যেন কখনো বনদুর্গা শোনে না। তোর মতো যদি যা-তা ঠাওরায় আমাকে, লজ্জায় অপমানে মেয়েদের মতো জলে ডুবে মরতে হবে।'

চরণ বললো, 'একটু ধৈর্য ধর। আমি বুঝতে পারছি তোর রুচি-মাফিক মেয়ে হিন্দু-সমাজে পাওয়া কঠিন।'

ডিস্‌পেনসারি-ঘরে চরণ একদিন বাগচীকে বললো, 'মাস্টারমশাই, আমাদের গোবর্ধন খ্রীস্টান হ'তে চায়।'

'কেন? খ্রীস্টান হবে কেন? ড্যাম্ ফেলিওর, দ্য হোল্ প্রশেস্ ইজ এ ফেলিওর। গাধা ঠকা, সারা ব্যাপারটাই ঠকার ব্যাপার। ছাখো হে, তোমার বন্ধুকে ব'লে দিয়ো নিজে আমি খ্রীস্টান হ'তে পারি নি। বড়ো কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার বন্ধুর মেজাজ কেমন, তোমার মেজাজ কেমন? যদি কেউ তোমার বন্ধুর এক গালে চড় মারে, আর-এক গাল বাড়িয়ে দিতে পারবে?'

'তা দেবে কেন?'

'ধরো, তোমার বউকে কেউ চুরি করলো, তাকে খুন না ক'রে তুমি থামবে?'

'আজ্ঞে না, বোধ হয় খুন করা কিংবা খুন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।'

'পথে এসো বাছা। বন্ধুকে বুঝিয়ে বোলো। আমি বুঝছি খ্রীস্টান হ'য়ে কি আহাম্মুকি করেছি। ধর্মের নাগাল পেলাম না। ক্রাইস্ট যা বলেছেন সেগুলি কতকগুলি থিয়োরিমাত্র, ক্রাইস্ট ছাড়া আর কেউ পারে? এ-সব নিজের মনের কথা, কাউকে বলতে নেই। হঠাৎ ব'লে ফেললাম তোমাকে।'

বাগচী তার টাট্টুতে চেপে বললো, 'চরণ, তুমি এক কাজ করো তো বাপু। নতুন শিল-নোড়াটায় গাঁদাপাতা ছেঁচে একশিশি রস ক'রে রাখো। খানিকটা তুলো জোগাড় ক'রে রেখো, আমি কিছুক্ষণ বাদেই আসছি।'

দু-তিন ঘণ্টা বাদে বাগচী একা-একা ফিরে এল।'

'কেউ এল না তো?'

'দরকার হ'লো না। ডান্‌কান নিজেই ব্যবস্থা করেছে। লোকটা বড়ো ভালো হে, চরণ। সে ভুল স্বীকার করলো। বললো, চাবুক মারতে গিয়েছিলো, চাবুকের চামড়ার লেস্ গায়ে না লেগে চাবুকের পেতল-বাঁধা ডাঁটটা লেগে গেছে। আমি বললাম—মারধোর করা ভালো নয়। সে বললো—নিশ্চয়, ভালো কে বলে। প্রয়োজনে করতে হয়। তা'ও নিজেই লোকটার কপালে কি-কি ওষুধপত্র দিয়ে বেঁধে দিয়েছে।'

চরণ ফস্ ক'রে ব'লে বসলো, 'ডান্‌কান ভালো নয়, ডাকাত! তবে এর আগের সাহেবের আমলে মারধোর বেশি ছিলো। এর আমলে অন্য ব্যবস্থা। এ কৃষকদের জমিছাড়া করছে। তারা জেরবার হ'লো।'

'আহা, কি বলো তুমি চরণ!'

বাগচী অসন্তুষ্ট মুখে বিদায় নিলো।

চরণদাস সেদিন বিকেলবেলায় নিজের জমির তদারক ক'রে ফিরছিলো, সদর-নায়েবের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল তে-মাথার কাছে, যেখানে রানীর কাছ থেকে জমি চেয়ে নিয়ে সদর-নায়েবের স্ত্রী ছোটো-খাটো একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। বাদ্যভাণ্ডও হয় নি, হাঁক-ডাকও হয় নি। সদর-নায়েব বলেছিলো— সর্বনাশ কোরো না গিন্নি, যা করো ধীরে-সুস্থে করো, চোখে প'ড়ে যেয়ো না। দেওয়ানজি করছেন ইস্কুলের পীতিষ্ঠে, সেখানে সাগরপারের শিবোদুগ্‌গা।

নায়েব-গিন্নি ছলছল চোখে বলেছিলো— বড়োলোকের ছেলের বিয়ে হয় ব'লে গরিবের ছেলের বিয়েতে ঢোল-ডগরও বাজবে না?

কিন্তু ভারী কৌতুক হয়েছিলো একটা। বলতে হয় তাই রানীকে একবার মুখ ফুটে বলেছিলো নায়েব-গিন্নি। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের মাথায় দুধ ঢেলে ফিরতেই নায়েব-গিন্নি দেখলো আর-একজন কে শাদা-মাটা গরদের থান প'রে শিবের মাথায় তার ছোটো ঘটিটা থেকে গঙ্গাজল ঢালছে। কী সর্বনাশ, রানিমা!

'গোল কোরো না বড়োবৌ, চুপ ক'রে এসেছি চুপচাপ চ'লে যাবো।'

একটা মধুর হাসিতে কথা শেষ ক'রে মস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে রানী চ'লে গেলেন।

সদর-নায়েব দাঁড়িয়ে মন্দিরের পূজারী-ছোকরার সঙ্গে কথা বলছিলো। চরণদাসকে দেখে নায়েব বললে, 'চরণ, দাঁড়িয়ো, কথা আছে।'

পূজারীর সঙ্গে কথা শেষ ক'রে সদর-নায়েব চরণকে বললে, 'চলো, হাঁটতে-হাঁটতে কথা হবে। আচ্ছা, গোবর্ধন তো তোমার বন্ধু, তুমিই সেই বনদুর্গার স্বামী না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কাছে খবরটা পাবো তা হ'লে। তুমি না-জানলেও আলাপে-টালাপে বনদুর্গা জানতে পারবে। গোবর্ধনের মামি খুব ধরেছে, ছোঁড়ার বিয়ে দেবে। বুঝতেই তো পারো, ছেলেপিলে হয় নি বেচারার, কি নিয়ে থাকে। ছেলে বলতে ওই ছোঁড়া। তা আজকাল ভালো হয়েছে। ডাকঘর আর ইস্কুল দুটো কাজ মিলিয়ে তিন কুড়ি টাকা মাইনে পাচ্ছে। কিন্তু ওই মামিই মাথা খেয়েছে। আমাদের বাপু অত আনখাই ছিলো না, ও তো আসনাইও নয়। বাপ বললো, বে করো। করলাম। তোমাদের মামির তখন আট আর আমার বয়েস

একুশ হবে। তারপর এই দু-কুড়ি বছর কাটালাম এক সঙ্গে। খারাপ কাটালাম কি ?'

'গোবর্ধনের বিয়ে দিতে চান ?'

'তা অন্যায়ই বা কি ক'রে বলি। ছেলে সমর্থ হয়েছে। বাইশ-তেইশ বোধ হয় পার হ'লো।'

'বৌ আসুক— এ আমরাও চাই, কিন্তু চট ক'রে কোথাও কথা দেবেন না যেন।'

'তা হ'লে তো বাপু, ওর মনের কথা কিছু-কিছু জানো মনে হচ্ছে।'

'তা জানি।'

'এই মরেছে, বিয়ের কথা খুলে-খেলে বলেছে! হায় হায়, কোন্ গো-ঘাটায় বা মাথা মুড়িয়েছে রে।'

সদর-নায়েব দুর্ধর্ষ ব'লে খ্যাত। ডান্‌কানের আগেকার মরেলগঞ্জের কুঠির ফ্যাক্টর মামলা করতে গিয়ে তার সেই দুর্ধর্ষ রূপের সাক্ষাৎ একবার পেয়েছিলো। দিনকে রাত, রাতকে দিন হ'য়ে গেল দেওয়ানিতে। সেই নায়েবের বিচলিত ভাব দেখে চরণদাসের হাসি পাচ্ছিলো। কিন্তু যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে বললো, 'না, সে কোথাও মাথা মুড়োয় নি। তবে জোর ক'রে কিছু করতে যাবেন না। ধীরে-ধীরে আমি কথাটা তুলে দেখবো। আপনি পাত্রী ঠিক করার সময়ে মেয়ের যেন একটু বেশি বয়েস হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।'

'কুলীন কায়স্থের ঘরে ধাঘী মেয়ে কোথায় পাবো, বাপু। সে আর হবে না। আমি আজ তোমাদের মামিকে খুব ধমকে দেবো। লোকে কথায় বলে— যম জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপ্‌না। তুমি কি বলতে চাও, তোমরা গিয়ে মেয়ে দেখে পছন্দ করলে তবে আমরা কথা ঠিক করবো ?'

'তা হ'লেই যেন ভালো হয়।'

'নতুবা ?'

'নতুবা, ধরুন, গোবর্ধনকে কিছুদিন কলকাতায় রেখেই গোল হয়েছে যে। কলকাতায় আজকাল জাত-খোয়ানোটা ডাল-ভাত। লেখাপড়া-জানা একটু বেশি-বয়সের মেয়ে ছাড়া ওর মনে ধরবে না।'

সদর-নায়েব হায়-হায় করতে-করতে চ'লে গেল।

মাসখানেক পরে এক সন্ধ্যায় গোবর্ধন এসে চরণকে বললো, 'বন্দুক কিনেছি রে।'

'অত টাকা কোথায় পেলি ? পাঁচ শ' না দাম চেয়েছিলো ?'

'পেয়েছি। মামিকে বললাম, খেতে বুনো শুয়োরের উৎপাত। তবে অত লাগে নি।'

'তোর মামার সঙ্গে আলাপ হ'লো। বিয়ের কথা বলছিলেন।'

'তুই কিছু বলেছিস ?'

'বললাম চট ক'রে কোথাও কথা যেন না দেন। এই রকম সব কথা হ'লো।'

'ভালো করেছিস ব'লে।'

'তোর পছন্দ তো জানতে পেরেছি, না ব'লে উপায় কি ?'

'সেজন্যে নয়। এখন বিয়ের কথা থাক।'

চরণ ক্ষুণ্ণ হ'লো। গোবর্ধন মত বদলায় বটে কথায়-কথায়, কিন্তু পুরনো মতে ফেরে না। অর্থাৎ যখন সে বলেছিলো বড়ো-বয়সের মেয়ে বিয়ে করবে তখন সে কোনোদিনই আর অল্প-বয়সের একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে আনবে না এ-সম্বন্ধে চরণ নিশ্চিত ছিলো। বিয়েতে যখন আগ্রহ নেই বলেছে তখন তার মনের মতো কাউকে পেলেও এখন বিয়ে

করবে না এটাও নিশ্চিত। চরণের আবার মনে হ'লো, হয়তো তার বন্ধু বনদুর্গাকেই ভালোবেসেছে। তাই বলছে বিবাহ-ই সে করবে না। চরণ চুপ ক'রে রইলো শুধু বেদনাটাকে অনুভব করার জন্য।

সহসা গোবর্ধন বললো, 'চরণ, তোর বউকে ডাক, কিছু খাবার আনতে বল। সকালবেলায় বেরিয়েছিলাম, দামদস্তুর ক'রে এই গ্রামে ফিরলাম।'

চরণদাস উঠে গিয়ে কিছু মুড়ি ও নারকেল নাড়ুতক্তি নিয়ে এল।

গোবর্ধন মুড়ির কাঠাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে খেতে-খেতে বললো, 'তোর বউ এল না? আমার পছন্দের কথা তাকে বলেছিস বুঝি?'

চরণ অপরাধীর মতো মাথা নিচু করলো।

'ভালো করিস নি ব'লে। বেচারা আর কোনোদিনই আমার সঙ্গে সহজ হ'য়ে কথা বলতে পারবে না। তুই বড়ো বোকা।'

চরণ বললে, 'দাঁড়া, ডেকে আনি।'

'থাক, থাক, আজই দরকার নেই। পরে এক-সময়ে তাকে বুঝিয়ে বলিস। তার চাইতে একটা মজার কথা শোন, একটা ঘোড়াও কিনেছি।'

'হেডমাস্টার টাট্টু আর তুই ঘোড়া?'

'না রে, দেখে পছন্দ হ'য়ে গেল। আলি খাঁ গতিয়ে দিলো। এখন ভাবছি, চ'ড়ে দেখি স্বাস্থ্যটা ভালো হয় কিনা। রাজকুমারের স্বাস্থ্য দেখেছিস, আমাদের প্রায় দ্বিগুণ দেখায়।'

মুড়ি আর জল খেয়ে তারপর বনদুর্গার হাতের সাজা পান চিবোতে-চিবোতে গোবর্ধন চ'লে গেল।

চরণ চুপ ক'রে বসেছিলো, বনদুর্গা এসে বললো, 'পোস্টমাস্টার এসেছিলো বুঝি? তা বললে না কেন, ছানার পায়েস করা ছিলো।'

চরণ বললো, 'তোমার আর গোবর্ধনের মধ্যে প'ড়ে আমি-ই বোকা হ'য়ে গেছি। তখন ভাবলাম খাবার চাইতে গিয়ে তার নাম করলে যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও। এখন দেখছি তাই বলাই ভালো ছিলো।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বনদুর্গা বললো, 'চরণ, আমি একটা মানৎ করেছি। একটু খরচ করতে হবে। হাতের কাছে অন্য কোনো ঠাকুর না পেয়ে নতুন পিতিষ্ঠে করা শিবকেই বলেছিলাম।'

'কি মানৎ, কেন ?'

'তুমি শুনে হাসবে না তো ? মনে-মনে বলেছিলাম, সেদিনকার সে-সব কথা বলার পর যদি পোস্টমাস্টার আবার আসে ঠাকুরকে বাতাসা ভোগ দেবো।'

চরণ মানতের হেতু ও উপকরণ শুনে হেসে ফেললো।

'ব্যবস্থা ক'রে দেবে তো ?'

'দেবো। পূজারীকে গিয়ে বলবো।'

আবাল্য বন্ধুর জন্য চরণের কষ্টও হ'তে লাগলো।

কিন্তু বৈশাখ যেমন নির্মম হ'য়ে চৈত্রের মন্থর বসন্তকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমন ক'রে পোস্টমাস্টার গোবর্ধন একদিন এল।

ডিস্‌পেনসারি-ঘরটায় চরণ একা ছিলো, গোবর্ধনের গলার সাড়া পেয়ে বনদুর্গাও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। দীর্ঘ দু-তিনটি পল সে ভাবলো কি ব'লে গোবর্ধনকে সম্বোধন করা যায়, কিছু মনের মতো খুঁজে না পেয়ে চরণকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'তোমরা ভেতরে এসে বোসো। দু-জনেই তো আছো।'

ভেতরে ব'সে একথা-ওকথার পর চরণ বললো, 'তোর মন ভালো নেই, গোব্‌রা, তোর মুখটা থমথম করছে।'

গোবর্ধন লুকানোর চেষ্টা করলো না। সে যা বললো সংক্ষেপে তা এই রকম :

সদর-নায়েব কয়েকদিন আগে তাকে কতকগুলো পুরনো চিঠি পড়তে দিয়েছিলো। তার মধ্যে অনেকগুলি ছিলো গোবর্ধনের বাবার লেখা। গোবর্ধন তার বাবাকে দেখে নি। মুর্শিদাবাদের কাছে বাড়ি ছিলো এই জানতো। খুব বাল্যে গোবর্ধন তার মাকে দেখেছে। তিনি মাঝে-মাঝে কাঁদতেন একথা গোবর্ধনের মনে আছে। বাবার লেখা চিঠি পেয়ে গোবর্ধনের খুব আনন্দই হয়েছিলো। কিন্তু একটি চিঠি প'ড়ে তার সব আনন্দ পুড়ে গেছে। চিঠিতে একটি ঘটনার উল্লেখ ছিলো। গোবর্ধনের বাবা তার শ্যালককে লিখেছিলেন পত্রবাহকের সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হ'তে, গোবর্ধনের মাকে তাঁর বাপের বাড়ি এই গ্রামে নিয়ে আসার জন্যে। বার-বার দেরি করতে নিষেধ ক'রে শেষ লাইনে লিখেছেন গোবর্ধনের বাবা : দেরি করলে কি হবে জানি না। কয়েক লাইন কাটাকুটি ক'রে অবশেষে আবার লিখেছেন : দু-পুরুষ ইংরেজ সেবার ফল ফলেছে, প্রকাশ্যে বাজারের রাস্তায় রায়তদের সম্মুখে কুঠির ছোটো সাহেব—। এই জায়গাটায় চিঠিতে লেখা কয়েকটি কথা কাটা। তার পরে আবার পড়া যায়— এর পরে বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই। ঘটনার কারণও তোমার জানা দরকার—এই ব'লে গোবর্ধনের বাবা লিখেছেন : আমার অপরাধ, কতকগুলি মাতাল গোরা—দোল পূর্ণিমার রাত্রিতে দোলমঞ্চে উঠবার চেষ্টা করেছিলো, আমি তাদের বাড়ি থেকে বার ক'রে দিই।

ঘটনাটা বর্ণনা ক'রে বোকার মতো হেসে গোবর্ধন বললো, 'কথাটা মামাকে বলতে তিনি চিঠিটা ফেরৎ নিয়ে বলেছেন— চিঠিটা তোর হাতে পড়া উচিত হয় নি। বাবা আমার কাছে অপরিচিত একজন দত্তমশাই মাত্র, কিন্তু, চরণ, চিঠিটা পড়ার পর থেকে এই ক'দিন মাঝে-মাঝেই

মনে হয়েছে, বাবার অকালমৃত্যুর কারণ কি ওই অপমান? তিনি কি আত্মহত্যা করেছিলেন?'

'এ-সব কথা মনে ক'রে কষ্ট পাবি কেন?'

'থেকে-থেকে অত্যন্ত বিদ্বেষ হচ্ছে। যেন ব্যাপারটা এইমাত্র ঘটলো ব'লে মনে হচ্ছে।'

'তোর মন ভালো নেই।'

'না, না, মন খুব যে খারাপ হয়েছে তা-ও নয়। মন খারাপ হ'লে তো মানুষ ভেঙে পড়ে, কই সে-রকম কিছু হচ্ছে না। অনেক পুরনো কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে। বনদুর্গার প্রথম বিয়ের কথা মনে আছে?'

বনদুর্গা ও চরণদাসের মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল।

'না, মুখ অমন করিস কেন। সে বেচারা মৃত্যুকালে কিশোর ছিলো, তোর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আর তা ছাড়া আমার মত তো জানিস— বনদুর্গা তাকে স্মরণ ক'রে ব'সে থাকবে এমন মত‌ও নয় আমার। তোরা যদি তার এককালীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে চোখ বুঁজে থাকতে চাস তা হ'লেই ঠকবি। বরং আর-দশজনের মতো সে-ও ছিলো, এটা দু-জনের মধ্যে খোলাখুলি মেনে নেওয়াই ভালো। সে-সব কথা নয়। সে-বেচারাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ডান্‌কানের আগের এক সাহেব তার নীলকুঠিতে জোর ক'রে খাটাতো— সেই কথাই মনে পড়ছে।'

মনে হ'লো বনদুর্গা কিছু বলবে। চরণ বোকার মতো ইতিউতি করতে লাগলো।

প্রেম নয়, তার কাছাকাছি অন্য কোনো অর্ধস্ফুট বৃত্তিও নয়। একটা উত্তাপ বিকীর্ণ করতে লাগলো যেন গোবর্ধন নিঃশব্দে ব'সে থেকে।

খানিকটা সময় পরে গোবর্ধন বললো, 'একটা পান দাও, বনদুর্গা, উঠি।'

॥ কুড়ি ॥

সদর-নায়েব গিয়েছিলো জেলার সদরে মোকদ্দমার তদবিরে। নদীর এ-পারে এসে সে পালকিতে উঠতে যাবে এমন সময়ে থমকে দাঁড়ালো। খালি টমটমটায় ডান্‌কান এসে চাপলো। ডান্‌কান আগেই নদী পার হয়েছিলো, বোধ হয় সহিসের ঘোড়া জুততে দেরি হচ্ছিলো ব'লে পায়চারি করছিলো।

নায়েব বেহারাদের বললো, 'দাঁড়া, সাহেব আগে গাড়ি হাঁকিয়ে যাক।'

কিন্তু টমটমে ব'সে ডান্‌কান ডাকলো, 'হাল্লো নায়িব।'

'হুজুর।'

'ইধর আও।'

নায়েব টমটমের কাছে যেতেই বললো, 'উঠো, উঠো। চোলো একসাথে যাই।'

'হুজুর।'

'ডরো মৎ।'

নায়েব করুণ নয়নে পালকির বেহারাদের দিকে তাকালো, কথা বলতে সাহস হ'লো না। অবশেষে মরিয়া হ'য়ে বললো, 'দেখিস বাপারা, অন্তত রসকদম্বগুলো যেন গিন্নির কাছে পৌছয়।'

সে নিজে পৌছতে পারবে কিনা এ-বিষয়ে তার কিছু সন্দেহ হয়েছিলো।

ডান্‌কান নিজে টমটম চালাচ্ছে। সকালের প্রথম দিকটায় তার বোধ হয় মনটা ভালো ছিলো, সে শিস্ দিতেও লাগলো। এক-সময়ে সে নায়েবকে বললো, 'নায়িব, টুমি জানো, টোমাদের মাস্টার কি আছে?'

'আজ্ঞে না, তা জানা নেই।'

'ওটা খ্রীস্টান না আছে।'

'হুজুর!' নায়েব দৃশ্যতই অবাক হ'লো।

'সেই কথা বলার কারণ টোমাকে টমটমে টুললাম। ওটা ডেভিল আছে। ডেভিল চেনো?'

'আজ্ঞে না, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি।'

'গুড, ভেরি গুড। ইউ আর এ জেনুইন হিণ্ডু।'

অতঃপর ডান্‌কান তার ভাঙা বাংলায় বিবৃত করলো কি ক'রে সে খবর নেবার চেষ্টা করেছে, অবশেষে আজ সহসা কি ক'রে এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়ে গেছে তার। সেই সাহেব বলেছে— এবং নায়েব বোধ হয় জানে সাহেবরা মিথ্যা ব'লে না— কেটের বাবা এক পাদ্‌রি ছিলো যাকে শুধু পাদ্‌রির পদ থেকে নয়, ইংরেজ-সমাজ থেকেও বহিষ্কৃত করা হয়েছিলো তার অখ্রীস্টানি মতের জন্য। বাগচী তারই শিষ্য। এবং বাগচীও খ্রীস্টান নয়। সে চার্চে যায় না, সে রবিবারে কাজ করে, সেদিন বেশি ক'রে ছাত্র পড়ায় এবং বিশেষ ক'রে সেদিনটায় সে রোগী দেখে বেড়ায়। সে ভগবানেও বিশ্বাস করে না। সে হিন্দুদের চাইতেও খারাপ। এখন বলো, সে কিরকম লোক হ'তে পারে।

'সে কি স্যার, সে কি নাস্তিক?'

'ইয়েস্।'

'তার কি নিরীশ্বরবাদ?'

'ইয়েস।'

'সাংখ্য-দর্শনের লোক নয় তো স্যার? তারা আবার ঈশ্বরকে অসিদ্ধ ব'লে ঘোষণা করে। না কি চার্বাকপন্থী?'

এবার ডান্‌কান 'ইয়েস্' বলার আগে থামলো। কি জানি কি বলছে

নায়েব। সে বললো, 'পণ্টি বুঝি না। পনি চড়ে ও। কিণ্টু ডেভিলস্ ইম্প্।'

নায়েব টমটমের দোলায় দুলতে-দুলতে ভাবতে লাগলো। মজার সংবাদ তো! একজন খ্রীস্টান বলছে, বাগচী খ্রীস্টান নয়। লোকটা দেখছি বর্ণচোরা আম। নায়েব কিছুক্ষণ পরে বললো, 'তা যদি না হবে, স্যার, যদি বাগচী খ্রীস্টান না হবে তা হ'লে—'

নায়েব কথাটা গিলে ফেললো। সে শুনেছিলো ইংরেজরা মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা করে না, বিশেষ ক'রে মেমসাহেব সম্বন্ধে। সে বলতে যাচ্ছিলো, তা হ'লে কেটকে কি ক'রে বিয়ে করলো বাগচী, কিন্তু সাহস হ'লো না।

ডান্‌কানের মুখ লাল হ'লো। বোধ করি কথাটা আন্দাজ করতে পেরেছিলো সে, বললে, 'টুমি বাগচীর বিবাহের কথা বলছো?'

'হুজুর, ঠিক তা নয়, তবে—' নায়েব সাহেবকে বিচলিত হ'তে দেখে ভয়ে ঢোক গিললো কিন্তু মনের তলায় কোথায় যেন খুশিও হ'লো।

'কেট সেই গড্ ফরসেকন্ সাহেবের কন্যা। সমাজে উহার বিবাহ হয় নাই সেই জন্য। নটুবা একটা হিণ্ডুকে কোনো ইংরেজ-মহিলা বিবাহ করে?'

'তা' ঠিক, তা' ঠিক। গড্ ফরস্কিন্‌সাহেব যে অত্যন্ত অন্যায় করেছে তাতে আর সন্দেহ কি।'

'ইহাতে আরোও গোলমাল আছে। আমি সংবাদ নিবো।'

টমটমের ঘোড়ায় চাবুক কষলো ডান্‌কান।

আরো কিছুদূর গিয়ে ডান্‌কান বললো, 'টোমাদের সমাজ থেকে যে-মহিলা বাহির হ'য়ে যায় সে যদি কোনো বাগডি-ডোম বিবাহ করে?'

'সমাজ থেকে বেরিয়ে গেলে সে সবই পারে।'

'বাগচীকে আমরা বাগডি মনে করি।'

সাহেব নিজের রসিকতায় হোহো ক'রে হেসে উঠলো। যেটুকু সংবাদ দেবার জন্য ডান্‌কান ছটফট করছিলো, সেটুকু তার দেওয়া হয়েছিলো। মরেলগঞ্জের তখনো ক্রোশ দু-এক বাকি। টমটমের গতি কমিয়ে ডান্‌কান বললো, 'নায়িব, টোমার গ্রাম তো কাছেই আছে।'

'তা' হুজুর ক্রোশ তিন-চার হবে।'

'ভালো আঁছে, আমি টমটম থামাই, তুমি নামো।'

ডান্‌কান লাগাম ক'ষে টমটম থামালো।

সদর-নায়েব টমটম থেকে নেমে পড়লো। টমটম ধুলো উড়িয়ে চ'লে গেল।

নায়েবের বয়স হয়েছে। সেরেস্তায় ব'সে-ব'সে কাজ ক'রে বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে দেহে মেদও হয়েছে। সামনে দুপুর এবং চার ক্রোশ পথ। অন্য দিন হ'লে হয়তো নায়েব বলতো— বড়োর পীরিতি বালির বাঁধ, কিন্তু আজ তার সে-সব কথা তৎক্ষণাৎ মনে হ'লো না। বাগচীর সম্বন্ধে যে-খবরগুলি সে শুনেছিলো সেগুলি মাথায় রিমঝিম করতে লাগলো।

তাই বলো, না হ'লে খাস-ইংরেজের অমন সুন্দর মেয়ে— সে কিনা ভেতো বাঙালির গলায় ঝোলে। না-হয় দু-পাতা ইংরেজি পড়েছে, তাই কি ওটা সম্ভব হয়। ধরতে গেলে কেন, প্রকৃত পক্ষে ইংরেজরাই দেশের রাজা। লোকটা তা হ'লে নাস্তিক। আর তার সঙ্গেই গোবর্ধনের ওঠা-বসা। তা বাপু একদিকে ভালো, খ্রীস্টান নয় তো।

এই কথা কয়টি নানাভাবে নানা দিক দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চিন্তা ক'রে ক্রোশটাক পথ পার হ'লো নায়েব।

কিন্তু তার পরই কষ্ট অনুভব হ'তে লাগলো। মনে-মনে ডান্‌কানের চোদ্দপুরুষের হিন্দু শাস্ত্রমতে সদ্‌গতির ব্যবস্থা করতে লাগলো। কেন রে

বাপু সেধে টমটমে তুললি ? তুললি যদি, আমার কালো রং-এ কি তোর ঘোড়া ভয় পেতো আর দু-ক্রোশ পথ গেলে !

দুপুরের পর সদর-নায়েব স্ব-ভবনে পৌঁছলো। গিন্নি চোখের জল মুছতে-মুছতে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলো।

'সাহেবদের সঙ্গে কেন বিবাদ করতে যাও ?'

'আমি কি বিবাদ করতে গেলাম !'

'বিবাদ নয় তো কি ? বিবাদ না করলে তোমাকে গ্রিফ্‌তার করে ?'

নায়েব বললো, 'তা করে নি। লোকটা অতিশয় পাজি নতুবা ঘোর উন্মাদ।'

'কোন লোকটা ?'

'ওই ডান্‌কান। নতুবা আজেবাজে কথা বলার জন্য একজন লোককে এত কষ্ট দিতে পারে ! সেধে জামাইয়ের মতো টমটমে তুলে মাঝপথে নামিয়ে দেয় কেউ পাগল ছাড়া ! বিবাদ করি নি, দাঁও পেলে একবার দেখিয়ে দেবো।'

আহারাদির পর নায়েব বললো, 'বড়ো-বউ, গোবর্ধনকে একটা কথা ব'লে দিয়ো। তার বাগচীমাস্টার কোনো ধর্মই মানে না। সে একটা ম্লেচ্ছ।'

'সে আর নতুন খবর কি ?'

'নতুন নয় ? তোমরা তো জানতে খ্রীস্টান। এখন শুনছি, সে খ্রীস্টান নয়। ঈশ্বরই মানে না।'

সন্ধ্যার পর দেওয়ানকে মামলার কথা বোঝাতে গিয়ে সদর-নায়েব এই কথাটা আর-একবার তুললো। নায়েবের বক্তব্য শুনে হরদয়াল

বললো, 'আপনারা জানতেন না বুঝি? বাগচী আমাকে প্রথম দিনেই বলেছে, সে ইউনিটারিয়ান মতাবলম্বী। কোনো চার্চে সে যায় না। সাধারণ খ্রীস্টান নয়।'

'এটা আপনার জানা ছিলো, আজ্ঞা?'

'তা ছিলো বৈকি। শিক্ষকের পক্ষে কোনো বিশেষ ধর্মের সংস্কারগ্রস্ত না হওয়াই ভালো। আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না, কলকাতার এক-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ডিরোজিও নিজে খ্রীস্টান ছিলেন, অথচ তাঁর ছাত্ররা প্রায় সকলেই এক-সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান ছিলো।'

চারিদিকে কাছারির আমলারা ছিলো। কেটের কথাটা নায়েব তখন-তখন বললো না। দেওয়ান কাছারি থেকে তার বাড়ির দিকে রওনা হ'লে সুযোগ মিললো, দেওয়ান পালকিতে চাপলো না।

তখন নায়েব তার সঙ্গে-সঙ্গে যেতে-যেতে বললো, 'ডান্‌কান বললে ওদের বিবাহের ব্যাপারটা ঠিক—'

'কি হয়েছে?'

'কেট নাকি সমাজের বাইরের মেয়ে, তাই।'

দেওয়ান কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, তারপর বললো, 'আপনি একটা ব্যাপার ধরতে পারেন নি, নায়েবমশাই। ডান্‌কান বাগচীর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ। এর আগে যেখানে বাগচী ছিলো সেখানেও কয়েকজন য়ুরোপীয় তার ক্ষতি করার চেষ্টা করতো। এ সব আমার একজন লোক কলকাতা থেকে লিখেছে। তবে তারা এমন মেয়েলি কলঙ্ক রটানোর চেষ্টা করে নি। বিদ্বেষের কারণটা কি বুঝতে পেরেছেন? কলকাতায় থাকলে ধরতে পারতেন সহজে। ইংরেজ-মহিলা বিয়ে ক'রে সাধারণের চোখে বাগচী প্রমাণ ক'রে দিয়েছে ইংরেজরা অতিমানব নয়। তারা গুণপনায় বাঙালীর চাইতে বড়োও নয় সবক্ষেত্রে।'

নায়েব তার পদের উপযুক্ত চাল চাললো। গোবর্ধনের বিবাহ সম্বন্ধে বিশিষ্ট মতের জন্য বাগচীকে দায়ী ক'রে নিয়ে ডান্‌কানের দেওয়া খবরটা কানে লাগানোর চেষ্টা সে করেছিলো। সেটা যখন হ'লো না, হরদয়াল যখন বাগচীকে সমর্থন করলো তখন হরদয়ালের মনোভাব ডান্‌কানের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিলো ডান্‌কানের বাঁদুরে রসিকতার প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য। সে বললো, 'নীল-সাহেবটার জিভকে শাসন ক'রে দিতে হয়।'

'দেখা যাক।'

নায়েব ফিরে এসে তার গৃহিণীকে হরদয়ালের মতামতও জানালো। সব কথা ব'লে শেষে বললো, 'একটা কথা মনে রেখো বড়-বউ, আমাদের দেওয়ান বাগচীর আশ্রয়দাতা এবং তার যে-কোনো বিপদেই তার পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু নীলে বাঁদরটার বিরুদ্ধে লাগিয়ে এসেছি।'

নদীর ঘাটে কথাটা নায়েব-গৃহিণীর মুখে দু-একজন শুনলো না এমন নয়। কলঙ্কের মতো এত দ্রুত সঞ্চরণশীল আর কি আছে।

একদিন সকালে নায়েব-গৃহিণী যখন স্নান করতে যাচ্ছে গোবর্ধনের সঙ্গে দেখা হ'লো বাইরের দরজার কাছে। ঘোড়ার জিন কষছে সে।

'তোর না আজ ছুটি বলেছিলি? আমি ভাবলাম চান ক'রে এসে খাবার ক'রে দিই। তুই এখন যাচ্ছিস কোথায়? এত সকালে তোর কোন রাজ্য জয় করতে হবে?'

'একটু ঘুরে আসি।'

'ঘোড়ায় চ'ড়ে কেউ একটু ঘুরতে যায় না। আমি আর ঢুকবো না ভাঁড়ারে। তুই হাত-পা ধুয়ে যা পাস খেয়ে যাস।'

'আচ্ছা যাবো।'

'একটু সকাল-সকাল ফিরবি আজ ?'

'কেন বলো তো, শিব-মন্দিরে যাবে ? আমি তো বলেছি, ও-সব করার সময় নেই আমার।'

'তোর তো ঠাকুর-দেবতায় এমন অগ্রাহ্যি ছিলো না গোব্‌রা কোনোদিন।'

গোবর্ধন হাসতে-হাসতে বললো, 'সব দিন কি সমান যায়, মামিমা ? এর পরে একদিন হয়তো সবসুদ্ধ খ্রীস্টানই হবো।'

'কি বললি ? ছি, ছি, গোব্‌রা, মা-র সামনে অমন সব কথা মুখে আনতে আছে ?'

'তুমি খ্রীস্টান না হ'লে আমি কেন হ'তে গেলাম। গাছের শিকড়ও যা, ফলও তাই।' —এই ব'লে গোবর্ধন লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়লো।

'খেয়ে গেলি নে ?'

'আসছি, আসছি।'

নায়েব-গৃহিণীর সুখও হ'লো, দুঃখও হ'লো।

নদীর পথে যেতে-যেতে একটা কথা তার মনে খচখচ করতে লাগলো। খারাপ মেয়েদের উপরে পুরুষের কেমন-একটা টান আছে। তাদের ছল করার, ছলনা করার কতকগুলো ক্ষমতা থাকে যা ভদ্রঘরের মেয়েরা পারেও না, করেও না। কিন্তু সেই সব ছল-কলাই যেন ফাঁদের দড়ি। তাতেই আটকে যায় পুরুষরা। এর চাইতে কেট যদি ভালো খ্রীস্টান হ'তো তাই বোধ হয় ভালো ছিলো। সেটাও তো একটা ধর্ম। অখাদ্য খায়, দেব-দ্বিজে ভক্তি থাকে না, কিন্তু নিশ্চয়ই তাদের মধ্যেও সামাজিক বিধান আছে, নতুবা ছেলে কি ক'রে মানুষ হয়। মাকে ভালো না বাসলে ছেলে বড়ো হয় না।

এই তো গোব্‌রাকে ত্যাখো। সে তো নিজের পেটের ছেলেও নয়,

তবু গ্রামে সব ক'টি ছেলের মাথা হ'য়ে উঠেছে, এমনি কি হ'তো যদি মামিকে প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসতো।

কিন্তু কি রীতি ভগবানের। এক-সময় আসে যখন মায়ের চাইতেও বড়ো হয় আর-একটি মেয়ে।

নায়েব-গৃহিণী তার নিজের প্রতি গোবর্ধনের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়ে যে-দুর্গ রচনার প্রয়াস করছিলো এ-কথাটায় যেন তার প্রাকাররভিত্তি ট'লে উঠলো।

নায়েব-গৃহিণী চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। অনুভব ক'রে ঠাহর ক'রে কাজ করে। গোবর্ধন কয়েক দিন আগে ঘটকী আসার কথায় বলেছে, 'মামিমা, বিয়ে আমি করবো না।' সাধারণভাবে ছেলেরা যেমন বলে তেমন ক'রে বলা নয়। কি হ'তে পারে এর অর্থ? যদি ধর্ম নিয়ে মেতে উঠতো তা হ'লে বোঝা যেতো হয়তো-বা সন্ন্যাসী হওয়ার যুক্তি আঁটছে। সংখ্যায় খুব কম হ'লেও গৃহস্থঘরের ছেলের কোনো-কোনো সময়ে সন্ন্যাসের ঝোঁক আসে। ধর্মের সঙ্গে ওই ইস্কুলের কোনো সম্বন্ধই নেই। সে-ক্ষেত্রে ছেলের মতিগতি অস্পষ্ট ও আশঙ্কাজনক হচ্ছে।

কিন্তু ছেলে যদি কোনো স্ত্রীলোককে ভালোবাসে তবে তার মুখ দেখে কি আঁচ করা যায় না? হয়তো যায় না। কিন্তু গোব্‌রা তার কাছে কোনো আব্দার ক'রে কোনোদিনই বিমুখ হয় নি। সে কি জানাতো না? নায়েব-গৃহিণী মনে-মনে গ্রামের সব ক'টি মেয়ের মুখ পরীক্ষা ক'রে এল। দূর করো, কারো এ-গ্রামে সে-রকম মেয়ে নেই। এটা সে-ব্যাপার নয়। কী তা হ'লে? ঘোড়ায় চ'ড়ে কোথায় যায়? সেদিন অতগুলো টাকা নিলো বন্দুক না কি কেনার জন্য। সদর-নায়েবকে আজ বলতে হবে, নায়েবি করো, শুনতে পাই পরগনাটা

তোমার হাতের তেলো। নিজের ঘরে কি হয় তাই বলো। নদীর ঘাটের কাছে এসে নায়েব-গিন্নীর মনে প্রশ্ন জাগলো, ডাকাতির দল খুলছে নাকি ঠগীদের মতো ? কথাটা মনে হ’তেই চঞ্চল হ’য়ে উঠলো। নায়েব-গৃহিণীর চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট ও বাষ্পসংকুল।

॥ একুশ ॥

রাজচন্দ্র খবর পেয়েছিলো পিয়েত্রো একটু বেশি অসুস্থ। এক-বিকেলে সে পিয়েত্রো-আবাদে উপস্থিত হ'লো।

কুঠিতে ঢুকবার দরজার পাশের একটা ঘরে ব'সে একটি ভৃত্য লণ্ঠনের বড়ো-বড়ো ডোম ও চিম্‌নিগুলো মেজে-ঘ'ষে সাফ করছিলো। তার উপরে রাজুর চোখ পড়ায় সে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করলো।

'সাহেব কোথায়, ঘরে ?'

'না হুজুর, তিনি আটচালার পাশের আখড়ায় আছেন।'

রাজু কুঠিতে না ঢুকে আটচালার দিকে গেল।

আটচালায় পৌঁছনোর আগেই ব্যাপারটা তার চোখে পড়লো। দৃশ্যটা অপূর্ব, দাঁড়িয়ে দেখার মতো। পিয়েত্রোর বরকন্দাজরা একটু দূরে দল বেঁধে ব'সে আছে। এদিকে একটা ছোটো টিপয়ের উপরে পিয়েত্রোর চিরসাথী সুরার সরঞ্জাম। টিপয়ের কাছে একখানা চেয়ার, তার সম্মুখে পিয়েত্রোর গড়গড়া। পিয়েত্রো নিজে তরোয়াল হাতে পাশের খোলা জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার বিপক্ষ হ'য়ে দাঁড়িয়ে বুজরুক আলি, তার হাতেও তরোয়াল। রাজু যে-মুহূর্তে দেখেছিলো প্রথম সেটায় এই পরিস্থিতিই ছিলো, পরমুহূর্তে অবস্থান বদ্‌লে গেল। তরোয়াল দুটি বিদ্যুতের মতো ডাইনে-বাঁয়ে বিচিত্র কয়েকটি বৃত্ত ও বৃত্তভাগ সূচনা করলো, ইস্পাতে ইস্পাতের আঘাতে শব্দ হ'তে লাগলো। সহসা বুজরুককে নিরস্ত্র হ'য়ে দাঁড়াতে দেখা গেল, পিয়েত্রো তার হাতের তরোয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। পিয়েত্রোর কপাল দিয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে ঘাম পড়ছে। পরিশ্রমে মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে। বুজরুকও রুমাল বার ক'রে ঘাম মুছলো। পরিশ্রমে তার বুকটা ওঠানামা করছে।

পিয়েত্রো বললো, 'আর এক প্যাঁচ ?'

'না উস্তাদ, আপনার তবিয়ত ভালো নেই। আপনি বসুন।'

পিয়েত্রো ধীরে-ধীরে এসে তার চেয়ারে বসলো।

রাজুকে দেখে হেসে বললো, 'এসো রাজকুমার, অনেক দিন পরে এলে।'

'এ-সব কি, শুনলাম আপনার অসুখ, এখন তো ভালোই দেখছি।'

'ভালোই দেখছো, না ? (পিয়েত্রো যেন খুশি হ'লো কথাটা শুনে) আমারও ভালোই লাগছিলো। কিছুদিন থেকেই বুজরুক বলছে লম্বা তরোয়ালের খেলার জন্য। আজ দিনটাও ভালো, তাই একটু হ'লো।'

ততক্ষণে রাজুর জন্যে আটচালা থেকে চেয়ার এসে গেছে।

পিয়েত্রো বললো, 'বোসো রাজু, বুজরুক বোধ হয় আরোও কিছুক্ষণ খেলবে। বুজরুক বলছিলো, তোমাকে অনুরোধ ক'রে তোমার বরকন্দাজদের মাঝে-মাঝে আনিয়ে নেওয়ার জন্য।'

'তারা কি করবে, তরোয়াল খেলা শিখবে ?' রাজু হাসলো। 'বরং আমাকে শেখান। কিন্তু আপনার অসুখটা কি ?'

'সেই জ্বর। মাঝে-মাঝে হচ্ছে, কুইনাইনে যাচ্ছে না। জ্বর যখন খুব বাড়ে তখন বুজরুক জল ঢালে মাথায়।'

পরিশ্রমের রক্তাভা ততক্ষণে মুখ থেকে স'রে গিয়েছিলো, রাজু এবার দেখলো পিয়েত্রোর কপাল চোখ মুখের দৃশ্যমান অংশটুকু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। আঙুলের লম্বা নখগুলোতে যেন হলুদ মাখা। দাড়িগুলোও যেন বেশি শাদা।

রাজু বললো, 'চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।'

পিয়েত্রো বললো, 'তোমার ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেবে নাকি একবার ?'

'বাগচীকে বলবো আসতে।'

'বাগচীর কথায় মনে প'ড়ে গেল রাজু, জ্ঞানদা বিদ্যালয়ের খবর কি

'ভালোই চলছে, ছাত্রসংখ্যা বেড়ে এক শো-তে দাঁড়িয়েছে বলছিলো বাগচী।'

'ভালো, খুব ভালো। ছাখো রাজু, একটা কথা ব'লে রাখছি তোমাকে। আমরা বুড়োদের দল থাকবো না। কিন্তু স্কুল থাকতে পারে। পুরনো মাস্টার থাকবে না, পুরনো পরিচালকরা থাকবে না, আজ যা পাঠ্য, আজ যাকে আবশ্যিক মনে হয়, কাল তাকে অর্থহীন বোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান থাকা চাই। সেটা যেন থাকে।'

'উদ্দেশ্যই যদি বদ্‌লে যায়?'

'স্কুলের উদ্দেশ্য বিদ্যা বিতরণ, সেটা তো আর বদলাবে না। বদলায় শিক্ষকের রুচি, তার শিক্ষাপদ্ধতি।'

'কিন্তু আপনি এখনি বিদায় নেবার কথা ভাবছেন কেন?'

ভৃত্যের হাত থেকে গড়গড়ার নল নিয়ে পিয়েত্রো বললো, 'না, না, আমি কি তাই বলছি। বুজরুক, তোমার শাকরেদদের খেলা হোক এইবার।'

'হ্যাঁ, এই হবে।'

বুজরুকের ডাকে যে তরোয়াল হাতে উঠে এল তাকে চেনা-চেনা বোধ হ'লো রাজুর।

পিয়েত্রোকে সে জিগ্যেস করলো, 'একে যেন কোথায় দেখেছি।'

'তোমাদের স্কুলের মাস্টার।'

'গোবর্ধন? ওই পোশাকে চেনাই যাচ্ছে না।'

গোবর্ধন শিক্ষানবীশ, বুজরুক থেমে-থেমে তাকে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে তার সঙ্গে খেলতে লাগলো।

রাজু বললে, 'লম্বা তরোয়ালে বুঝি বুজরুক আপনার শিষ্য?'

'না, ও নিজেই জানতো। (পিয়েত্রোর গাল লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো) ওটা ওরই পৈতৃক সম্পত্তি। উস্‌মান খাঁ লম্বা তরোয়াল নিয়ে দাড়ালে আট-দশ জন তরোয়ালবাজ দুশমনও কাছে ঘেঁষতো না। তার কাছে আমি শিখেছিলাম। বুজরুক সে সুযোগ পায় নি।'

রাজু বললে, 'কিন্তু আলি খাঁর বন্দুক-তরোয়ালের কারবার দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ের দলকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এ-সব নয়। নিজেরাই ঠগীদের মতো দল গড়ার জন্যে।'

'তা অস্বাভাবিক নয়।'

পিয়েত্রো ও রাজু দু-জনেই হাসলো।

গোবর্ধনের খেলা হ'লে কিংবা তার শিক্ষার আর-একটি পাঠ শেষ হ'লে বুজরুক বরকন্দাজদের বিদায় দিলো। তারা চ'লে গেলে রাজুর কাছে ভঙ্গি ভরে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়ালো বুজরুক।

রাজু হাসি-হাসি মুখে বললো, 'স্কুলের মাস্টার, চিরকালই নিরীহ জীব, তাকে আবার এ-সবে জড়াচ্ছো কেন, আলি খাঁ? বেচারা বুঝি বন্দুকের লোভে তোমার পেছনে ঘুরছে? দিয়ে দাও। কাঁহাতক আর তরোয়াল খেলবে। বন্দুক নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরুক।'

গোবর্ধন হাসিমুখে বললো, 'বন্দুক আমি পেয়েছি, রাজকুমার।'

'তা হ'লে আর এই ঝকমারি কেন?'

পিয়েত্রো বললো, 'বিনা পয়সায় বন্দুক পেলে একটু তরোয়াল খেলতেই হয়।'

'বিনা পয়সায়? বলো কি আলি খাঁ? ব্যবসা তা হ'লে এইরকম করছো?'

'আর বলো কেন রাজু, আমার টাকা ক'টি শেষ ক'রে দিলো।' —ব'লে পিয়েত্রো হাসলো আবার।

ঈষৎ তপ্ত ঘাসের উপরে ব'সে পড়লো বুজরুক, তার পাশে গোবর্ধন। রাজু বললে, 'তোমরা কি পিণ্ডারীদের মতো আর-এক দল তৈরি করছো?'

বুজরুক তার সুর্মা-আঁকা ঈষৎ লাল বড়ো-বড়ো চোখ দুটি মেলে রাজুর দিকে খানিকটা সময় চেয়ে রইলো।

হঠাৎ বুজরুক বললো, 'রাজাভাই, গোবর্ধন আমার সঙ্গে তর্ক করছিলো, আপনি বলুন তো ভারতবর্ষের সম্রাট কে?'

'ইংরেজ।'

'এটা ঠিক হ'লো না, ভারতের সম্রাট বাহাদুর শাহ্। ইংরেজরা বাংলার দেওয়ান এবং কোনো-কোনো প্রদেশের লুণ্ঠনকারী।'

'এই তোমার ধারণা? তবে বাহাদুর শাহ্ তার অন্যান্য প্রদেশকে লুঠ করতে দেয় কেন? দেওয়ানকে পদচ্যুত করলেই হয়।' রাজু কৌতুক ক'রে বললো।

বুজরুকের চোখ দুটি জ্ব'লে উঠলো।

'যদি তা-ই করেন সম্রাট শাহান শা বাহাদুর শাহ্ আপনি কি খুশি হন না?'

'ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি হবে তা তো বুঝি না। বাহাদুর শাহ্ কিছু আমাকে দেবে না, ইংরেজরাও কিছু দিচ্ছে না।'

'কিন্তু ইংরেজরা আপনার জায়গীর কেড়ে নিতে পারে।'

'তা' পারে।'

'কি করবেন তা হ'লে?'

'আপাতত তার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। যদি তাই নেয়, সহ্য করা ছাড়া কি গত্যন্তর?'

সাপের ফণা তোলার মতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো বুজরুক, 'রাজাভাই, আপনি না বাঙালি? আপনি না বাঙালি ভুঁইয়া? আপনার উর্ধ্বতন দশ

পুরুষে কেউ কি গত্যন্তর নেই বলতো? রাজকুমার, আর-একটু চিন্তা ক'রে বলুন। দুর্দান্ত বাদশা আলমগীরের সময়ও তো কোনো ভুঁইয়া এমন কথা কখনো বলে নি।'

'তুমি কি স্বাধীন হ'য়ে যুদ্ধ করার কথা বলছো?'

'তাই কি ভালো নয়? যতদিন বাঁচবেন, রাজা হ'য়ে থাকুন। কোনো-দিন ছোটো হ'তে যাবেন কেন?'

'কিন্তু তোমার বাহাদুর শাহ্ সম্রাট কি আমার স্বাধীন হ'য়ে থাকা বরদাস্ত করবে? তা' করবে না। তখনকার দিনেও কি জায়গীরদারের জায়গীর কেড়ে নেওয়া হ'তো না? কি করতো জায়গীরদার?'

'সম্রাটের অধীনে জায়গীরদার; ভুঁইয়া, রাজা হওয়া আর ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে ভয়ে-ভয়ে থাকা কি এক কথা?'

'এ-রকম সব স্বপ্ন তুমি কতদিন থেকে দেখছো, আলি খাঁ?' রাজু হাসলো।

পিয়েত্রোকে বললো, 'এ-সব কি আলি খাঁর স্বাধীন হবার চেষ্টা? নবাব মীরকাসেম যা পারে নি, হৈদার আলি যা পারে নি, সে-কাজ করতে যাওয়া কি ভালো? লাখ-লাখ সৈন্য আর লাখ-লাখ বন্দুকের বিরুদ্ধে দশজন বরকন্দাজ দাঁড় করানোর পাগলামি কি সত্যিই হয়েছে আলি খাঁর? কী দুঃখের কথা!'

বুজরুক আশায় জ্ব'লে উঠলো, 'রাজাভাই, সেই লাখ-লাখ সৈন্য যদি বন্দুক না চালায়?'

'বাইশ মন তেল পুড়লে রাধা কখনো-কখনো নাচে শুনেছি।'

'কিন্তু,' পিয়েত্রো বললো, 'শিবাজী রাজা কত সৈন্য নিয়ে আলমগীর বাদশার বিরুদ্ধে নেমেছিলেন? কিংবা জায়গীরদার শের শাহ্ কত সৈন্য নিয়ে সারা ভারতের সম্রাট হয়েছিলেন?'

বুজরুকের কথা আর পিয়েত্রোর কথা এক নয়।

রাজু পিয়েত্রোর মুখের দিকে বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইলো।

পিয়েত্রো বললো, 'অমন ক'রে চেয়ে আছো কেন?'

'আপনি কি বললেন, ধরতে পারলাম না।'

'খুব সোজা কথা তো। তুমি যদি এ-জেলাটা ইংরেজের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারো এবং তারপর পঁচিশ বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করার মতো শক্তি অর্জন করতে পারো তা হ'লে কঠিন কি? যখন ক্লাইভ জালিয়াতি করতে আসছিলো মুর্শিদাবাদের দিকে তখনো কি সে ভেবেছে দেওয়ানি করতে পারবে তারা? তবে তার আগে অন্তত এক হাজার দুর্ধর্ষ সৈনিক তৈরি করতে পারা চাই। এক হাজার সৈনিক নিয়ে কাজ শুরু করলে ইংরেজকে বাংলা ছাড়া করা কঠিন নয়, সময়সাপেক্ষ হ'তে পারে।'

'ইংরেজ বীরের জাত।'

পিয়েত্রো হোহো ক'রে হেসে উঠলো, 'কোথায় তারা বীরত্ব দেখালো, পলাশিতে?'

বৃদ্ধ, রুগ্ন, অর্ধ-বিদেশী আবাল্য-পরিচিত এই লোকটির দিকে চেয়ে-চেয়ে রাজু অন্ত পেলো না। কিছুক্ষণ আগেই বৃদ্ধের তরোয়াল-চালনা দেখেছে, এখন সেই খেলা অন্য আর-একটি অর্থ নিয়ে তার চোখের সম্মুখে দাঁড়ালো। রাজু পিয়েত্রোর কাছেই শুনেছে বৃদ্ধ হৈদার আলির কথা। তার কল্পনায় হৈদার আলি পিয়েত্রো কিছুক্ষণের জন্য এক হ'য়ে মিলে গেল। পিয়েত্রোর মুখেই সে শুনেছে আর্কের এক কুমারীর কথা। সে তাড়িয়েছিলো বটে ইংরেজকে তার দেশ থেকে। সে শুনেছে ঈশা খাঁর কথা।

রাজু বললো, 'রাজা কি ইচ্ছে করলেই হওয়া যায়, সেটা ইতিহাসের ব্যাপার।'

পিয়েত্রো বললো, 'রাজু, তুমি রাজা হও বা না-হও, বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হোক কিংবা ইংল্যাণ্ডের রানী, আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, তবে এ-কথা আমাকে বলতেই হবে রাজত্ব স্থাপনার মূলে অভূতপূর্বতা কিছু নেই ; অপরিসীম কষ্ট সহ্য করতে পারলেই হ'লো, নেতৃত্ব করার ক্ষমতা থাকলেই হ'লো, যুদ্ধের জ্ঞান থাকা চাই, আর বোধ করি কতকগুলো ঘটনা পরম্পরা, যাকে ভাগ্য বলে। তুমি যদি চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হও তোমাকে লোকে পাগল বলবে, হয়তো মৃত্যুই হবে সেই বোকামির পরিণাম। কিন্তু যদি জয়লাভ করো, শিবাজী ও প্রতাপের সম্মান তুমি পাবে। যুদ্ধটা একটা বড়ো রকমের খেলা বৈ তো আর কিছুই নয়।'

পিয়েত্রোর পিপাসা পেয়েছিলো, সে পান করলো। তারপর হেসে বললো, 'রাজু, তোমাকে আমি তাই ব'লে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিচ্ছি না। আলোচনা করতে ভালো লাগে এখন, তাই করলাম। আলোচনা ছাড়া আমার আর কি করার আছে।'

পিয়েত্রো থামলো, আবার গড়গড়ার নল তুলে নিলো।

তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঝিরঝির ক'রে একটা হাওয়া দিচ্ছে। গড়গড়ার শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই। পিয়েত্রোর তরোয়ালটা খাপে-ঢাকা-অবস্থায় টিপয়ের উপরে রেখেছিলো বুজরুক। রাজুর মনে হ'লো, ওই তরোয়ালের মতো পিয়েত্রো। তীব্রধার তরোয়াল, বিবর্ণ মখমলের খাপে ঢাকা। তরোয়ালের ঝালরের সিল্কও বিবর্ণ। কিন্তু তখন আবার পিয়েত্রো যেন তার ধূসর খাপে মাথা ঢুকিয়ে নিয়েছে।

পিয়েত্রো উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'ঠাণ্ডা পড়বে, আমি ঘরে যাচ্ছি। রাজু, তুমি আর বুজরুক কি এখনই আসবে?'

বুজরুক বললো, 'আমরা একটু থাকি।'

পিয়েত্রো চ'লে গেল।

রাজু বললে, 'আলি খাঁ, এ-সব পাগলামি ত্যাগ করো ভাই। যদি সত্যি ভেবে থাকো তুমি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবে—'

বুজরুক বললো, 'আমি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে চাই না। এই ইতর ধর্মহীন নিমকহারাম জাতটাকে বাংলা দেশ থেকে তাড়াতে চাই।'

'অন্য দূরের কথা, তুমি ডান্‌কানকে পারো তাড়াতে?'

'এক রাত্রিতে।'

'সে তো সাধারণ একটা খুনিও পারে। তা নয়, জেলার সদর থেকে কালেক্টর আসবে, সে না পারে, কলকাতা থেকে লাট আসবে। অযোধ্যার নবাব কি করতে পারলো?'

বুজরুক বললো, 'সে-অপদার্থের খাপে বোধ হয় তরোয়াল ছিলো না, যেটা কোমরে ঝুলতো সেটা বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে মদের বোতল, সময়-অসময়ে চুমুক দিতো। ইংরেজ আমাদের শাসন করে আমাদের দিয়েই। আমরাই সিপাই হ'য়ে আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়ি।'

'তা বটে। পলাশির যুদ্ধে আমরাই আমাদের পায়ে কুড়ুল মেরেছি।'

'আমরা যদি আমাদের দিকে ফিরে চাই, যদি সিপাইরা বলে আর তারা ইংরেজের হ'য়ে যুদ্ধ করবে না?'

'তা হ'লে হয়।'

বুজরুক উঠে রাজুর মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'রাজা, যদি কখনো সে-দিন আসে আপনার সাহায্য আমি নিশ্চয় পাবো। কিন্তু আজ আর আলোচনা নয়। ইংরেজের চর সর্বত্র আছে। প্রকাশ পেলে আমার কি হবে তা বুঝতে পেরেছেন?'

'ফাঁসি।'

'তা যদি বুঝে থাকেন, আমি নিশ্চিন্ত।'

কুঠিতে ফিরে গিয়ে পিয়েত্রো তখন শয্যা নিয়েছে। রাজু গিয়ে তার শয্যার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

পিয়েত্রো বললো, 'রাজু, এ এক অদ্ভুত জ্বর। সাধারণত গরিবদের মধ্যেই হ'তে দেখেছি। হঠাৎ যাকে ধরে তাকে আর ছাড়ে না।'

রাজু বললো, 'কাল আমি বাগচীকে পাঠাবো। সে তো গরিবদের কালাজ্বর সারাচ্ছেও, তাতেও যদি না হয়, আমি সদর থেকে সাহেব-ডাক্তার আনাবো।'

'তা তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো বাবা, যদি জ্বর না সারে তাতেও দুঃখ নেই। পৃথিবীতে আমার মায়ের মতো আর আপন কেউ ছিলো না, অন্তত এখন এই অবস্থায় তাঁর কথাই মনে হচ্ছে। আমার এ-দেহটা তাঁর রক্তমাংসে গড়া, এর সৎকার কোরো। কবরের শীতলতা আমার ভালো লাগবে না।'

রাজুর চোখ দুটো ছলছল করতে লাগলো, সে বললো, 'আপনি এ-সব কথা ভাবছেন কেন? আমি কি আপনার কেউ নই?'

পিয়েত্রো বললো, 'তোমার মনে কষ্ট দিলাম দেখছি। কথাগুলো কাউকে বলার জন্য একটা আগ্রহ বোধ করছিলাম। তাই ব'লে ফেলেছি। অন্য কথা বলো রাজু। তুমি কি বুজরুকের সব কথা শুনেছো?'

'হ্যাঁ।'

'ওর মনে যে বদ্ধমূল প্রতিশোধ-স্পৃহা আছে সেটা বড়ো ভয়ংকর। খুব বড়ো বংশের ছেলে। উস্‌মান খাঁকে আমার বাবা সঙ্গে-সঙ্গে রাখতেন। ঠিক জানি না, কি-একটা সূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে উস্‌মান খাঁর শত্রুতা ছিলো। উস্‌মান খাঁ ফরাসী উপনিবেশে থাকতেন। এদেশে তাঁর সত্যিকারের পরিচয় কারো জানা ছিলো না। উস্‌মান খাঁ-ও বুজরুকের মতোই কি-একটা অদ্ভুত ব্যবসা করতেন।'

'আপনি এবার চুপ করুন। জ্বরের সময়ে বেশি কথা বলতে নেই।'

'হ্যাঁ, এবার আমিও ঘুমবো। জ্বর এলেই ঘুম পায়। আজ একটু পরিশ্রম হয়েছে, জ্বরটা আগেই এল।'

রাজু উঠে দাঁড়ালো। মোটা একটা চাদর পিয়েত্রোর পায়ের কাছে ভাঁজ হ'য়ে প'ড়ে ছিলো, সেটাকে তুলে এনে পিয়েত্রোর কোমর অবধি ঢেকে দিলো।

পিয়েত্রো হেসে বললো, 'রাজকুমারের হাতের সেবাও পেলাম। ফরাসী সম্রাটরা পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। চাকরদের ডেকে দিয়ে যেয়ো কিন্তু।'

রাজু ঘর থেকে বিষণ্ণ মনে বেরিয়ে এল। সে দেখতে পেলো দু-জন ভৃত্য পিয়েত্রোর ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। চাকররা পিয়েত্রোকে ভালোবাসে। কিন্তু হঠাৎ রাজুর মনে হ'লো পিয়ানোর গায়ে লেখা যার নাম সেই মেয়েটির কথা। সে হয়তো ফরাসী দেশে কোথাও সন্তান-সন্ততিবেষ্টিত হ'য়ে সুখে ঘরকন্না করছে।

ফিরতে-ফিরতে হাওদার চেয়ারে ব'সে-ব'সে পিয়েত্রোর কথা মনে হ'তে লাগলো তার।

কোথাও যেন স্পৃহা নেই, কোথাও যেন আর আকর্ষণের কিছু অবশিষ্ট নেই, সবটাই একটা নৈর্ব্যক্তিকতার সূচনা করছে। স্কুলের কথা বললো, তরোয়াল নিয়ে খেলা করলো, রাজ্যস্থাপনের কথা বললো, কিন্তু কোথাও ব্যক্তিত্বের উত্তাপ সঞ্চারিত হ'লো না। যেটুকু আবেগ সেটুকুও যেন কথার ধ্বনি, প্রাণের ব্যঞ্জনা। বক্তার কিছুমাত্র অভীপ্সা তাতে নেই।

এমনি বোধ করি হয় নিঃসঙ্গ মানুষের, নিজের উপরেও মায়া

থাকে না। নতুবা নিজের দেহটাকে দাহ করার কথা বলতে গিয়েও এতটুকু উঁচু-নিচু হ'লো না কণ্ঠস্বর।

কিন্তু রাজুর সর্বাঙ্গে এবং মনে ভরা-যৌবন। বাড়িতে পৌঁছে রূপচাঁদকে বললো, 'কাপড়-চাদর নিয়ে আয়।'

'বেরোবেন, হুজুর ?'

'হ্যাঁ। স্নানের জল দিয়েছে ?'

রূপচাঁদ কাপড়-চাদর আনতে গেল, রাজু স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে চ'লে গেল। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে রাজু দেখলো, রূপচাঁদ তখনো আসে নি। সে তখন রানীর মহলে গেল। রানীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার ফিরতে দেরি হবে মা, তুমি যেন আবার ভেবো না।'

'খাবি কখন ?'

'নেমন্তন্ন আছে।'

রাজু নিজের ঘরে ফিরে দেখলো কোঁচানো কাপড় নিয়ে রূপচাঁদ দাঁড়িয়ে আছে। কাপড় প'রে চাদর হাতে নিয়ে রাজু বললো, 'এ কি রে, এত মোটা জরি কেন, এ কোনদিশি চাদর, খরখর করছে যে। নকল নাকি রে ?'

'আজ্ঞে সরকারমশাইকে বলবো সকাল হ'লেই।' রূপচাঁদ ভয়ে ঘামতে লাগলো।

'থাক, থাক, বেচারা ঠিক ঠাহর করতে পারে নি।'

পায়ের কাছে এগিয়ে ধরা জুতো-জোড়া প'রে রাজু ঘর থেকে বের হ'লো। নয়নতারার বাড়ির দরজায় রূপচাঁদকে বিদায় দিয়ে রাজু বললো, 'তোকে আর আসতে হবে না, জোছনা উঠবে। আলো নিয়ে যা।'

নয়নতারা তখন তুলোটকাগজে লেখা কি-একটা পুঁথি পড়ছিলো।

রাজু বললো, 'বাড়িতে অতিথি যে।'

'কখন এলে, এইমাত্র ?'

'তা হোক। আগে কিছু খেতে দাও। তারপর রাত্রির রান্না চাপাও।'

'সে কি ?'

'খুব সহজ ব্যাপার, অনেক কথা বলার আছে। কথা শেষ ক'রে অত রাত্রিতে গিয়ে খেতে পারবো না। জানো তো, রাজকুমারেরা না-খেয়েও থাকে না।'

'মাছ-মাংস কিছুই নেই, তুমি খাবে কি ? কাল দিনের বেলা রেঁধে খাওয়াবো। আজ নয়।'

'সেই গল্পটা জানো ? এক শ্রেষ্ঠীর ছেলে একমুঠো শালিধান নিয়ে গৃহিণীর খোঁজে বার হয়েছিলো ?'

'তুমি যখন গৃহিণীর খোঁজে বেরুবে তখন আমি বউ পছন্দ করার আরও অনেক ফিকির তোমাকে শিখিয়ে দেবো। কিন্তু রান্না কি আমাকে নিশ্চয়ই করতে হবে ? তা হ'লে ততক্ষণ তুমি কি ব'সে-ব'সে বই পড়বে ?'

'আমি তো ব্রাহ্মণ, তোমার রান্নাঘরেও আমি যেতে পারি।'

নয়নতারা প্রদীপ তুলে নিয়ে বললো, 'এসো তা হ'লে।'

নয়নতারা উনুন জ্বালালো, জানু পেতে ব'সে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে আগুনটাকে বাড়িয়ে তুললো। উনুনে কড়া চাপিয়ে রান্নার উদ্যোগ করলো।

'ওটা কি দুধ ? ভালো, দুধ আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু অতটুকুতে কি দু-জনের হবে ?'

নয়নতারা হেসে বললো, 'আর উপায় কি। তুমি দুধটা পাহারা দাও, আমি জল তুলে আনি।'

'ওটা আমিও পারি। পাত্‌কো কোথায় ?'

'বেশ, আনো। বাইরের কাজ তো তোমাকেই করতে হয়। তাই ব'লে কাপড়-চাদর ভিজিয়ে এসো না যেন।'

চাঁদের আলোয় রাজু ছোটো কলসীটায় ক'রে জল নিয়ে এল।

দুধ নামিয়ে উনুনে জল চাপালো নয়নতারা।

'এই সেরেছে, ওটা ডাল নাকি ? ও আমি খাই নে বাপু।'

নয়নতারা এক-মুহূর্ত ভাবলো, তারপর বললো, 'ভাতই চড়াই। বোসো, চাল ধুয়ে আনি।'

নয়নতারা চাল ধুয়ে এনে দেখলে, হাতা দিয়ে হাঁড়ির জল তুলে দেখছে রাজু। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নয়নতারা দৃশ্যটা উপভোগ করলো, তারপর জিগ্যেস করলে, 'কি রাঁধছো ?'

'রাঁধবো কি ? ওতে কি আছে ? দেখছিলাম যাতে উত্‌লে না পড়ে।'

'জল ওত্‌লায় বটে !' নয়নতারা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

রাজু বললো, 'নয়ন, আমি যদি রাজা হতাম।'

'রাজা তো হবেই।'

'সে-রকম নয়, সত্যিকারের রাজা, যেমন ছিলো শিবাজী।'

নয়নতারা বিস্মিত হ'লো। বললো, 'তা কি হয়, আমাদের সেই শক্তি কোথায় ?'

'তা হ'লে তুমি সুখী হও কিনা বলো ? কি করো তা হ'লে ?'

'তা হ'লে বোধ হয় তোমার সভায় ব'সে কবিতা লিখি। বোধ হয় তোমাকে সিংহাসনে দেখলে কবিতা লিখতে পারবো। তোমার রানীর চিরদিনের সহচরী হই।'

রাজু নয়নের উচ্চাভিলাষের পরিমাপ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

'কি হ'লো ? কোথায় লাগলো ?' নয়নতারা মধুর উপহাসের ভঙ্গিতে বললো।

রাজু সামলে নিলো নিজেকে, বললো, 'দিবাস্বপ্ন।'

'হঠাৎ এ-কথা মনে হ'লো কেন, রাজকুমার?'

'আমাকে বুজরুক বলতে নিষেধ করেছে, কিন্তু তোমাকে আমি বলবো।' —এই ব'লে রাজু যতদূর বুজরুকের কাছে শুনেছিলো বললো নয়নতারাকে।

শুনে নয়নতারা বললো, 'রাজকুমার, তোমাকে আমি ও-সব কাজে ছেড়ে দিতে পারবো না। আমি বিশ্বাস করতে পারি না বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হ'লে আমার-তোমার কিছু লাভ হবে। আমরা অন্য রাজার কি ধার ধারি! আমাদের রাজা তুমি। কেউ রাজা হ'লো, কোনো রাজা চ'লে গেল, এতে আমাদের কি পরিবর্তন হয়েছে? আমরা মেনে নিচ্ছি, ভাবছি, পুঁথিপত্র নিয়ে দিন কাটাচ্ছি।'

'যদি পুঁথিপত্র নিয়ে দিন কাটাতে না দেয়?'

'তা হ'লে অবশ্য ভাববার কথা। তখন যে-মারামারি শুরু হবে তাকে বলবো মাৎস্য ন্যায়। তাতে কোনো রাজার রাজ্যই টেঁকে না।'

নয়নতারা আসন পেতে দিয়ে রাজুকে বললো, 'হাত-মুখ ধোবে চলো। এখন খেতে দেবো।'

রাজু খেতে-খেতে বললো, 'তুমি এমন রান্না কোথায় শিখলে? ঠিক আমার মায়ের মতো।'

রাজুর খাওয়া দেখে নয়নতারার মনের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিলো। কষ্টটা নিছক মেয়েলি বলা চলে। প্রিয়জনকে বাধ্য হ'য়ে সিদ্ধ ভাত খেতে দিতে হ'লে সব মেয়েরই বোধ হয় এমন হয়। নয়নতারা বুঝতে পারলো ব্রহ্মচারিণী রানীর স্বল্প উপাচারের আহার্যে রাজুর এখনো বালকোচিত মোহ আছে।

রাজু আবার বললো, 'মাঝে-মাঝে জোর-জবরদস্তি ক'রে মা-র ঘরে এমন খেতে পাই।'

তবুও নয়নতারার মুখে কথা সরে না। রাজু খেয়ে উঠে বললো, 'কিন্তু তোমার বাসনগুলো কালো পাথরের কেন? আমি শাদা পাথরের বাসন কাল রূপচাঁদকে দিয়ে যেতে বলবো।'

'না, না।'

'তা-ও কি হয়! আমি প্রায়ই যে এখানে খাবো এখন থেকে। তুমি খেয়ে এসো, আমি ঘরে বসছি।'

পান নিয়ে ঘরে এসে নয়নতারা বললো, 'তুমি কি তামাকও খাও নাকি?'

'না।'

'বাঁচিয়েছো। গড়গড়ার জোগাড় করা সম্ভব হ'তো না। কিন্তু ভারী একটা দুঃখের কথা আছে। অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিলো বলি, খাওয়া শেষ না-হ'লে বলতে পারি নি।'

'তুমি ভালো গিন্নি হবে।'

'রসিকতা নয়, শোনো।'

'তার আগে ওদিকে মিটিয়ে এসো।'

মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে নয়নতারা পড়শিদের-মুখে-শোনা কাহিনীটা ব্যক্ত করলো। সেটা ক্যাথারীনের চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিতময় একটা মন-গড়া কুৎসা। হিন্দু-সমাজে বাগ্‌দিরা যে-স্তরের, প্রকৃতপক্ষে ক্যাথারীনের পিতাও খ্রীস্টানদের সমাজে তার চাইতে উচ্চবর্ণ নয়। সেইজন্যই বাগচীর পক্ষে কেটকে বিয়ে করা সম্ভব হয়েছে। সমাজের বাইরে থাকা, কুড়িয়ে আনা মেয়ে কেট।

রাজু বললো, 'কেটকে ওরা কুলটা বলছে?'

'তা বলে নি, তবে প্রায় সে-রকমই। ওদের নাকি ধর্মাধর্ম জ্ঞানও নেই, ঈশ্বরকেই মানে না। নীতিজ্ঞান কি ক'রে থাকবে!'

'তোমার কি মনে হয়?'

'আমি বিশ্বাস করতে পারি না, রাজকুমার। শুনে অনেকক্ষণ একা-একা কেঁদেছিলাম।'

'ভয় কোরো না নয়ন, ও-সব নিন্দায় কেট সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলাবে না।'

রাজুর মুখটা থমথম করতে লাগলো। সে বললে, 'কাল সকালেই আমি যাবো তাদের কাছে। তারাও হয়তো শুনেছে। তাদের ব'লে আসবো যাতে ভয় না পায়। কী সাংঘাতিক কথা, এরা তো তোমার নামেও কলঙ্ক রটাতে পারে।'

'তা পারে না এমন নয়।'

'তুমি কি তা-ও ভেবেছো?'

'আমার নিজের কথা ভাবি না। ওরা আমাকে কি বলবে? রাজাদের উপপত্নী থাকে। লোকে হয়তো তাই ভাবতে শুরু করেছে।'

'নয়ন, নয়ন!'

নয়নতারা বললো, 'মিতা, তুমি তো ভাববে না। আর-একজন যাকে বুঝতে হবে সে তোমার রানী।'

'নয়নতারা!'

জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিলো নয়নতারা। রাজু উঠে গিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে তার একখানা হাত ধ'রে ধীরে-ধীরে নিজের দিকে টেনে নিলো তাকে, 'রানি! কই, মুখ তোলো তো?'

নয়নতারা মুখটা আরো নামিয়ে নিলো।

রাজু নয়নতারার চিবুক স্পর্শ ক'রে তার মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরলো, 'এ কি নয়ন, তোমার দু-চোখ ভরা জল!'

রাজু উদ্যত কথাটা চেপে গিয়ে হাসিমুখে বললো, 'নয়ন, আমরা আরও কতদিন বাঁচবো, কত অভিজ্ঞতা আসবে আমাদের জীবনে, কিন্তু তুমি এত সহজে নিজের কাঁধে অপবাদের বোঝা টেনে নেবার যে-সাহস দেখালে সহজে তা ভুলতে পারবো না।'

তারপর রাজুর চোখ দুটি আনন্দে চিকচিক ক'রে উঠলো, 'একটা বিপ্লবের সময় এসেছে ব'লে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু সে-সব বিপ্লবের চাইতেও তুমি অপূর্ব।'

ততক্ষণে নয়নতারা সংবিৎ পেয়েছে। কথা বাড়তে না দিয়ে সে বললো, 'কথা এক রাতে ফুরোবে না। আপাতত তুমি কেটকে দেখো। রাত গভীর হ'লো কিন্তু।'

রাজু যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে বললো, 'আমি ভাবছি দেওয়ান এ-সব শুনলে কি-বা ক'রে বসে। ভদ্রলোকের ক্রোধ বড়ো বিষম।'

রাজচন্দ্র আজ খুব সকালেই শয্যাত্যাগ করেছে। ধীরে-সুস্থে কাজ করার সময় যেন আজ নেই। প্রথমে পিয়েত্রোর চিকিৎসার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া, কাল রাত্রিতে শুয়ে ভাবতে-ভাবতে তার মনে হয়েছে, সব চাইতে বড়ো এবং প্রথম কর্তব্য এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তারপর কেটের কথা। কেটের দুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হ'লো, তার স্বামী আছে, বন্ধুস্থানীয়া নয়নতারা আছে, মিথ্যা কলঙ্ক তার মনে কষ্ট দিতে পারবে— অপকার করতে পারবে না। কিন্তু পিয়েত্রোর ব্যাপারটা অন্য রকম।

ঘর থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি সে তার মায়ের কাছে গিয়েছিলো। রানী সব শুনে বললেন, 'তা হ'লে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'আমি ভাবছিলাম, তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। সেবা-শুশ্রূষার তো দরকার।'

'তার তো লোকজন যথেষ্ট রয়েছে।'

'তাই কি হয়। লোকজন কবে কার সেবা করতে পারে। ভদ্রলোক মায়ের কথা বলছিলো, তেমনি কারো শুশ্রূষার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে মনে।'

রানী এক-মুহূর্ত কি ভাবলেন। তারপর অত্যন্ত দৃঢ় কিন্তু ধীর গলায় বললেন, 'রাজু, আমারও মা নেই, অসুখ হ'লে আমারও মায়ের কথা মনে হবে। সব প্রৌঢ় বৃদ্ধই কোনো-না-কোনো সময়ে ওই অভাবটা অনুভব করে। তুই কি আমার সেই অভাব দূর করতে পারিস?'

তথাপি রাজু বললো, 'আমার নিজের জন্য অতগুলো ঘরের দরকার নেই, দু-এক মাস পিয়েত্রো যদি থাকতো আমার ঘরের পাশে, তা হ'লে আমি আর নয়নতারা ওঁকে দেখতাম।'

'সে কি কথা! নয়নতারা ব্রাহ্মণের কুমারী। তোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ আছে আমি জানি। তাই, তুই কি মনে করিস একটা বিধর্মীকে সে শুশ্রূষা করতে পারে? তা হয় না। আমাদের ঘরদোর সবই দেবতাদের কাজের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে একজন বিধর্মীকে আনা যায় না।'

রাজু খানিকটা অভিমান নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলো। বাগচীকে ডেকে বললো, 'মাস্টারমশাই, আপনার ওষুধে কি রোগ সারে?'

'রোগ কি কেউ সারাতে পারে?'

'তবেই হয়েছে। শুনুন, আপনি মন্‌সেনে পিয়েত্রোকে চেনেন তো, তাঁকে একবার দেখা দরকার। তিনি অসুস্থ। যদি তাঁকে সুস্থ করতে পারেন, আমি আপনাকে একটা ভালো ডিস্‌পেনসারি ক'রে দেবো।'

'চলুন, দেখে আসি।'

রাজুর ঘোড়ার পাশে বাগচীর টাট্টু চলতে লাগলো।

বাগচীকে দেখে পিয়েত্রো বললো, 'এসো ফাদার, এসো।'

'আজ্ঞে, আমি তো ফাদার নই।'

'তোমাকে দেখামাত্র ফাদার ব'লে মনে হচ্ছে।'

'হয়তো আপনার কোনো পরিচিত ফাদারের সঙ্গে আমার চেহারার সাদৃশ্য আছে ব'লেই আপনার এ-রকম মনে হচ্ছে মন্‌সেনে। আমি আপনাদের জ্ঞানদা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক।'

বাগচী পিয়েত্রোর রোগের বিবরণ নিলো। ওষুধ দিলো। বললো, 'আমি এখন থেকে রোজ সকালে আসবো। আপনাকে সারিয়ে তুলতে পারলে আমার লাভ আছে, আমার একটা ভালো ডিস্‌পেনসারি হবে।'

পিয়েত্রো বললো, 'তুমি কি তখন মাস্টারি ছেড়ে দেবে?'

'আজ্ঞে, না। কলকাতা থেকে একজন বড়ো ডাক্তার আনিয়ে নেবো। আপনি দয়া ক'রে আমার ওষুধ খাবেন কিন্তু।'

'তা খাবো। তোমার ডিস্‌পেনসারির আশা নষ্ট করবো না। কিন্তু ফাদার বাগচী, আমি যদি তোমাকেই আমার গোপন কথাগুলো জানিয়ে যাই সেটা কি কনফেশন হয় না?'

'আজ্ঞে, আমাকে?'

'তুমি আর দ্বিধা কোরো না, এর মধ্যে একদিন এসো। আমি বলবো

তোমাকে। সব বলা সম্ভব নয়। যতদূর অন্যের ক্ষতি না ক'রে পারি বলবো। ওর চাইতে ভালো কনফেশ্যনের সুযোগ আমার হবে না।'

পথে বেরিয়ে রাজু বললো, 'কিরকম দেখলেন মাস্টারমশাই ?'

বাগচী বললো, 'খুব খারাপ নয়।'

'আরোগ্য করতে পারবেন ?'

'দেখুন, এমন অমূল্য জীবনের ভার আমার উপরে রাখা কিছু কাজের কথা নয়। যার উপায় নেই, যে বিনা চিকিৎসায় প'ড়ে থাকে, তার চিকিৎসা আমি করি। সারে সারলো, না সারে নালিশ করবার কিছু নেই। কিন্তু এঁর জন্যে আপনি সদরের ডাক্তারসাহেবকে আনিয়ে নিন। গ্রেসাম নাকি আজকাল ভালো চিকিৎসা করে।'

রাজবাড়ির দিকে ফিরতে-ফিরতে ভালোবাসা ও ধর্মে যাদের জীবনে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তাদের অনেকের মতো ভাবলো রাজু— ধর্ম কেন মানুষকে অস্পৃশ্য করবে।

॥ বাইশ ॥

না আছে পাথরের গায়ে লেখা ঐতিহাসিক উপাদান, না আছে পারসী ভাষায় লেখা কোনো রোজনামচা। ঘটনার পারম্পর্য অনেক ক্ষেত্রেই কল্পনা ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

যে-দৃশ্যপটটা এখন দেখা যাচ্ছে সেটা মশালের আলোকে উদ্ভাসিত এক রাত্রির প্রাথমিক অবস্থার। সে-দৃশ্যপটে রাজু আছে, গোবর্ধন আছে, বুজরুক রয়েছে, চরণের স্ত্রী বনদুর্গা আছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে মনে হয় এদের সমাবেশ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সম্ভাব্য, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে হরদয়ালকে মানাচ্ছে না। অথচ হরদয়াল যে ছিলো সে বিষয়ে সন্দেহ করতে গেলে তার অস্তিত্বের অনেকাংশে অবিশ্বাস আনতে হয়। কী সূত্রে হরদয়াল সেখানে উপস্থিত হ'লো বোঝা কঠিন। ধ'রে নেওয়া যায় যদি তার চর ছিলো, (বিচক্ষণ একটি দেওয়ানের পক্ষে তা থাকা অস্বাভাবিক নয়) এবং চরের মুখে সংবাদ পেয়ে কর্তব্য-বোধে সে ছুটে এসেছিলো, তা হ'লে বিষয়টিকে আলোচনা করা সহজ হয়। বুজরুকের যে-আগ্রহ ছিলো, দেওয়ান হরদয়ালের আগ্রহ গভীরতায় তার সমতুল্য, কিন্তু আগ্রহের বিষয় পরস্পরবিরোধী।

বনদুর্গা তার শিশুটিকে ঘুম পাড়িয়ে তার শোবার ঘরে খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কপালে গোল ক'রে সিঁদুর আঁকছে। এইমাত্র সে গা ধুয়ে এসেছে। তার কপালের উপরের চুলগুলি জলে ভিজে চকচক করছে। এমন সময় কে ডাকলো, 'চরণ আছিস ?'

'পোস্টমাস্টার !' —ব'লে বনদুর্গা হাসিমুখে বেরিয়ে এল।

'আমি অনেক দূরে যাচ্ছি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। চরণ কোথায় ?'

'আপনি বসুন, এখুনি আসবে সে।'

'না। তার সময় হবে না। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হ'লো, কথাটা তোমাকেই ব'লে যাই। আমি যদি ফিরে না আসি—'

'ফিরবেন না কেন, পোস্টমাস্টার?' বনদুর্গা গোবর্ধনের কাছে এসে দাঁড়ালো।

'অনেক দূরের পথ, কি হয় তা বলা যায় না। যদি না ফিরি একটা কথা তুমি মনে রেখো, তোমাকে না-পেয়েই এমন চ'লে গেলাম তা যেন মনে কোরো না।'

বনদুর্গা আরো এগিয়ে এসে দু-হাতে গোবর্ধনের দু-খানি হাত ধ'রে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো।

গোবর্ধন বললে, 'কাঁদছো কেন? তুমি কাঁদবে, চরণ কাঁদবে, তা হ'লে আমি কি ক'রে জোর পাবো?'

শিশুকে যেমন ক'রে আদর করে তেমনি ক'রে গোবর্ধন বনদুর্গার গালে হাত বুলিয়ে দিলো।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন হাসিমুখে বললো, 'যদি ফিরি বনদুর্গা, তখন এই কান্নার কথা ব'লে আমি আর চরণ দু-জনেই খ্যাপাবো তোমাকে।'

'কোথায় যাচ্ছো ব'লে যাবে না?' বারান্দায় দাঁড়িয়ে বনদুর্গা বললো।

'পরে জানতে পারবে।'—ব'লে গোবর্ধন দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। সে পিছন ফিরেও চাইলো একবার।

সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজবাড়ির দরজায় সান্ত্রীকে পেরিয়ে, সামনে যাকে পেলো তাকেই গোবর্ধন বললে, 'রাজকুমারকে একটু খবর দিতে হবে, আলি খাঁর কাছ থেকে গোবর্ধন এসেছে।'

রাজু বোধ হয় কাছে কোথাও ছিলো।

'কি খবর গোবর্ধন, এমন অসময়ে ?'

গোবর্ধন ফিসফিস ক'রে বললো, 'আমরা রওনা হচ্ছি, আপনার বরকন্দাজদের কি আমাদের সঙ্গে দিতে পারেন ?'

'কোথায় রওনা হচ্ছো, ফিসফিস না-ক'রে খুলে বলো।'

'বারিকপুরে সিপাহীরা যুদ্ধে নেমেছে। এবার আমরা রওনা হবো।'

'কি মন্ত্র তোমাকে আলি খাঁ দিলো জানি না। তুমি কি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মত নিয়েছো ?'

'রাজকুমার, সদরে এখনো খবর পৌছয় নি, তার আগেই আমাদের এই জেলার বাইরে যেতে হবে।'

'তোমরা কোথায় যাবে ?'

'বলতে পারবো না।'

'এখুনি যাবে, এই রাত্রিতে ?'

'দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা হবো। ঘোড়ার শব্দ পাচ্ছেন ? আলি খাঁ সম্ভবত আমার দেরি দেখে অধৈর্য হ'য়ে এদিকে আসছেন।'

'কিন্তু আমার বরকন্দাজদের কি আমি ছেড়ে দিতে পারি ? তারা কি যাও বললেই যাবে ?'

সঙ্গে একজন মশালচি নিয়ে বুজরুক আলি সদরে এসে ঘোড়া থেকে নামলো। মশালচি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। তার ঘোড়া মশালের আলোয় অভ্যস্ত নয়, নাচতে লাগলো সেটা। বুজরুকের ঘোড়াও যেন অনুভব করছে। সেটাও ডাইনে-বাঁয়ে ল্যাজ দোলাতে লাগলো।

বুজরুক হেসে বললো, 'রাজকুমার বন্দেগি, পরে সমাচার— মেহেরবান আল্লাহের কুদরত— কাল সকালে বারিকপুরে সিপাহীরা তাদের আজাদী কায়েম করেছে।'

'এ-সময়ে তোমার রসিকতা ভালো লাগে না আলি খাঁ, সহজভাবে কথা বলো।'

'আপনার কয়েকজন বরকন্দাজ আমাদের সঙ্গে দিন।'

'তারা যাবে কেন?'

'তারা কি ভীরু? দুঃসাহসের কাজে তারা কি নামতে পারে না? প্রচুর অর্থের, শহর লুটের প্রতিশ্রুতি যদি দিতে পারি? সিপাহীরা আর কি চায়?'

'তাই কি যথেষ্ট? সিপাহীদেরও পরিবার-পরিজন আছে।'

'তাদের ভার আপনি নেবেন, রাজাভাই।'

ঠিক এই সময়েই অন্ধকারের একপ্রান্ত থেকে হরদয়ালের গলা শোনা গেল।

'আলি খাঁ, কথাটা আমি বিশ্বাস করি। যে-সব সিপাহী তাদের দেশ ছেড়ে বহুদূরে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তারাও এমন-কিছু মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর থেকে বার হয় না। সৈনিকমাত্রই যন্ত্রের মতো কাজ করে। আমাদের স্কুলবাড়ির কাজে মিস্ত্রিদের যেমন অর্থ-উপার্জন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, স্কুলের মস্ত আদর্শটা যেমন তাদের কাছে অর্থহীন, যুদ্ধটা সৈনিক মাত্রেরই কাছে তাই। সেদিক দিয়ে বরকন্দাজরা যেতে রাজী হবে এটা স্বাভাবিক।'

'তবে আর দেরি কেন, দেওয়ানসাহেব?'

'কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এই উত্তেজনার মুহূর্তে নাচুনে মশালের আলোয় সেটা আপনাদের চোখে পড়ছে না। বরকন্দাজরা যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের বাধ্য থাকবে এমন কোনো নৈতিক পৃষ্ঠপোষক নেই আপনাদের কাজের। রাজা যুদ্ধ করে, তার শাসন-ভয় তার সৈন্যদের সুশৃঙ্খল রাখে। আপনাদের? তারা যথেচ্ছ লুটপাট ক'রে

বেড়াবে। প্রয়োজন বোধ করলে আপনাদের ত্যাগ করবে না, এমন আশ্বাস আপনি কোথায় পেলেন ?'

আলি খাঁর হাসিতে তার অবজ্ঞা ফুটে উঠলো, কিন্তু প্রত্যুত্তরে গোবর্ধন বললে, 'দেওয়ানজি, আমাদের নৈতিক আদর্শ আছে। সেই নীতি সামনে রেখেই বারিকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। এবং সে-নীতি ইংরেজকে বিতাড়িত করা।'

উত্তাপহীন কণ্ঠে হরদয়াল বললে, 'কিন্তু, গোবর্ধনমাস্টার, কিছুক্ষণ আগেই আমরা মেনে নিয়েছি সৈন্যদের কোনো আদর্শ, কোনো নীতি থাকে না। নতুবা টাকার জন্য একজন বিদেশীর কথায় দেশি লোকের বুকে বন্দুক তাক করতে পারে না। যদি এ-সত্যটুকু স্বীকার ক'রে নাও তবেই বলবো, বড়ো সেনাপতি হওয়ার যোগ্যতা সত্যি আছে আলি খাঁর। তুমি তার পরের কথা বলো। ইংরেজকে তোমরা বিতাড়িত করবে কেন ? কি করেছে তারা ?'

'দেওয়ানজি, আপনি খ্রীস্টান।' বুজরুক উত্তর দিলো ঘৃণা ভরে।

'এর সঙ্গে ধর্মেরও যোগ আছে নাকি ? সিপাহীরা তবে ধর্ম মানে ? আমার ধারণা ছিলো অন্যরকম।'

'আপনার ধারণা যা-ই থাক, আপনি জেনে রাখুন দেওয়ানজি, ইংরেজ সারা ভারতকে খ্রীস্টান না ক'রে ছাড়বে না। আপনাদের মতো ইংরেজ-ওয়ালারা খ্রীস্টান আগেই হয়েছেন। বাকি ছিলো সাধারণ লোক, এবার তারাও হবে। আপনি কি জানেন এন্‌ফিল্ড রাইফেলে টোটার কি কারসাজি হয়েছে ?'

'না, জানি না।'

'তাতে গোরু ও শুয়োরের চর্বি মাখানো থাকে। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীকে তাই দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হয়।'

'এটা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে বটে।'

'আপনি কি জানেন, ইংরেজ হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছে, বিধবা-বিবাহের আইন পাস করেছে?' বুজরুক বললো।

হরদয়াল হেসে বললো, 'গোবর্ধনমাস্টার, তুমি কি বিধবাবিবাহ-আইন মানতে চাও না? বনদুর্গা-চরণের বিয়েতে তুমি কি খুশি নও? ফাঁকি দিয়ে কি কোনো বড়ো কাজ হয়? আমি মানতে পারি এমন কোনো আদর্শই কি তোমাদের নেই?'

রাজু বললে, 'আছে বৈকি। বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তি।'

হরদয়াল বিস্মিত হ'লো। একটু থেমে বললো, 'রাজার উপযুক্ত কথা বলেছেন, রাজকুমার। আলি খাঁ, আপনারও বোধ হয় ইংরেজ-বিতাড়নের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ?'

'তাই যদি হয়?'

'আনন্দের কথাই হবে। ইংরেজরা নিজেরাও এমনি মুক্তির কথা নিজেদের দেশে বলে। কিন্তু মুক্তির পর কে রাজা হবে? দিল্লিতে কি কেউ সম্রাট আছেন? তাঁর রাষ্ট্রশক্তি কি বাংলাদেশ ও নিজাম একই সঙ্গে মেনে নেবে?'

'সে যা-ই হোক, বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ, আর তাদের বিশ্বাসী দেশদ্রোহী মীরজাফররা থাকবে না। জালিয়াত ক্লাইভের কুকীর্তি ধ্বংস হবে।' গোবর্ধন বললো।

'কথায়-কথায় তোমাদের দেরি ক'রে দিচ্ছি। ক্লাইভ জালিয়াত ছিলো, কিন্তু মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক কেন? নবাবকে সরিয়ে নিজে নবাব হয়েছিলো ব'লে? তা যদি হয় আলিবর্দী কি বিশ্বাসহন্তা নয়? প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যদি দোষ না হয়, মীরজাফরের কি দোষ আমি বুঝি না।'

'আর মহারাজ নন্দকুমারকে যারা হত্যা করে?' গোবর্ধন প্রশ্ন করলো।

'তুমি বার্কও পড়েছো ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। তিনি কি দু-হাজার সৈন্য নিয়েও ক্লাইভের গতিরোধ ক'রে দাঁড়াতে পারতেন না? পলাশিতে মীরজাফর তা হ'লে কি করতো? আসল কথা কি জানো, ইংরেজ এসে আমরা বেঁচেছি। তৃতীয় পক্ষের দরকার ছিলো।'

'ছি-ছি, এ কি বলছেন দেওয়ানজি?' রাজু ঘৃণাভরে বললো।

'আমার জ্ঞান মতো কথা বলেছি, রাজকুমার। আমি অনেক দিন ধ'রেই ভেবেছি ইংরেজ আমাদের কাম্য ছিলো। কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ য়ুরোপের তুলনায় কাব্য ও সাহিত্যে হীন ছিলো না। ইংরেজ-পণ্ডিতদের গবেষণায় জানতে পারি খলিফারা সংস্কৃত থেকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, সেই জ্ঞান য়ুরোপেও প্রচারের পথ ক'রে দিয়েছিলো। তখনো ভারতের জ্ঞান য়ুরোপে মহার্ঘ্য ছিলো। তারপর পাঁচ শ' বছর কি হয়েছে? জাতিটা শুধু যুদ্ধই করলো। কখনো পাঠানের বিরুদ্ধে, কখনো মোগলের, কখনো-বা পাঠানের হ'য়ে মোগলের বিরুদ্ধে, কিন্তু যুদ্ধের শেষ হ'লো না। শুধু ধ্বংসই হ'লো, সৃষ্টি হ'লো না। এ তো ভালোই হয়েছে রাজকুমার, কিছুদিন ধ্বংসের শেষ হোক। কিছুদিন না-হয় পরাধীনই রইলাম!'

বুজরুক বললে, 'রাজকুমার, আপনারও কি এই মত?'

'দাঁড়াও আলি খাঁ, আমি আসছি।'

'রাজকুমার, আমাকে ইংরেজের সাহায্য নিতে হবে আপনি যদি বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে চান।' হরদয়াল বললো।

'দেওয়ান!' রাজকুমার গর্জন ক'রে উঠলো।

'থামুন, রাজাভাই থামুন ! আর-একটা বিশ্বাসঘাতককে ইংরেজদের শিবিরে যেতে দিন। আমাদের এই বিদায়-দৃশ্যটা বেশ নাটকীয় হ'লো। আপনার এই গর্জন বহুদিন আমার মনে থাকবে, অবশ্য যদি বহুদিন বাঁচি।'

রাজকুমার দ্রুতপদে রাজবাড়ির দিকে চ'লে গেল।

বুজরুক বললো, 'দেওয়ানজি, বরকন্দাজদের আমি নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তারা গেলে ঘটনাটা আপনি আমার রাজাভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন।' তারপর বুজরুক হেসে বললো, 'শেরের বাচ্চাই শের হয়। দেওয়ানজি, আপনার পূর্বপুরুষরা বোধ হয় নবাবী-আমলে সিহাই নিয়ে কারবার করতো। তারও আগে তারা বোধ হয় বৌদ্ধ ছিলো।'

একজন ভৃত্য ছুটতে-ছুটতে এসে খবর দিলো, রাজকুমার গোবর্ধনকে ডাকছেন।

রাজু তার নিজের ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলো। গোবর্ধন সামনে আসতে তার হাতে পিয়েত্রোর দেওয়া বন্দুকটা তুলে দিয়ে বললো, 'মাস্টার, আলি খাঁকে দেখে রেখো ভাই।'

রাজু পেছন ফিরে চ'লে গেল। গোবর্ধন কথা বলার সুযোগ পেলো না।

গোবর্ধন ফিরে এলে বুজরুক বললো, 'রাজাভাই আসবেন না। চলো, আবার দেখা হ'লেও দেখার শেষ কখনো হবে না। দেওয়ানজি, আমরা হাসিমুখেই চললাম।'

হরদয়াল এগিয়ে এসে বললো, 'গোবর্ধন, তুমি আর-একটু ভেবে ছাখো।'

'দেওয়ানজি, আপনার মতো ধীশক্তি আমার নেই। কিন্তু আপনি

কি ডানকানদের মতো কুঠিয়ালদেরও দেখতে পান না? আপনি কি আপনার গ্রামের নিঃসম্বল তাঁতীদের দেখেও বুঝতে পারছেন না?'

সদরের বাইরে থেকে বুজরুক ডাকলো, 'এসো গোবর্ধনমাস্টার, এসো।'

রাজু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলো— কালো রাত্রির গায়ে লাল মশালগুলো দুলছে। তার মনে হ'লো মশালগুলো যেন গাঢ় অন্ধকারের জলন্ত অগ্নিক্ষরা হৃৎপিণ্ড।

॥ তেইশ ॥

সে-রাত্রিতে রাজুর ভালো ঘুম হয় নি। দেওয়ানের ঘুম বার-বার ভেঙে গিয়েছিলো। বনদুর্গা অনেক রাত অবধি কান্নাকাটি করেছিলো। চরণদাস সবই জানে, বনদুর্গা নিজেই তাকে বলেছে, তবু কিছু যেন সে লুকোতে চায়। বনদুর্গার প্রথম স্বামীর, সেই বালক-স্বামীর সঙ্গে উপভুক্ত কোনো এক আনন্দের স্মৃতির ব্যাপারে কতকটা এ-রকম অনুভব তার হয়েছে। বর্তমানে সে কেউ নয়, তার কথা বলা যায় না চরণকে, গোপনে থেকে সে-স্মৃতি তার নিজের শিশুটির মতো বোবা আগ্রহ জানাতে থাকে। গোবর্ধনমাস্টারের কথাগুলোও ভোলা যায় না। লোককে বলার মতো কথাও নয়।

ভোরের দিকে রাজু ঘুমিয়ে পড়েছিলো। রূপচাঁদ এসে তাকে ডেকে গেছে। অনেকটা বেলায় ঘুম থেকে উঠে রাজু তখনো বিছানাতে ব'সে আছে। রূপচাঁদ আবার ডাকলো।

'কি রে?'

'মন্‌সেনে পিয়েত্রোর লোক ভোর থেকে ব'সে আছে।'

'কি চায়?'

'পিয়েত্রো একটু বেশি অসুস্থ। আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।'

'তাকে যেতে ব'লে দাও। পালকি-বেহারাদের খবর দিয়ো।'

পালকিতে চেপে রাজু পিয়েত্রোর বাড়িতে গিয়েছিলো। পিয়েত্রোর স্বাস্থ্যের অবনতি রোধ করতে পারে নি বাগচীর চিকিৎসা। বিশেষ ক'রে বুজরুকের চ'লে যাওয়ার ঘটনাটা যেন তার অসুস্থতা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাল সারা রাত অসুস্থ প্রৌঢ় ঘর-বার করেছে অস্বস্তিতে।

'সদর থেকে ডাক্তার আনাই ?'

'তোমার ইচ্ছে রাজু। আমি কাল সারা রাত্রি ভেবে এইটেই শান্তির হবে ব'লে বোধ করেছি। আমার জন্য আমি চিন্তা না ক'রে সেগুলো তোমার উপরে ছেড়ে দেবো (পিয়েত্রো এই জায়গাটায় একটু হাসলো)। আমার ছেলে থাকলেও এ-রকম ব্যবস্থাই হ'তো, তাই নয় ?'

পিয়েত্রোর বারংবার যে-কথা বলার ইচ্ছা হ'লো, যে-কথা শুনবার আগ্রহ রাজচন্দ্র অতিকষ্টে দমন করেছিলো, সেটা পিয়েত্রো সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল। বুজরুক যেন কেউ নয়।

বাড়িতে ফিরে রানীর কাছে গিয়ে রাজু বললে, 'কি করি মা ? পিয়েত্রো যেন একখানা কঙ্কাল হ'য়ে গেছে। তাঁকে কি বাঁচানো যাবে না ?'

রানী চুপ ক'রে থেকে অবশেষে বললেন, 'চেষ্টা ক'রে ছাখো।'

'আমি এখুনি একটু সদরে যাবো ভাবছি। সেখানে গ্রেসাম নামে এক ডাক্তার আছে। তাকে নিয়ে আসি।'

'তোমাকে যেতে হবে না, লোক পাঠিয়ে দাও।'

রাজু অতঃপর মনের মতো লোক খুঁজতে লাগলো। দেওয়ান হ'লে সব চাইতে ভালো হ'তো। কিন্তু গত রাত্রির তীব্র বিমুখতা এখনো সে বিস্মৃত হয় নি, বরং নামটা মনে হ'তেই রাজুর চোয়াল দুটি কঠিন হ'য়ে উঠলো। সদর-নায়েবকে দিয়ে এ-কাজ হবে না। বিশেষ ক'রে গোবর্ধন হঠাৎ চ'লে যাওয়ায় তার সংসারের অবস্থা কিরকম হয়েছে কে জানে। রাজু ভেবে স্থির করলো বাগচীর কাছেই প্রস্তাব করবে।

দুপুরে নিজের ঘরে ব'সে রাজুর সহসা দুঃসহভাবে একা বোধ হ'লো। এমন নয় যে গোবর্ধনের সঙ্গে তার রোজ সাক্ষাৎ হ'তো। তবু মনে

হ'লো এই গ্রামে গোবর্ধন নেই। আলি খাঁর কথা মনে হ'তে তার চোখের কোণ দুটি ভিজে উঠলো।

দেওয়ান সকালে উঠে স্নান শেষ ক'রে কাছারিতে গিয়েছিলো। ভৃত্য এসে খবর দিলো, প্রাতরাশ দেওয়া হয়েছে। দেওয়ান অভ্যাস মতো দেওয়ান-ভবনে ফিরেছিলো, কিন্তু প্রাতরাশ সম্মুখে রেখে দীর্ঘসময় ব'সে রইলো। কাল রাত্রির অতগুলি কথার মধ্যে দুটি কথা তার মনে গেঁথে আছে। বুজরুক আলি তাকে বলেছিলো প্রকারান্তরে মসীজীবী। আর গোবর্ধন উল্লেখ করেছিলো ডান্‌কানের কথা।

নিজেকে দুর্বল বোধ হ'লো হরদয়ালের। রাত্রিতে ঘুম না হ'লে দেহ ক্লান্ত হয়, মনও ক্লান্ত হয় এটা হরদয়ালের মনে হ'লো না। ইতিহাসে-পড়া দুঃসাহসী দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে বুজরুকের সান্নিধ্য অনুভব করলো সে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিদ্বেষ ছাড়া ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই তার নেই। বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হ'লে তার লাভ নেই, যেমন নেই ইংরেজের রাজত্বে ক্ষতি। কিন্তু জোয়ান অব আর্ক ইংরেজদের বিতাড়িত করেছিলো কেন? আপাতদৃষ্টিতে অপদার্থ বাহাদুর শা'র মতো একজন রাজকুমারকে রাজা করার জন্যই। তবু জোয়ান নেপোলিয়োঁর চাইতেও বড়ো।

কিন্তু গোবর্ধনের স্বল্পোচ্চারিত অনুযোগের ভাষাটা বুজরুকের শ্লেষের চাইতে তীব্র। ডান্‌কানদের অত্যাচারের কথা হরদয়াল জানে। ডান্‌কানদের মনোভাবও সে জানে। হরদয়ালের মনে হ'লো, গোবর্ধন-মাস্টার যেন মাস্টারিভাষায় তার অঙ্কের হিসাবে গোড়ার ভুলটা দেখিয়ে দিয়েছে।

'খাবো না। এগুলো নিয়ে যা। রাত্রিতে ঘুম হয় নি, অরুচি বোধ হচ্ছে।' ভৃত্য এলে হরদয়াল বললো, 'পিপাসা পেয়েছে।'

কিছুক্ষণ পরে সে মদের ছোটো গ্লাসটি হাতে নিয়ে তার লাইব্রেরি-ঘরটার জানলার এ-পারে গিয়ে দাঁড়ালো। তাক্-এ শেল্ফে কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বই জ'মে উঠেছে। জানলার তাক্-এ মদের গ্লাসটি রেখে হরদয়াল লাইব্রেরিতে ঢুকলো। খানিকটা সময় কাটিয়ে তার মন অনেকটা সুস্থির হ'লো। বসবার ঘরে ফিরে এসে আরামকেদারায় শুয়ে ভৃত্যের হাত থেকে গড়গড়ার নলটা নিলো।

কিন্তু যুদ্ধ আর চাই না। পাঁচ শ' বছরের যুদ্ধই যথেষ্ট। এখন মস্তিষ্কে অগ্রসর হ'তে হবে।

নলটা রেখে হরদয়াল ভৃত্যকে ছাতা আনতে বললো।

'বাইরে যাবেন, হুজুর?'

'হ্যাঁ, অনেকদিন স্কুলে যাই নি।'

হরদয়াল স্কুলে গিয়ে স্কুলের ঘর তৈরির কাছেই সাধারণত দাঁড়িয়ে থাকে। আজ সে পড়বার আটচালায় গিয়ে উঠলো। বাগচী তখন কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেকে কি-একটা অঙ্ক কষাচ্ছে। আটচালার অপর প্রান্তে কৈলাসপণ্ডিত কয়েকটি ছেলেকে গোলমাল করতে নিষেধ করছে, কিন্তু তাদের কোলাহল থামছে না।

বিচক্ষণ দেওয়ান হরদয়াল স্কুল-ঘরটার চারিদিকে চেয়ে নিলো, তারপর বললো, 'আপনাদের একজন শিক্ষককে অনুপস্থিত দেখছি। সেইজন্যই গোলমাল?'

বাগচী বললো, 'দেওয়ানজি, আমাদের গোবর্ধন তীর্থ করতে গেছে, ফিরতে দেরি হবে।'

'তা হ'লে একজন নতুন শিক্ষকের খোঁজ করুন।'

'আপনার হুকুম হ'লেই করবো।'

'স্কুলবাড়িটা তৈরি শেষ হ'লে আর দু-জন দরকার হ'তো। আপাতত একজনকেই নিয়োগ করুন। আপনার স্কুলে ইতিহাস পড়ানো হয়?'

'কিছু-কিছু হচ্ছিলো। গোবর্ধনই পড়াতো।'

'যদি মাস্টার তাড়াতাড়ি না পান, আমাকে খবর দেবেন।'

হরদয়াল স্কুল-ঘর থেকে নামলো।

একটা ছেলে এগিয়ে এসে বললো, 'হুজুর, আজ আমাদের ছুটি।'

'ছুটি! ছুটি কেন?'

ছেলেরা হরদয়ালের চারিদিকে ততক্ষণে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজন বললে, 'হুজুর, আপনি এসেছেন ব'লে।'

হরদয়াল হাসলো। বললে, 'আমি এসেছি ব'লে? আচ্ছা, যাও, দু-দিন ছুটি তোমাদের।'

ছেলেরা বন্যার মতো ছুটতে শুরু করলো। বাগচী ও হরদয়াল সেই বন্যায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য পথ খুঁজতে লাগলো।

॥ চব্বিশ ॥

সদরের ডাক্তার গ্রেসাম আসতে পারে নি। কি-একটা রাজ্য-সংক্রান্ত কাজে কালেক্টর কলকাতা গিয়েছিলো, সেদিকে নাকি খুব গোলযোগ, তার কাজ চালাচ্ছে গ্রেসাম। সে তার এক সহকারীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো, তার নাম লী-হাউস। লী-হাউসের বয়স কম কিন্তু দেশে সে একজন এপথিক্যারীর কাছে শিক্ষানবীশ হিসাবে ছিলো। ডাক্তারী জানে, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। পিয়েত্রো একটু যেন ভালো আছে।

লী-হাউসকে বাগচী নিজের বাসায় একবেলা রেখেছিলো, কিন্তু বিকেলের দিকে ডান্‌কান খবর পেয়ে নিজেই এসেছিলো। বাগচীদের বাসা থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে সইসকে পাঠিয়ে দিলো ডাক্তারকে খবর দেওয়ার জন্য।

লী-হাউস বেরিয়ে এলে সে বললো, 'হ্যালো ডক্। তুমি এসেছো আমি এ-খবরটা সকালে পাই নি। এখন চলো তো আমার কুঠিতে।'

লী-হাউস বললে, 'আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারলাম না।'

ডান্‌কান হোহো ক'রে হাসতে-হাসতে বললো, 'একজন ইংরেজ কৃষক।'

'তা তো বুঝতে পারছি।'

'আমি থাকতে আপনার কি একটা হিদেনের বাড়িতে ওঠা ভালো দেখায়?'

বাগচীর মুখটা ম্লান হ'য়ে গেল।

'এরা তো হিদেন নয়, খ্রীস্টান।'

ডান্‌কান আবার হাসলো, 'আপনি গ্রেসামের ছাত্র এবং গ্রেসাম আমার বন্ধু, আমি সেই হিসেবে আপনাকে আহ্বান করছি।'

'কিন্তু তা কি ভালো দেখায়? এঁদের রোগী। রোগী দেখতে

এসেছি তো। অবশ্য আপনার কুঠিতে গেলেও রোগী দেখতে অসুবিধা হবে না। আপনি এঁদের বলুন না।'

ডান্‌কান বললো, 'অবশ্যই আমি এমন যুক্তি দেখাতে পারতাম, যার পর আপনি ও-বাড়িতে থাকতে রাজী হতেন না। আমি কারো মনে আঘাত দিতে চাই না। আপনি আমার কুঠিতে আসুন। গ্রামের লোকরাই তাদের আলাপে এমন অনেক কথা বলবে যাতে আপনি বুঝতে পারবেন কেন বাগচীর বাড়িতে কোনো ভদ্রলোকের থাকা উচিত নয়।'

লী-হাউস একটু দ্বিধায় পড়লো। বাগচী এগিয়ে এসে বললো, 'মিস্টার লী-হাউস, কথাটা এক দিক দিয়ে খুব সত্যি। আমার মনে হচ্ছে এখানে থাকলে আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট করার মতো অনেক ঘটনা ঘটতে পারে। ডাক্তারের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হওয়া রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর। আপনি ডান্‌কানসাহেবের কুঠিতে যান।'

লী-হাউস চ'লে যাবার পর একদিন কেট বলেছিলো, 'বাগচী, তোমার কি লজ্জা ব'লেও কিছু দেহে নেই?' বাগচী তার বার্লি-স্যুপের বাটিটায় চুমুক দিচ্ছিলো, হেসে বললে, 'আমাদের দেশে একটা কথা আছে, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।'

'ও-রকম কাপলেট আমাদের দেশের কৃষকদের মুখেও শুনতে পাবে। তাই ব'লে তারা যা বলে সেটাই মানুষের নীতি নয়।'

'কি অন্যায় করেছি, বুঝিয়ে বলো।'

'লী-হাউস তোমার ডাক্তারিকে অপমান করে নি?'

'করেছে।'

'সে তোমার আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করেছে।'

'তা বটে।'

'তুমি তবু তার কম্পাউণ্ডারি করবে? সে কি বুঝেছে তোমার

ডাক্তারির পেছনে কত বড়ো হৃদয় থাকে ? তুমি তবু তারই ব্যবস্থা মতো ওষুধ ঢেলে-ঢেলে খাওয়াবার জন্যই পিয়েত্রোর কাছে যাবে।'

'তাই তো বটে, কেট। তা হ'লে আমি যাবো না। আমার যাওয়া উচিত নয়। সে তো টাকা নিয়ে গেছে, তিন দিনে সে পাঁচ শ' টাকা নিয়ে গেল। আর আমি বিনি পয়সায় চিকিৎসা ক'রে বেড়াই।'

বাগচী তার প্রিয় সোফাটায় ব'সে পাইপ ধরালো। তার ভঙ্গিতে মনে হ'লো, আর কেউই তাকে তুলতে পারবে না। কেট গৃহ-কাজে চ'লে গেল।

কিন্তু আধ-ঘণ্টা পরে কেট কি-একটা কাজে ঘরে এসে দেখলো বাগচী নেই। দেখলো, তার তামাকের ছাই ঢালবার পাত্রটা দিয়ে একটা কাগজ চাপা দিয়ে রেখে গেছে সোফার উপরে। বাগচী চিঠি লিখেছে :

> ডার্লিং কেট, সুইটি, তুমি রাগ কোরো না। কথাটা তামাক খেতে-খেতে মনে হ'লো। লী-হাউস আমাকে অপমান করেছে বটে কিন্তু আমি লী-হাউসের কাছে যাচ্ছি না। পিয়েত্রোকে ওষুধ দেওয়া দরকার, সেই জন্যেই যাচ্ছি। আজ পিয়েত্রোর বাড়িতে উপাসনা করবো। ফিরতে রাত হবে। তোমার—

চিঠিটা প'ড়ে কেটের হাসি পেয়েছিলো।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বাগচী বললো, 'কেট, পিয়েত্রোর মতো চরিত্র আমি আর দেখি নি। কাল সন্ধ্যেবেলা তুলে বসিয়ে দিলাম বাইরের চেয়ারে। বললো— বাগচী, একটু মদ খেতে পারি ? গ্লাসে মেপে একটুখানি দেওয়া হ'লো। আবার বললে— তামাক খেতেও পারি নিশ্চয়। তামাক তো খানই। গড়গড়া এল। গড়গড়া টানতে-টানতে অনেক গল্প করলেন। সেকালের কথা। অদ্ভুত ব্যাপার সে-সব। ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধের কথা এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন, যেন চোখের সম্মুখে ঘটছে।'

'বুড়োরা অনেক সময়ে ও-রকম বলতে পারেন।'

'কিন্তু পিয়েত্রো সাধারণ বুড়ো নয়। সন্ধ্যেবেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বাইস্ নামে একটি মেয়ের গল্প তিনি বললেন। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। কাজিন ছিলো বোধ হয় পিয়েত্রোর। মামার মেয়ে হবে ব'লে আমি আন্দাজ করেছি।'

'বাইস্ তার কেউ ছিলো, এ আমরাও আন্দাজ করেছি।'

'কিন্তু সবটুকু নিশ্চয়ই জানো না। বাইস্‌কে পিয়েত্রো ভালোবাসতেন, কিন্তু বিয়ে হয় নি। এ-দেশী এক রাজার বাড়িতে আছে বাইস্ কোনো-এক অখ্যাত রাজার স্ত্রী হ'য়ে। প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা।'

'অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। ধনরত্নের লোভে মেয়েটি বিয়ে করেছিলো। ভারতীয় রাজাদের ধনরত্ন প্রবাদে বিখ্যাত।'

'একটু অসাধারণত্ব আছে। ভারতীয় রাজাদের একাধিক বিবাহ হয়।'

'তা হ'লে তো আরও খারাপ। তা হ'লে বাইস্ উপপত্নীদের একজন। তুমি নিশ্চয় বহু বিবাহের সমর্থনে বক্তৃতা দেবে না।'

'কেট, তোমার আজ মন ভালো নেই। বিষয়টা তুমি ধরতে পারছো না। বাইস্ কর্তব্যবোধে বিবাহ করেছিলো, ভালোবেসে নয়; অথচ পিয়েত্রো বলেন, বিবাহের কথা উঠতেই যদি তিনি স'রে না দাঁড়াতেন, যদি বাইস্‌কে জানাতেন তাঁর ভালোবাসার কথা, হয়তো বাইস্ রাজী হ'তো।'

'তা হ'লে তো পিয়েত্রো কাপুরুষ।'

বাগচী ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে-ধীরে বললো, 'তা আমি মনে করতে পারছি না। পিয়েত্রো তাঁর মামার কথা ভেবেই পিছিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মামা ভারতীয়। এ-বিবাহ হ'লে তাঁর মামার সমাজে অসুবিধা হ'তো।'

'বাইস্ ভারতীয় মহিলা ? পিয়েত্রোর মামা ভারতীয় ?'

'হ্যাঁ। আমাদের স্কুলটি পিয়েত্রোর মা-র নামে উৎসর্গ করা।'

কৌতূহলে কেটের বিরক্তিবোধটা ক'মে গিয়েছিলো।

'কী আশ্চর্য !'

'রাজকুমার পিয়েত্রোর মামার কথা জানতেন ; বাইসের কথা আমার সঙ্গে একত্রেই শুনেছেন। তিনি শুনে প্রস্তাব করলেন, সেই রাজাকে খবর দিলেই হয়। পিয়েত্রো নিষেধ করলেন।'

'কেন, অপমান হওয়ার ভয় ?'

'না। বরং বাইস্ খবর পেলে আসবার জন্য প্রাণপণ করবে অথচ আসতে না পেরে কষ্ট পাবে। রাজবাড়ির ঠিকানা পিয়েত্রো বলেন নি, কাউকে জানতে দেওয়া তাঁর ইচ্ছে নয়।'

কেট বিরক্ত মুখে আহার্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। অপ্রতিভের স্বরে বাগচী বললো, 'তুমি লী-হাউসকে লেখা চিঠিটা ভুলতে পারছো না, কেট।'

একটু ইতস্তত ক'রে কেট বললো, 'লী-হাউস রাজার জাতি আর তুমি বাঙালি ব'লেই কি বিনয়ের এই আতিশয্য ?'

হাসির চেষ্টা ক'রে বাগচী বললো, 'কুটুম্ব-দেশের লোক তো !'

অন্য অনেক সময়ে বাগচীর এই উক্তি কাজ করলেও আজ কেটের মুখের স্বাভাবিক হাসি ফিরলো না। বাগচী বললো, 'তুমি তো জানো কেট, শ্বশুর মৃত্যুশয্যায় আমাকে কয়েকটি কর্তব্যের ভার দিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে একটির কথা বলি তোমাকে : লী-হাউসকে ক্ষমা করা, তিনি লী-হাউসকে ক্ষমা করেছেন, মৃত্যুশয্যায় তার জন্যই প্রার্থনা করেছেন এ-কথা জানানো দরকার, তবে এ লী-হাউস নয়, তার নাম এমব্রোসিয়াস। যদি এর কাছে খোঁজ পাওয়া যায়, এ-জন্যই চেষ্টা করছি।'

কেটের চোখ দুটি ঝকঝক করতে লাগলো বটে কিন্তু তার মনোভাব কিছু বোঝা গেল না।

বাগচী উঠে দাঁড়ালো।

'কখন ফিরবে? এ-বেলাতেই আসবে তো?'

'হ্যাঁ, ভালো দেখি তো তাড়াতাড়ি চ'লে আসবো। তোমার মন ভালো নেই, রাজকুমারকে ধ'রে আনবো।'

ভ্রূকুটি ক'রে কেট বললো, 'কেন?'

'অনেকদিন তোমরা বাজাও না। আচ্ছা, একদিন নাচের ব্যবস্থা করলে পারো।'

'পাদ্রির স্ত্রী নাচে না।'

'রাম কহ, আমি কি পাদ্রি নাকি?'

বাগচীর বাসায় কথাটা উঠেছিলো ডান্‌কানের রটনা নিয়ে। সেখানে রাজুও ছিলো। বাগচী পিয়েত্রোর বাসা থেকে ফিরতি-পথে তাকে ডেকে এনেছিলো। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়।

পথে যে-আলোচনাটা হচ্ছিলো, তারই জের টেনে এনে বাগচী বললো, 'ডান্‌কান যা বলেছে তার সবটুকু মিথ্যা এ আমি বলতে পারবো না। প্রতিবাদ আমি কি ক'রে করি। আমার মনে হয়, তার অনেকাংশই সত্য। ভারতে কেটের মতো এমন রূপসী ইংরেজ-মহিলা ক'জন আছে? সিভিলিয়ান স্বামী পাবার উপযুক্ত রূপ-গুণ নিশ্চয়ই আছে কেটের। তারা যদি কেটকে পাবার চেষ্টা করতো, সাধ্য কি আমার, আমি এগিয়ে যাই। খ্রীস্টান-সমাজে যদি আমার শ্বশুরের স্থানচ্যুতি না হ'তো তবে আমি কোন সাহসে আমার হৃদয় নিয়ে অগ্রসর হতাম, রাজকুমার?'

রাজু বললো, 'কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সমাজে পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ গর্হিত

কোনো অপরাধ নয়। আপনার শ্বশুরের ধর্মমত, আপনার কাছে যা শুনলাম, তথাকথিত সভ্য য়ুরোপে হয়তো তার জন্য জীবন্ত দগ্ধ করার ব্যবস্থা ছিলো এককালে; কিন্তু আমাদের দেশে শাক্তর ছেলে বৈষ্ণব হয়, বৈষ্ণবের ছেলে শৈব হয়। তাতে তার আত্মীয়স্বজন হয়তো কষ্ট পায়, কিন্তু তাই ব'লে তাকে গর্হিত অপরাধ বলে না। সমাজে তাকে সমাদর করার লোকও থাকে।'

'আমিও অপরাধ বলি না। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করবো কি ক'রে, সাধারণ অবস্থায় কেটকে পাবার সৌভাগ্য আমার মতো লোকের হ'তো না। ডান্‌কান যা বলছে তা ঘটনা। হয়তো সে বিদ্বেষপ্রসূত হ'য়ে রটাচ্ছে, কিন্তু যা রটাচ্ছে তার সবটা মিথ্যে নয়।'

রাজু বিরক্ত হ'য়ে বললো, 'এতক্ষণ আপনি তাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমার একটা মত আপনাকে জানাতে হচ্ছে মাস্টারমশাই। সত্যের প্রতি আপনার অসীম শ্রদ্ধা আছে, তাই ব'লে সব সময় সেটার প্রয়োগ ভালো নয়। লক্ষ্য করতে হবে সত্যের প্রয়োগে কারো মনে বেদনা হচ্ছে কিনা।'

বাগচী তিরস্কারটা নিঃশব্দে মেনে নিলো। ট্যাঁকঘড়িটা খুলে সে বোকা-বোকা মুখ ক'রে বললো, 'রাজকুমার, আপনাকে পথে বলেছি, দেওয়ানজি আমাকে ডেকেছিলেন, অনুমতি করুন, আমি একটু ঘুরে আসি। আমি যাচ্ছি, কেট। পৃথিবীর সর্বোত্তম সঙ্গীদের একজন তোমার কাছে রইলো। রাজকুমার, আপনি যা বললেন, আমি যাওয়া-আসার পথে চিন্তা করবো। নিশ্চয় আপনার কথার মূলে কোনো বিরাট সত্য আছে।'

বাগচী চ'লে গেলে রাজু বললো, 'কাজটা আমি ভালো করলাম না, কেট। মাস্টারমশাইয়ের মতো একজন জ্ঞানী লোককে অমন ক'রে কথা

বলার অধিকার আমার নেই। কিসে মানুষের অপকার হয় তা বোধ হয় তিনি আমার চাইতে বেশি বোঝেন। তোমার ছলছল চোখ দেখেই আমার কষ্ট হয়েছিলো। আর সে-জন্যই তাঁর মনে কষ্ট দিতে বাধ্য হলাম।'

কেট বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার সে তিক্ত হেসে বললো, 'তার জন্য কি আপনি খ্রীস্টানি কায়দায় ক্ষমাও চাইবেন ?'

'না কেট। ক্ষমা চাইতে আমি পারবো না। তবে চেষ্টা করবো যাতে তিনি ব্যাপারটাকে আমার ঔদ্ধত্য মনে ক'রে অপমানিত বোধ না করেন। একটা কথা কি জানো, কোথায় যেন একটা ভুল হ'য়ে যাচ্ছে। তুমি সমাজে পরিত্যক্তা ছিলে এর প্রচারটাই হচ্ছে, লোকে বুঝতে পারছে না তোমাদের সামাজিক দীনতা এমন নয় যে কোনো পুরুষ তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবে।'

রাজচন্দ্রর মনে হ'লো কেট যেন মূর্ছিত হবে। তার মুখে রক্তের চাপ কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। কিন্তু টেবিলের একটি কোণ শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে কেট বললো, 'রাজকুমার, আমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করায় কোনো পুরুষেরই কুণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই ?'

হয়তো কোনো বাঙালি মেয়ে কথাটাকে আরো মধুর ক'রে বলতে পারতো।

রাজু বললো, 'না কেট, তুমি রমণীরত্ন।'

একটু চুপ ক'রে থেকে কেট বললো আবার, 'রাজকুমার, আপনাদের ভাষায় রত্ন কথাটা বোধ হয় খুব মূল্যবান নয়।'

'কেন কেট ?'

'মূল্যবান হ'লে কি আর রং জ'লে যায় এত তাড়াতাড়ি।'

রাজুর মনে হ'লো হয়তো-বা বাগচী অনাদর করে কেটকে, কিন্তু

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কথা মনে হ'তেই সে কুণ্ঠিত হ'লো। সে বললো কথাটাকে লঘু করার জন্যই, 'কেট, রত্ন যখন নিজের আয়ত্তে আসে তখন মানুষ সব সময়ে তার কথা মনে ক'রে ব'সে থাকে না। সে-রকম যদি কেউ থাকে তবে তাকেই অস্বাভাবিক বলতে হবে। কেট, তোমার ওই চোখ দুটি, ওর মূল্য কি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মণির চাইতেও বেশি নয়? কিন্তু তুমি কি দিনরাত চোখের মণির কথা ভাবো?'

'তা ভাবি না।'

'আচ্ছা, আমি এখন চলি।' হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো রাজু।

'এখন আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে নেই। এখন না গেলে কি খুব ক্ষতি হবে?'

'তা হবে না। কিন্তু আমি তোমাদের ভয় করতে আরম্ভ করেছি। বিশেষ ক'রে তোমার কর্তাটিকে। তাঁর ধীর শান্ত স্বভাবের আড়াল থেকে তাঁর সত্যভাষণগুলি গুপ্তির তীক্ষ্ণধার জিহ্বার মতো প্রকাশ পায়। বুড়ো হ'লে মানাতো।'

'রাজকুমার!'

'কি হ'লো, স্বামীনিন্দা সহ্য হচ্ছে না?'

'তা একটু না-হয় সহ্যই করি। এইমাত্র যা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা শুনলে বোধ হয় আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটাই বদ্‌লে যেতো। আমি সত্যি বাগচীর মতো ক্ষমা করতে পারি না। তার মতো সত্যের খাতির করি না। মাঝে-মাঝে মনে হয় আর-একটু কম খ্রীস্টান হ'লে বোধ হয় আমার পক্ষে ভালো হ'তো। অন্য সময়ে ভাবি, খ্রীস্টানরা ভালোবাসতে জানে না।'

রাজু অস্বস্তি বোধ করলো, কিন্তু হাসিতে সেটা আড়াল ক'রে বললো, 'এটাকে কি তোমাদের কনফেশ্যন বলে?'

কথাটা সে বাগচীর কাছে সন্ত শিখেছে।

'না রাজকুমার, অত বড়ো সাহস আমার নেই। আমি দ্বিধায় পড়েছি। কতগুলি লোককে আমি ঘৃণা করতাম, অন্য কয়েকজন লোককে আমি ভালোবাসতাম। যদি এতদিন পরে সেই ভালোবাসার পাত্রগুলিও ঘৃণার হ'য়ে দাঁড়ায় তা হ'লে আমি কি করবো ভেবে পাই না।'

'এমন হঠাৎ হ'লো কেন, কেট? তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। আচ্ছা, এখন থাক, পরে এক-সময়ে আমি তোমার কথা শুনবো।'

কেট দ্বিধা করলো, বললো, 'আপনি বসুন, আমি আসছি।'

খানিকটা সময় বাদে কেট ফিরলো। ইতিমধ্যে সে চোখেমুখে জল দিয়ে নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করেছে বোঝা গেল।

রাজু বললো, 'বাহ্, এই তো আমাদের পুরনো কেট। একটু পিয়ানো বাজাও, মন ভালো ক'রে বাড়ি যাই।'

'রাজকুমার, আপনি বাইসের গল্প শুনেছেন? তেমনি আর-একটি গল্প আমি আপনাকে বলবো। প্রেমের গল্প, যা একটি ভদ্রলোককে একটি ভদ্রমহিলার হয়তো বলা উচিত নয়।'

রাজু বোধ করি সন্ধ্যাটাকে লঘু করার জন্যই বদ্ধপরিকর ছিলো। সে বললো, 'ভদ্রমহিলারা প্রেমের গল্প আদৌ যদি বলেন তবে সেটা ভদ্রলোককেই বলা উচিত।'

কেট বললো, 'বাইসের কথা শুনেই আমার মনে হ'লো গল্পটা। আপনি তো জানেন, এ-দেশে ইংরেজদের সমাজে সুন্দরী মহিলাদের অত্যন্ত চাহিদা আছে। কাজেই যার স্ত্রী সুন্দরী ও মধুরস্বভাবা সে স্বভাবতই সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান পায়। তেমনি এক পাদরি-দম্পতির কথা বলছি। বিবাহের অল্প পরে ইংল্যাণ্ড থেকে এসে সহজেই সমাজে একটা উঁচু স্থান ক'রে নিলো তারা। পুরুষটি ছিলো শান্তস্বভাব, মৃদুভাষী, ধর্মভীরু। লেখা-

পড়া নিয়েই থাকতো। কিছুদিন পরে সেই দম্পতির বাড়িতে এক অতিথি এল। লোকটির আত্মীয়-স্বজনের ধারণা ছিলো সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু দূরপ্রাচ্যে, চীনদেশে তরোয়াল বন্দুক সম্বল ক'রে সে ঘুরে বেড়াতো। তাকে দেখে পাদরি-দম্পতির আর আনন্দ ধরে না। তারা দেশে খবর দিলো, হারানো মানুষ পাওয়া গেছে। পাদরি তার ধর্মপ্রচারে দূর-দূর দেশে ঘুরে বেড়ায় আর তার কমলালেবুর বাগানে ঘেরা বাংলোতে সুখে দিন কাটায় সেই হারানো মানুষ পাদরি-স্ত্রীর মনোরম সাহচর্যে। এখানে আপনার জেনে রাখা উচিত, রাজকুমার, সেই মানুষটি পাদরি-জায়ার মামাতো ভাই-ই নয় শুধু, প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকও বটে।'

কেট থেমে-থেমে ব'লে গল্পটার প্রথম পর্ব শেষ করলো।

রাজচন্দ্র বললো, 'তোমার গল্প নর-নারীর সম্বন্ধের যেদিকে যাচ্ছে তার উত্তর দিতে আমি কি পারবো, কেট?'

'আপনি না পারলে চলছে না রাজকুমার, কোনো-একজনকে জিগ্যেস না ক'রে প্রশ্নটার সমাধান করতে পারছি না।'

কেট তার গল্প শুরু করলো, 'প্রায় ছ'মাস পরে স্বামীটি বললো, ঘুরে এসো কিছুদিন দেশ থেকে। স্বাস্থ্যটা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। লোকটি আবার প্রায় এক বৎসরের জন্য উধাও হ'য়ে গেল। হয়তো সে তার নিজের দুর্বলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই পালিয়েছিলো। এক বৎসর পর স্বামীটি আবার তাকে আবিষ্কার করলো একটি কুৎসিত জায়গা থেকে। হলুদ রঙের একটি কঙ্কাল সে তখন। আবার তাকে বাড়ি নিয়ে এল। স্ত্রীটি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। সে তখন মা হয়েছে। কিন্তু আত্মীয় যে, তাকে কি ত্যাগ করা যায়। স্বামীটি তাকে সেবা ক'রে সারিয়ে তুললো। আর তার চাইতে বড়ো কথা, অনিচ্ছুক স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে ঘৃণা জয় করতে সাহায্য করলো, উপদেশ দিলো ঘৃণিতকে সাহচর্য দিতে।'

'তারপর ?'

'তারপর, মনে করুন, সেই হারানো মানুষটির নাম লী-হাউস। আফিম ছাড়লো সে পাদরি-জায়ার সঙ্গ পেয়ে, আর আফিমে যা চাপা ছিলো সে-আবাল্য ব্যর্থ কামনা দুঃসহ হ'য়ে প্রকাশ পেলো। একদিন হারানো লী-হাউসের সঙ্গে মহিলাটি দেশে চ'লে গেল।'

'সেই মেয়েটিকে ফেলে! এই কুৎসিত ঘেঁটে লাভ কি, কেট ?'

কেটের চোখ দুটি চকচক ক'রে উঠলো। সে বললে, 'রাজকুমার, প্রেমের জাতি নেই, তার সময়-অসময়ও নেই। নতুবা আমিই-বা বাগচীকে ভালোবাসবো কেন ? বিবাহহীন প্রেম কুৎসিত, না প্রেমহীন বিবাহ কদর্য, এ আমার প্রশ্ন নয়। আমি শুধু ভাবছিলাম পিয়েত্রো জোর করলো না, সহ্য করলো, ঠকলো, সে-ই বড়ো, না, আমার গল্পের সেই হারানো মানুষটি যে একটি বিবাহ-ব্যবস্থা চূর্ণ ক'রে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করলো ?'

'প্রেমেরই প্রতিষ্ঠা কি ?'

'নতুবা গল্পের স্বামীটি ঘটনাটিকে স্বীকার ক'রে নিতো না, তাই নয় ?'

'ঘৃণাও হ'তে পারে, ক্ষমাও হ'তে পারে।'

'সেইটি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেটা ঘৃণা, না ক্ষমা ?'

'হার-স্বীকারই যদি হয় !'

'তা হ'লে প্রেমের প্রতিষ্ঠা আপনি স্বীকার করছেন ? স্বামীটি কি বুঝতে পেরেছিলো তার বিবাহ ও প্রাক্‌বিবাহের আলাপের চাইতে অন্য পক্ষের আবাল্য প্রেম অনেক বেশি ক্ষমতাশালী ছিলো ? সে-ক্ষেত্রে অক্ষমের বিদ্বেষ থাকাও কি উচিত ছিলো না ?'

রাজু একটু চিন্তা করলো। তারপর হেসে বললো, 'কেট, এটাকে আমি একটা জটিল গল্প ব'লে মেনে নিলাম। আপাতত তুমি তিনটি

চরিত্রের কথা বলেছো, এক— পিয়েত্রো, তুই— সেই হারানো মানুষটি, তিন— সেই ধর্মপ্রচারক স্বামী। যদিও আমি স্বীকার করতে বাধ্য, আমার গবেষণা তোমার কাছে অর্থহীন হ'তে পারে। যদি আমাদের সমাজের কথা বলো তা হ'লে সেই হারানো লোকটিকে শুধু কুৎসিততম বিশেষণেই অভিহিত করা হবে না, সমাজে সে পীড়িতও হবে, যদি অবশ্য সমাজের তুলনায় সে বলশালী না হয়। এটা কলঙ্ক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কেট, পাদরিটি সম্ভবত নির্লিপ্ত পুরুষ। এ-রকম চরিত্রকে কাপুরুষ না ব'লে মহাপুরুষ বলা যায় যদি সে সেই হতভাগ্য লী-হাউস ও তার স্খলিতা স্ত্রীকে ক্ষমা ক'রে থাকে।'

'রাজকুমার!'

রাজচন্দ্র কেটের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে অবাক হ'লো, কিন্তু বললো, 'তিনটি চরিত্রের মধ্যে পাদরিকেই মহত্তম বোধ হচ্ছে। বাগচীর কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় পাদরি আদর্শ খ্রীস্টান।'

রাজু কথাগুলি বলছিলো ভেবে-ভেবে, চোখ তুলে সে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। রাজুর মনে হ'লো কেট মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে যাবে, সে যে টলছে তা বোঝা গেল। রাজু স'রে গিয়ে তার একখানা হাত ধরতেই কেট ভেঙে পড়লো। এদিকে-ওদিকে চাইতে-চাইতে সোফাটা চোখে পড়তেই রাজু ধীরে-ধীরে কেটকে তার উপরে শুইয়ে দিলো। তারপর কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মাঝখানে।

এমন সময়ে বাগচী ফিরে এল।

রাজু বললো, 'মাস্টারমশাই, কেট মূর্ছিত হ'য়ে পড়েছে।'

'কতক্ষণ? আমি যাবার পরেই নাকি?'

'না, এইমাত্র।'

বাগচী কেটের পাশে জানু পেতে বসলো, কিন্তু তার সেবায় অগ্রসর

হবার আগেই কেট উঠে বসলো। রাজুকে ও বাগচীকে সেই অবস্থায় দেখে কেট লজ্জায় অধোবদন হ'লো।

বাগচী হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো।

'কী ভয় পাইয়ে দিলে কেট! ভারী একটা আনন্দের খবর ব'য়ে এনেছি।'

কেট ক্লান্ত স্বরে বললো, 'একটু থামো ডার্লিঙ্। রাজকুমার অনেক রাত হ'লো, এবার আপনি যান। কাল যদি অনুগ্রহ ক'রে একবার আসেন আমি গল্পের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো।'

রাজু আর এক-মুহূর্তও দাঁড়ালো না।

বাগচী বললো, 'কেট, সুইটি, আমাদের দেওয়ানজিকে আজ চিনতে পারলাম। ঈশ্বরে তার ঘোরতর অবিশ্বাস। অথচ দ্যাখো, আমরা ভাবতাম তিনি ব্রাহ্ম। এদিকে ঈশ্বরে যাঁর এত অবিশ্বাস তিনি কি বলেন জানো?'

কেট স্বপ্নচালিতের মতো বললো, 'কি বললেন?'

'বললেন— শিক্ষার অঙ্গ ধর্মশিক্ষাও বটে। ঈশ্বরের কথা ছাত্রদের কাছে বলা দরকার, তারা অত্যন্ত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করুক। আপনারা বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনোটিই তাদের মনের উপরে চাপিয়ে দেবেন না। যদি তারা বড়ো হ'য়ে ঈশ্বরবিশ্বাসী হয় ভালো, ঈশ্বরে যদি তাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস না থাকে তা-ও মন্দ নয়। এই প্রস্তাব। তারপর বললেন— আপনি ছাত্রদের নিয়ে সমবেতভাবে ঈশ্বর আলোচনা করুন, প্রার্থনা করুন, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট দিন বা সময় স্থির করবেন না। ব্যাপারটি যেন ছেলেদের কাছে মধুর থাকে, আলোচনাগুলি যেন তাদের চিত্তহারী হয়।'

কেট বললে, 'ভালো।'

'আমি ভাবছি স্কুলের হল্-ঘরে কাচ বসানো দু-চার দিনে শেষ হ'লে

সেখানেই ছাত্রদের নিয়ে বসবো। প্রথম প্রার্থনায় দেওয়ানজি থাকবেন। তোমরাও থেকো।'

কেট বললো, 'চলো, তোমাকে খেতে দিই গে, রাত হয়েছে।'

পথে বেরিয়ে রাজু এইরকম চিন্তা করলো : কেট তাকে তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে বললো। এর কি কারণ হ'তে পারে। তারও আগে বাগচীকে থামতে অনুরোধ করেছিলো। বাগচী যে আনন্দের খবরটা ব'য়ে এনেছিলো সেটা যেন তার কাছ থেকে আড়াল করাই উদ্দেশ্য ছিলো কেটের।

একজন অনাত্মীয় যুবক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আর নিজের স্ত্রী মূর্ছিতা— এ-অবস্থায় মানুষের মনের অবস্থা কিরকম হয় সেটা অনুভব করা শক্ত। বাগচীরও অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হয়েছিলো, তার প্রমাণ তার মুখের চেহারা। মূর্ছা ভঙ্গ হ'লে সে হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিলো। এটাও তার মনের অভিভূত অবস্থারই সূচনা করে। কিন্তু এ-অবস্থায় কোনো স্বামীর পক্ষে আনন্দের খবর ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক, সেটা প্রকাশ করতে যাওয়া বিসদৃশ বৈকি।

কেট কি এটা বুঝতে পেরেছিলো ? এই বৈসাদৃশ্য ? এবং সে-জন্যই তাকে তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলো ? স্বামীর এই বিসদৃশ ব্যবহার বাইরের লোকের কাছে গোপন করতে চেয়েছিলো সে ?

যতক্ষণ-না অন্য মানুষের কোলাহল সূচনা করলো যে সে রাজবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে, ততক্ষণ রাজু কেটের গল্পটির কথা চিন্তা করলো। প্রেমের শক্তি, প্রেমের মহত্ত্ব ইত্যাদি ব্যাপার সে চিন্তা করলো না। তার মনে হ'তে লাগলো, ওই গল্পটি কেটের জীবনের সঙ্গে কোনো এক দিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট।

॥ পঁচিশ ॥

বাগচী তার প্রার্থনা-সভার ব্যবস্থা ক'রে ফেললো। প্রস্তাবটা হরদয়ালের। সে ছাত্রদের ব'লে দিলো, আগামী শনিবার সকালে তারা যেন সকলে একসঙ্গে নতুন হল্-ঘরটায় সমবেত হয়। সেখানে ভগবানের নাম করা হবে। গ্রামের দু-দশ জন ভদ্রলোককেও সে নিমন্ত্রণ করলো। রাজুকে করজোড়ে বললো, 'রাজকুমার, আপনি অবশ্য-অবশ্য থাকবেন।' এমন কি স্কুলের একটি ছেলেকে সঙ্গে ক'রে বাগচী নয়নতারার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'লো নিমন্ত্রণ করতে।

বাগচী হরদয়ালকে বললো, 'হল্-ঘরটার দ্বারোদ্ঘাটন হয় নি, দেওয়ানজি। আপনি দ্বারোদ্ঘাটন করলে তারপর আমরা প্রার্থনা-সভার আয়োজন করবো।'

'না, না, সে-সব করবেন না। দরজার চাবি থাকবে স্কুলের মালির কাছে। রোজকার মতো সে-ই ঘর খুলে দেবে। তবে যদি প্রার্থনা-সভা সাজানোর প্রয়োজন থাকে, বলুন, আমি লোক দিচ্ছি।'

'কিন্তু দেওয়ানজি, এমন হল্-ঘর, এটাই একটা ইনস্টিটিউশন্। সে-দিক দিয়ে এর একটা দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব করা—'

দেওয়ান হেসে বললো, 'সে আমার ভারী লজ্জা করবে। তার কোনো দরকার নেই। আপনি দাঁড়ান, আমি লোক দিচ্ছি।'

রাজবাড়ির উৎসব ইত্যাদির ব্যাপারে যে-কর্মচারীরা গৃহসজ্জার ভার নেয় তাদের দু-জনকে দেওয়ান বাগচীর সঙ্গে দিয়েছিলো।

শুক্রবার অনেক রাত্রি পর্যন্ত তারা দু-জনে হল্-ঘরটা বাগচীর তত্ত্বাবধানে সাজালো। হলের একপাশে একটি জলচৌকি পাতা হয়েছে। ছাত্রদের জন্য মেঝে-জোড়া জাজিম পাতা। অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের জন্য জাজিমের চারিদিকে কিছু চেয়ার। বলা বাহুল্য, এগুলো সবই দেওয়ান-

ভবন থেকে আসছে। অন্যান্য গৃহসজ্জার ব্যাপারে লোক ছুটিকে স্বাধীনতা দিয়েছিলো বাগচী। তারা চাঁদমালায়, পুষ্পস্তবকে হল্-ঘরটিকে সুসজ্জিত করেছে। শনিবার দিন সকাল হ'তেই কৌতূহলী ছেলেরা এসে হল্-ঘর জুড়ে বসলো। ফুলদার জাজিম নিমেষে তাদের ধূলিভরা খালি-পায়ের ছাপে মলিন হ'য়ে গেল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের মধ্যে অধিকাংশই দ্বিধা করতে লাগলো। কিন্তু তাদের মধ্যে রাজসরকারের কর্মচারীরা জানতো দেওয়ানজি সকলকে অভ্যর্থনা করার জন্য দরজায় থাকবেন। তারা এক-এক ক'রে সকলেই হল্-ঘরের দিকে রওনা হ'লো। তাদের দেখাদেখি এবং দেওয়ানজি অভ্যর্থনা করার জন্য থাকবেন এ-কথা শুনে অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রব্যক্তি, এমনকি দেওয়ানজির সান্নিধ্যপ্রয়াসী অনিমন্ত্রিত দু-একজনও সভায় উপস্থিত হ'লো।

কেট বাগচীর সাথে-সাথেই সভায় ঢুকছিলো, কিন্তু এ-সভায় সে-ই একমাত্র স্ত্রীলোক, এটা তাকে অস্বস্তি দিতে লাগলো, বিশেষ ক'রে শিশুদের সঙ্গে-সঙ্গে বয়স্কদের কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে বিব্রত ক'রে তুললো। এমন সময় সে দেখলো রাজকুমারের সঙ্গে নয়নতারা প্রবেশ করছে। লাল মসলিনের অপূর্বতা ছিলো নয়নতারার, মাথায় অদৃষ্টপূর্ব অবগুণ্ঠন ছিলো, নয়নতারার চোখ দুটি কিছু-বা ব্রীড়াবনত। দূরের দু'খানা চেয়ারে রাজকুমার ও নয়নতারা বসলে কেটও সেদিকে এগিয়ে গেল। রাজকুমার উঠে দাঁড়িয়ে কেটের জন্য একখানা চেয়ার টেনে নিজেদের আসনের দিকে এনে দিলো। কেট রাজকুমারের অপর পার্শ্বে বসলো।

প্রার্থনা-সভার কাজ আরম্ভ হ'লো। বাগচী প্রার্থনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রারম্ভিক একটা ভাষণ দিলো। সে বললো, 'ঈশ্বর আমাদের দর্শন দেবেন কিনা জানি না, প্রার্থনা পূর্ণ করেন কিনা এ-বিষয়ে কারো-কারো সন্দেহ আছে, কিন্তু প্রার্থনা শান্তি দেয়, প্রার্থনা মনকে স্থির করে, এবং

সেই শান্তি ও স্থিরতায় মানুষ তার হৃদয় ও মনকে অসম্ভব শক্তিশালী করতে পারে।'

এই ভাষণটি প্রায় আধ-ঘণ্টা ধ'রে নানা গ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে বাগচী উপস্থাপিত করলো। তার কণ্ঠ ভালো, তার বলবার ভঙ্গিটি আড়ম্বরহীন, এবং শব্দগঠন সম্বন্ধে তার রুচি ইংরেজদের মতো। ছোটো কথায় গভীর ভাব প্রকাশের চেষ্টা ছিলো।

বাগচী থামলে রাজু নয়নতারাকে মৃদুস্বরে বললো, 'তোমাদের ন্যায়-দর্শন কি বলে, নয়ন?'

নয়নতারা মৃদু হেসে মৃদুতর গলায় বললো, 'এগুলি সাংখ্য-ন্যায়ের ব্যাপার নয়। ভক্তিযোগের কথা।'

'কিন্তু বাধা-হীন লক্ষ্য করো।' —ব'লে রাজু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলো।

তারপর প্রার্থনা শুরু হ'লো। জলচৌকিটায় ব'সে বাগচী বললো, 'এবার আমরা প্রার্থনা করবো। নিজেদের জন্য ভগবানের কৃপা চাইবার পর আমরা অসুস্থ পিয়েত্রোর জন্য প্রার্থনা করবো। আমরা শুনেছি চরণদাসের শিশুটি অসুস্থ, তার জন্যও প্রার্থনা করবো।'

এমন সময় ছোটো একটা ঘটনা ঘটলো। জাজিমে বসা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে থেকে রোগাটে মলিন চেহারার একটি ছোটো ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'মাস্টারমশাই, আমার বাবার জন্য প্রার্থনা করবেন।'

কৈলাসপণ্ডিত হাঁ-হাঁ ক'রে এই বদ্ ছেলেটিকে শাসন করতে যাচ্ছিলেন। কী বিপদ, দেওয়ান রাজকুমার প্রভৃতির সম্মুখে এ কী বেয়াদবি!

বাগচী তার আসন থেকে নেমে এসে বললো, 'কি হয়েছে তোমার বাবার?'

ছেলেটি নীরবে কাঁদতে শুরু করলো। বললো, 'বাবা বুজরুক আলির সঙ্গে কোথায় গেছে জানি না। মা দিনরাত কাঁদেন। মা জানেন কিন্তু বলেন না।'

'নিশ্চয় প্রার্থনা করবো বাবা, তাঁর জন্যই সর্বাগ্রে প্রার্থনা করবো আমরা। বোসো তুমি। তুমিও প্রার্থনা করো।'

ঈশ্বরের অসীম করুণা বর্ণনা ক'রে বাগচী তাঁর কাছে নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইলো। নিজেদের বুদ্ধি ও কর্তব্যজ্ঞানের স্বল্পতা ইত্যাদির উল্লেখ করলো। তারপর হল্‌-ঘরের অপার নৈস্তব্ধ্যের মধ্যে সে ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করলো, 'যারা তীর্থযাত্রা করেছে, যারা কর্তব্যের জন্য বিদেশে গিয়েছে, তুমি পথের ধূলায় তাদের সঙ্গে থেকো। তোমার বটগাছগুলি যেমন গ্রীষ্মে সুশীতল, শীতে সুখদায়করূপে উষ্ণ, হে ঈশ্বর, তেমনি স্নেহ দিয়ে তুমি পথযাত্রীদের সঙ্গী হও। হে পিতঃ, সমুদ্রের পরিশ্রান্ত নাবিক তোমার করুণা অনুভব করুক। হে ঈশ্বর, রোগীদের শোকগ্রস্তদের তুমি শান্তি দাও।'

বাগচীর চোখ থেকে দু-তিন ফোঁটা জল তার গালে গড়িয়ে আসতেই সে সহসা প্রার্থনা বন্ধ করলো। রুমাল বার ক'রে চোখ দুটো মুছে ফেললো।

তার কিছুদূরে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বসেছিলো। তাকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'শঙ্খ বাজাও চারু। আজ উপাসনা শেষ হ'লো।'

চারুকে গ্রামের অনেকেই চিনতো। কৈলাসপণ্ডিতের গেছো মেয়ে। চারু শঙ্খ বাজালো। বাগচী জলচৌকি থেকে নেমে এল। সভাস্থ ছেলেরা কৈলাসপণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে স্কুলের আটচালার দিকে ছুটলো। সেখানে তাদের সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিলো। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরাও ধীরে-ধীরে সকলে চ'লে গেলেন। দেওয়ান একটি লজ্জিত

মেয়ের মতো বসেছিলো। সে কখন চ'লে গেছে কারো চোখে পড়ে নি। ভিড় কমার অপেক্ষায় নয়নতারা ও রাজু তখনো বসেছিলো, কেট তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো।

বাগচী সেখানে এল, লজ্জিত হ'য়ে বললো, 'আমার একটা চশমা নেওয়া দরকার, রাজকুমার, আলো লেগে চোখ দিয়ে জল পড়ে।'

নয়নতারা মৃদু হেসে বললো, 'এটা কি সত্যভাষণ পাদরির পক্ষে?'

'না, না, বিশ্বাস করুন, চোখ দিয়ে জল পড়তেই ভয় হ'লো, চক্ষু-রোগীদের কথা মনে হ'লো।'

কেট বিপর্যস্ত বাগচীকে বাঁচালো। সে বললো, 'কৈলাসপণ্ডিতের গলা শুনছো! সে নিশ্চয় বেত হাতে চেঁচাচ্ছে, ছেলেরা মানছে না। ওদিকে চলো।'

'তা বটে, তা বটে। রাজকুমার, আমি চলি।'

কেট নয়নতারার অনুকরণে ক্ষুদ্র একটা নমস্কার ক'রে চ'লে গেল বাগচীর সঙ্গে।

হল্-ঘর থেকে বেরুতে-বেরুতে রাজু বললো, 'অদ্ভুত লোক বাগচী।'

নয়নতারা বললো, 'ভদ্রলোক কি সত্যি বিশ্বাস করেন না ঈশ্বরের করুণার উপলব্ধিতে, ওঁর চোখে জল আসছিলো।'

রাজু সহসা উত্তর দিলো না।

দরজার গোড়ায় দু-জনে যাবার মতো পালকি ও যোলো জন বেহারা দাঁড়িয়ে ছিলো।

পালকিতে উঠতে-উঠতে বললো নয়নতারা, 'এবারও তুমি আসবে নাকি?'

'বরো, এই রোদে হেঁটে যাই।'

'এসো তা হ'লে। কিন্তু এতটা কি ভালো হচ্ছে?'

'পাশাপাশি এতক্ষণ ব'সে রইলাম, কেউ তো তিরস্কার করে নি।' রাজু হাসতে-হাসতে বললো।

প্রার্থনা-সভার খ্যাতি অনেক দূর ছড়ালো।

নদীর ঘাটে মেয়েরা একদিন দুর্দান্ত চারুকে বললো, 'হ্যাঁ রে চারু, তোরা নাকি খেস্টান হ'য়ে গেছিস ?'

'হয়েছি তো।'

'আর কে-কে হ'লি ?'

'কেন, দেওয়ানজি, রাজকুমার, নয়ন ঠাকরুন— সকলেই।'

মেয়েরা প্রতিবাদ আশা করেছিলো, তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। চারুর ব্যঙ্গ বড়ো ধারালো।

ততক্ষণে চারু পুরুষদের ঘাটের দিকে সাঁতরাতে শুরু করেছে।

বাড়ি ফিরে রাজুর সেই ছোটো ছেলেটির কথা মনে পড়লো নয়নতারা যতক্ষণ সঙ্গে ছিলো, বিষাদের স্থান ছিলো না কোথাও। এখন বুজরুক আলির কথা মনে হ'লো, গোবর্ধনের কথা মনে হ'লো। এই দুপুরের রোদে তারা হয়তো অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে। তাদের জন্য আশঙ্কা আছে মনে কিন্তু তাদের মঙ্গলের জন্যই সে-আশঙ্কা লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। প্রার্থনা-জাতীয় একটা আকুলতা মনে এল রাজুর।

কি ক'রে খবর পাওয়া যায় ? একদিন দেওয়ানজি কাছারিতে আলোচনা করছিলো, সে শুনতে পেয়েছে। একখানি ইংরেজি কাগজ প'ড়ে সে শুনিয়েছে কাছারির কর্মচারীদের। সে-কাগজ নাকি খুব বড়ো একজন দেশপ্রেমিক হরিশ না কার লেখা। তাতে নাকি সিপাহী-

বিদ্রোহকে ধিক্কৃত করা হয়েছে। সিপাহী-বিদ্রোহ নাকি তাদের মতে স্বার্থসম্পন্ন কতকগুলি লোকের কারসাজি। বিধবা-বিবাহ, সতীদাহ নিবারণ ইত্যাদি সমাজ-উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিকে জনসাধারণের চোখের সম্মুখে বিকৃত ক'রে দেখানোই বিদ্রোহীদের স্বার্থসাধনের উপায়।

রাজু একটা বিদ্বেষ অনুভব করলো দেওয়ানের প্রতি।

॥ ছাব্বিশ ॥

'তুমি কখনো তোমার দেশে ঘুরে বেড়িয়েছো, কেট ?'

'খুব-একটা স্থযোগ ছিলো না। আমি যে-স্কুলে পড়তাম সেটা গরিব অনাথদের। শুধু মিশনারিদের পরিচালিত ব'লে আমরা না-খেয়ে মরি নি। অন্য সব শখ ও আনন্দকে তারা যথাবিহিত চেপে দিতো। আমার সে-সব দিনের আনন্দের মধ্যে একমাত্র আনন্দ ছিলো বাবার চিঠি পাওয়া।'

'তোমার অতি শৈশবে তা হ'লে তোমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে ?'

'আমি তাঁকে জ্ঞান হ'য়ে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। আমাদের সেই কন্‌ভেণ্টে মাঝে-মাঝে একজন যেতো। সে বলতো, সে নাকি আমার ধর্ম-মা। বহুদিন পর্যন্ত তাকেই আমার মা ব'লে মনে করতাম। অভিমান ক'রে তাকে এমনও বলেছি— অন্য সব মেয়ে ছুটিতে বাড়ি যায়, তুমি আমাকে কেন নিয়ে যাও না ? সে সব-সময়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিতো।'

'তারপর বুঝি এ-দেশে এলে ?'

'সে-ও প্রায় পালিয়ে। আমার তখন বছর পনেরো-ষোলো বয়েস হবে। শুনলাম, তার পরই আমাকে নান্ করবার চেষ্টা হ'চ্ছে। আমার বাবাও নাকি তাতেই মত দিয়েছেন। খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীকে নান্ বলে। নান্‌দের আর সবই ভালো, কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই। অথচ (দুষ্টু মেয়ের মতো হাসলো কেট) পুরুষ ছাড়া একদণ্ড আমার চলে না। দেশে, পড়তে যাবার আগে আমার বাবা, আমার ঘোড়া, আমার কুকুর, এ-দেশের ছোটো-ছোটো নোংরা-পোশাক-পরা সহিসের ছেলে, সবাই পুরুষ সাথী ছিলো আমার। নান্‌দের পুরুষবর্জিত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে আমি পালিয়ে এলাম এক জাহাজের অল্পবয়সী সেকেণ্ড অফিসারের সহায়তায়।'

'তারপর ?'

'তাই বলছিলাম,' কথার ধারা পালটে দিলো কেট, 'পুরনো জিনিস দেখবার শখ আমার মেটে নি। অনেক দিন ব'সে-ব'সে আপনাদের প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে থাকি, ভাবি, না-জানি ওর ভেতরের ঘরগুলি কিরকম। কত অদ্ভুত রুচি ছিলো আগেকার দিনে।'

'এটা আমাদের নতুন বাড়ি। পুরনো বাড়ি এখন জঙ্গলে ঢাকা।'

'বাড়িঘর আছে, না সব ঢেকে গেছে ? দেখা যায় ?'

'আচ্ছা, আমি বাগচীকে বলবো, যদি সে তোমাকে যেতে দেয়।'

'রাজকুমার, যদি যাই তবে বাগচীকে ব'লে যাবো না। সে-যাওয়ায় কোনো সুখ নেই। রুটিন-মাফিক চলাই যদি চলবো তবে বর্তমান কি দোষ করলো ?'

'তা হ'লে তুমি অতীত কিংবা ভবিষ্যতে যেতে চাও ?' রাজু হেসে প্রশ্ন ক'রে পিয়ানোর ডালাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

'ভবিষ্যতে যেতে পারি না, তাই অতীতে যেতে চাই।'

কথাটা এইভাবে উঠেছিলো। কয়েক দিন পরে পিয়েত্রোর বাড়ির দিকে যেতে-যেতে কথায়-কথায় রাজু বাগচীকে বললো।

'ভালো, খুবই ভালো।'

'হয়তো আমার সঙ্গে আর-কোনো স্ত্রীলোক না-ও থাকতে পারে।'

বাগচী বললো, 'কেন, কেটই তো থাকছে, আবার স্ত্রীলোক দিয়ে কি হবে! কিন্তু আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? আপনি তো কেটের হাতে খান না।'

'সে যা-হয় হবে।'

রাজু ভাবলো, আশ্চর্য নিরুত্তাপ।

আবার বললো রাজু, 'কিন্তু আপনি যে জানেন, আপনি যে অনুমতি

দিচ্ছেন, এ-কথা কিন্তু কেটকে বলতে পারবেন না। সে জিগ্যেস করলেও না।'

'তা-ই হবে।'

কেট ভাবতেও পারে নি কল্পনা সত্য হ'তে পারে যখন রাজু একদিন সকালে এসে বললো, 'চলো কেট, বেড়িয়ে আসি ; আমাদের পুরনো গড় দেখতে চেয়েছিলে—'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ, প্রস্তুত হ'য়ে এসো। মেলা জবড়জং পোশাক প'রো না। বনজঙ্গলের পথ, কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হবে।'

কেট রাজুর পোশাকটা দেখলো। য়ুরোপীয় পোশাকে তাকে লম্বা দেখাচ্ছে। তাদের দেশের সেই কন্‌ভেণ্টের প্রাচীরের পাশ দিয়ে যারা হৈ-রৈ ক'রে চলতো সেই সব আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের কেউ যেন।

কেট প্রস্তুত হ'য়ে এল। সবুজে রং-এর পেটিকোটের উপরে গাঢ় সবুজ জ্যাকেট।

হাতি দাঁড়িয়ে ছিলো দরজায়, কেট হাতিতে চাপলো।

'ভয় পাবে না তো ?'

কেট মুখ নিচু ক'রে বললো, 'ভয়-ভয় করছে।'

'দাঁড়াও, আমি আসি।'

গ্রামের লোকরা অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক হ'লো। দু-একজন বললো, 'আমাদের রাজকুমারকে একেবারে সাহেবের মতো দেখায়।'

যেখানে গ্রামের বাড়িগুলি কম হ'য়ে এলো, কেট বললো, 'নয়নতারা আসবেন না ?'

রাজু বললো, 'নয়নের এ-সব শখ নেই।'

গ্রামের সীমানা পার হ'য়ে ছোটো একটা খাল পাওয়া গেল। জল

নেই, শুকিয়ে খট্‌খট্‌ করছে। হাতিটা এ-পার থেকে ও-পারে উঠলো। ঝাঁকুনিতে ভয় পেয়ে কেট প্রায় কেঁদে ফেলেছিলো, আসনচ্যুত হ'য়ে সে হাওদার রেলিং-এর উপরে প'ড়ে যাচ্ছিলো, রাজু হাত বাড়িয়ে তাকে ধ'রে ফেললো।

লজ্জায় লাল হ'য়ে কেট ক্ষমা চাইলো; বললো, 'আপনাদের দেশের মেয়েরা বোধ হয় এমন ছিট্‌কে যায় না।'

'তারাও যায়। তোমাকে সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত ছিলো। এটা ছিলো পরিখা।'

পরিখা কাকে বলে তা কেটকে বুঝিয়ে দিলো রাজু। কেট বিষয়টি কল্পনা করার চেষ্টা করতে লাগলো।

আরো কিছুদূর গিয়ে কয়েকটি পর্ণকুটির চোখে পড়লো। হাতি দাঁড়ালো সেখানে। মাহুত রাজুর সম্মতি নিয়ে হাতিকে বসালো, হাওদার গায়ে মই লাগিয়ে দিলো। রাজুর হাত ধ'রে-ধ'রে কেট নামলো।

'এটা তো বন!'

রাজু হেসে বললো, 'ভয় পাচ্ছো না তো? এটা বাগান ছিলো এককালে। এখনো বাগানই আছে। পুরনো, বহু পুরনো আমগাছ এ-সব। এই ঘরগুলোতে ফলের সময়ে পাহারাদাররা থাকে।'

'আমরা কোন দিকে যাবো?'

'এখান থেকে এক মাইল পথ হবে। হেঁটে যেতে পারবে?'

'খুব পারবো।'

'চলো তা হ'লে।'

মাহুতকে ফেরা-না-পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ব'লে রাজু অগ্রসর হ'লো।

কিছুদূর গিয়ে রাজু বললো, 'এ-রকম অবস্থায় কখনো পড়েছো— কাছের লোকটিও সিকি মাইল দূরে। তা ছাড়া সে-ই বা আছে এমন প্রমাণ কি?'

কেট ভয় পেয়ে রাজুর দিকে এগিয়ে এল। বললো, 'এ-বনে টাইগার নেই ?'

'আছে ব'লে জানি না। চিতল হরিণের চাইতে বড়ো প্রাণী বোধ হয় নেই।'

'নেই টাইগার, এ-কথা বলতে পারছেন না কেন ? অন্য বন থেকে কি এ-বনে তারা ঢুকতে পারে না ?'

রাজু হাসতে-হাসতে বললো, 'তারা কি রাজশাসন মানে না মনে করেছো ? ওগুলো কি ডাকছে বলো তো ?'

'পাখি ?'

'তাই। ঠিক যেন মনে হয়, হেঁড়ে গলায় কথা বলছে ডান্‌কানের মতো।'

এক-সময়ে কেট বললো, 'রাজকুমার, পায়ের নিচে ইঁটের টুকরো ব'লে মনে হচ্ছে।'

'হ'তে পারে। হয়তো কোনো চবুতরা ছিলো।'

'আপনার এক মাইল যে শেষ হয় না।'

'তোমার নান্ হওয়াই উচিত ছিলো কেট।'

রাজু আর খানিকটা পথ গিয়ে বললো, 'তুমি ছুটতে পারো কেট ? ধরো যদি তোমার সেই সাধের টাইগার আসে ?'

'টাইগার আমার সাধের নয়। কিন্তু ভারী একটা সুন্দর দৃশ্য মনে প'ড়ে গেল। একটা কবিতা। জামসিদের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপে সিংহ শাবকদের নিয়ে বাস করছে।'

'কবিতাটা কিরকম কেট ? আমি কখনো ইংরেজি কবিতা শুনি নি। তুমি আবৃত্তি করতে পারো ?'

কেট ইতস্তত করতে লাগলো।

রাজু বললো, 'এখানে আমরা দু-জন, লজ্জা কি ?'

কেট নিচু-গলায় দু-তিনটি চরণ আবৃত্তি করলো।

রাজু গম্ভীর মুখে শুনলো, তারপর বললো, 'অর্থবোধ হ'লো না। কি অর্থ?'

কেট বললো, 'এই গাছের ছায়ায় এক টুকরো রুটি, একপাত্র মদ আর তুমি পাশে আছো ; এই বন এখন স্বর্গ।'

রাজু অনুভব করলো, তারপর তার চোখ দুটি কোমল হাসিতে ভ'রে গেল, 'এ কী সাংঘাতিক কথা, কেট! এ-কথা কি এখন আমাকে শোনাতে আছে?'

কিছুদূর চ'লে কেট বললো, 'রাজকুমার, আপনি আমাকে নিশ্চয় ক্ষমা করেছেন।'

'কি অপরাধ?'

কেট লজ্জিত হ'লো ঘটনাটার পুনরুল্লেখ করতে, কিন্তু রাজুর দৃঢ় পদক্ষেপের ভঙ্গি থেকে দৃঢ়তা কুড়িয়ে নিয়ে বললো, 'সেদিনের সেই গল্প শুনবার পর আমার রুচি সম্বন্ধে আপনার অত্যন্ত হীন ধারণা হওয়াই সংগত।'

রাজু কেটের মনোভাব বুঝতে পারলো না, সে বললো, 'তোমার বলায় দুঃসাহস ছিলো, তুমি উত্তেজিত ছিলে কেট, কিন্তু কুরুচির কোথাও কিছু ছিলো না।'

কেট নীরবে কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে বললো, 'অথচ ইংলণ্ডের বাটলার শ্রেণীর লোকদেরও শালীনতা ওতে শিউরে ওঠে।'

কিছুদূরে গিয়ে রাস্তাটি ক্রমশ উঁচু হ'য়ে গেছে। রাস্তা নয় ঠিক, পায়ে চলার পথটি যেন সবুজে ঢাকা একটা ছোটো পাহাড়ের অসমান গা বেয়ে-বেয়ে উঠেছে। ছোটো খাদ আছে, ছোটো-ছোটো চূড়া আছে। দূর থেকে চোখে পড়ছে।

রাজু টুপিটা খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

'ও কি ?'

'অনভ্যাস। গরম লাগছে।'

'তা বটে। গাছের ছায়া হ'লেও গরম।'

'পেছনে চেয়ে ছাখো, বুঝতে পারবে।'

'আমরা তা হ'লে এতক্ষণ উপরে উঠছিলাম ?'

'হ্যাঁ, এবার নামবো। আমরা গড়ের প্রাচীর পার হলাম। মাটির প্রাচীর ছিলো। যদি তুমি আপত্তি না করো, টাইটা আর কোটটা খুলি।'

'না, আপত্তি করবো কেন ?' কিন্তু অভ্যাসের ফলে ভিক্টোরিয়া-যুগের শালীনতা কিছুটা আহত হ'লো কেটের।

'একটু দাঁড়াও।' রাজু দাঁড়িয়ে কোটটা খুললো। টাই খুললো। টাইটা কোটের পকেটে পুরে টুপির মতোই একান্ত অনাদরে কোটটা পথের ঘাসে ফেলে দিলো।

কেট বললো, 'আজ বুঝি অপচয় আপনাকে পেয়ে বসেছে ?'

'হাতে ক'রে পোশাকের বোঝা বইতে আমি নারাজ। ও কী, তুমি যে আমার দিকে চাইতে পারছো না!' রাজু শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিলো।

কেট খানিকটা জোর ক'রে রাজুর দিকে চাইলো। তার পরে বললো, 'সামনে কোনো ইংরেজ-মহিলা থাকলে আপনার নিন্দে করতো।'

'তা করতো। এবার শক্ত ক'রে পা ফেলো মাটিতে। আমরা প্রাসাদে উঠতে আরম্ভ করেছি। তোমার সেই বর্তমানের গণ্ডীর বাইরে পা দিচ্ছি আমরা। আমরা এখন অন্য লোক। পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখো, খানা-খন্দে প'ড়ে যেয়ো না যেন। আর—'

'আর কী ?'

'সাপের গায়ে যেন পা না পড়ে।'

কেট শিউরে উঠলো।

প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ঘাসে ঢাকা। তার উপরে ছোটো-ছোটো গাছও উঠেছে।

কেট বললো, 'দাঁড়ান, রাজকুমার।'

কেট পট্‌পট্‌ ক'রে তার জ্যাকেটের বোতামগুলো খুলে ফেললো রাজুর অনুকরণ ক'রে সেটাকে ফেলেও দিলো মাটিতে।

সবুজে একটা ফ্রক্‌-জাতীয় পোশাকে দাঁড়ালো কেট। এর আগে আর-একদিন প্রায় অনুরূপ পরিচ্ছদে দেখেছে রাজু তাকে। কিন্তু সেদিন যেন এমন দেখায় নি কেটকে। কোমরে পরা কোমরবন্ধটির জন্যই আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে সাব্যস্ত করলো রাজু। মসৃণ বাহু, কাঁধের খানিকটা, খানিকটা পিঠ চোখে পড়ছে। রাজু জানতো না, রোমান মহিলাদের অনেক ছবিতে এ-রকম ধরনের ঘরোয়া পোশাক দেখা যায়।

রাজু বললো, 'পরীর নির্মোক-ত্যাগে বিস্মিত হবো এমন লোক নই আমি, কিন্তু জামাটি মাটি হ'লো।'

'সঙ্গে রাজা আছেন, তুচ্ছ জামার মায়া কেন ?'

কেট আর-একটু পরে বললো, 'রাজকুমার, হিদেনরা কি সবাই আপনার মতো সাহসী ?'

'বাংলা বলতে-বলতে চট ক'রে ইংরেজি বোলো না। আমি বুঝি না।'

কেট বললো, 'আপনারা এতদূর অগ্রসর, এতদূর সাহসী, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি।'

'তুমি আমাকে অবাক করলে কেট। আমরা ভাবছি, তোমরা

অগ্রসর, তোমরা সাহসী; আমরা পিছিয়ে আছি; আর তুমি বলছো তার উল্টোটা। তুমি কি হরিশের কাগজ পড়ো না?'

'হরিশচন্দ্র? কলকাতায় থাকবার সময়ে বাগচী তার কাগজের খুব প্রশংসা করতো বটে। এখানে আসার পরে পড়ি নি। কিন্তু রাজকুমার, এই যে আমরা দু-জনে চলছি, আপনি কি জানেন এরই জন্য আমাদের সমাজে ধিকৃকৃত হ'তে হ'তো— আমার জ্যাকেট নেই, আর আপনি শার্ট প'রেছেন ব'লে?'

'তাই নাকি? তা হ'লে তো বিদ্রোহ করেছো তুমি।'

কেট কয়েক পা তাড়াতাড়ি চ'লে রাজকুমারের ডান-হাতখানি ধরলো; বললো, 'রাজকুমার, মাঝে-মাঝে মনে হয়, এমন বিদ্রোহ করি যে বহুদিন তা লোকের মনে থাকে। শুভ্র জীবন দেখে-দেখে মনে হয়, ছিন্ন বিধ্বস্ত কলঙ্কিত হ'য়ে যাক জীবন।'

বর্ষার জল উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়বার সময় বেশ বড়ো একটা ফাটল সৃষ্টি করেছে। রাজু বললে, 'আর এগোনো যাবে না। তুমি কি এটা পার হ'তে পারবে?'

কেট পেটিকোটটা দু-পাশ থেকে চেপে ধ'রে একটু উঁচু ক'রে লাফিয়ে ফাটলটা পার হ'য়ে গেল। রাজুকে লাফাতে হ'লো না, লম্বা পায়ে এপার থেকে ওপারে চ'লে এল।

'তুমি সাহসিকা কেট।'

আর কিছুদূর যাবার পর স্তূপটির প্রায় চূড়ায় পৌছলো তারা। চূড়ার উপরে দুটি গাছ। গাছের থেকে একটু দূরে একটি সিঁড়ির দুটি থাক চোখে পড়ে। সর্বোচ্চ চূড়ার থেকে মহাশূন্যে উঠবার পথে দুটি গোড়ার ধাপ যেন। সিঁড়ি দুটি মার্বেল পাথরের। একটু হলদে হয়েছে রং, এবং শ্যাওলা প'ড়ে কালচে হয়েছে অনেকটা, তবু মার্বেল তা বোঝা যায়।

সেটির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে কেট বললো, 'রাজকুমার, প্রয়োজন হ'লে আপনি আমাকে কোলে ক'রে ফাটলটা পার ক'রে দিতে পারতেন না?'

'যদি তুমি অসুস্থ হ'য়ে পড়ো, কোলে ক'রে বাড়ি পর্যন্তও যেতে হ'তে পারে। কিন্তু এ-কথা কেন মনে হ'লো?'

'আমাদের কন্‌ভেণ্টের হিসেবে সেটা পাপ হ'তো, শয়তানের প্রলোভন হ'তো।' কেট আগে-আগে যাচ্ছে, তার মাথার চুলগুলিতে আলো প'ড়ে সেগুলি চক্‌চক্ করছে। পরিশ্রমে তার গ্রীবার পাশে, কাঁধের উপরে, গলায় রক্তের আভা দেখা দিয়েছে। রাজুর মনে হ'লো, মেয়েটি যেন আগুনের মতো জ্বলছে।

চূড়ায় উঠে গাছ-দুটির ছায়ায় তারা বসতে পারলো না। গাছের তলায় একটা কাঁটালতা বহুপুরুষ ধ'রে বংশবিস্তার করেছে; জীবন্ত পুরুষটি যেমন সবুজ ও মসৃণ, মৃত পুরুষগুলির কঙ্কাল তেমনি খরধার।

চূড়ার উল্টোদিক দিয়ে নেমে একটা পালিশ-করা বড়ো টালির টুকরো পেয়ে কেট ব'সে পড়লো, জুতো খুললো।

রাজু চূড়ার গা বেয়ে নেমে গেল কয়েক পা। খানিকটা জায়গা পরিচ্ছন্ন ঘাসে ভরা, ফাটলহীন মসৃণ। সেই ঢালু জায়গাটায় ব'সে ক্রমশ লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো রাজু।

কেট বললো, 'আমার গা শিরশির করছে। গড়িয়ে প'ড়ে যাবেন। আপনি বরং এখানে আসুন। সূর্যের তাপ চূড়া পার হ'য়ে আসতে দেরি আছে।'

রাজু মুখ না ঘুরিয়ে বললো, 'তুমি আজ একটা ঝগড়া না-ক'রে বাড়ি ফিরবে না। কাছাকাছি ব'সে প্রকৃত ঝগড়া হয় না।'

কিছুক্ষণ কেট চুপ ক'রে ব'সে রইলো, তারপর বললো, 'রাজকুমার,

সুস্থ স্বাভাবিক হ'য়ে জীবন কাটাতে চাওয়াকে কি আপনি ঝগড়া বলেন ?'

'তা বলি না, গেছো মেয়ে বলি, কখনো এক-বগ্‌গা বউ বলি।' —ব'লে রাজু হাসলো।

কথা থেমে গেল। রাজু বললো একটু পরে, 'কেট, তোমার একটু কষ্ট আছে। এ শুধু ভিক্টোরিয়া-আমলের শাসনের বিরুদ্ধে নয়, এ-বিদ্রোহ এমন একটির বিরুদ্ধে যার কাছে তুমি অসহায়। নতুবা নিজেকে ছিন্ন বিধ্বস্ত করার সাধ কারও হয় না।'

কথাটা ব'লে খানিকটা সময় উত্তরের প্রতীক্ষা করলো রাজু, তারপর মনে হ'লো কেটের চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রাজু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিচের দিকে চেয়ে রইলো।

সূর্য চূড়া ডিঙিয়ে এপারে আসতেই রাজু বললো, 'চলো কেট, ফিরি।'

কেটও উঠে দাঁড়ালো। তার মুখে কথা নেই। ঢালু দিয়ে ওঠার চাইতে নামা কঠিন। একবার কেটের পা একটু হড়্‌কে গেল। রাজু কেটের হাত ধরলো। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো, কেটের মুখখানা যেন অনেকটা স্নিগ্ধ হয়েছে।

রাজু বললে, 'কিছুই তো দেখা হ'লো না।'

'হয়েছে, হয়েছে ; সে আপনি বুঝবেন না।'

খুশি হ'য়ে রাজু বললো, 'হ'লেই হ'লো। একদিন তোমাকে টাইগার দেখাবো। পিয়েত্রো একটু সেরে উঠুক! হাতির সামনে দিয়ে তীরের গতিতে হরিণ ছুটে পালাবে। ঘাস-বনের থেকে হলুদ মখমলে মোড়া একটা কামানের গোলার মতো সত্যিকারের টাইগার তোমার দিকে ছুটে আসবে।'

কেট শিউরে উঠে রাজুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

সহসা রাজু বললো, 'আরে পালকি যে, মানুষ দেখছি। এ-পথে মানুষ এলো কি ক'রে?'

'আসুক না, ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি কিছু নয়। ওরা এ-যুগের লোক তো? অতীতকালের কেউ না হয়।'

কেট হেসে বললো, 'পেগানদের খুব ভূতের ভয় থাকে, তাই নয়? কিন্তু ওরা ভবিষ্যতের লোকও হতে পারে।'

রাজু হা-হা ক'রে হেসে উঠলো।

আর কিছুদূর নেমে কেটের পরিত্যক্ত জ্যাকেটটার কাছে এসে রাজু সেটা নিচু হ'য়ে কুড়িয়ে নিলো।

কেট বললো, 'রাজকুমার বড়ো কৃপণ।'

পালকিবাহকদের রব কানে এলো। রাজু বললো, 'কেট, ওরা যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলে তুমি উত্তর দিয়ো।'

কয়েক পা যেতেই ওদের দেখে পালকিবাহকরা থেমে গেল। বন্দুকধারী একজন বরকন্দাজ ছুটে এল। পালকির খোলা দরজা দিয়ে একজন মুখ বাড়ালো। সে যে চূড়ান্তরূপে বিস্মিত এবং খানিকটা মুগ্ধ হয়েছে তা বোঝা গেল।

পালকির ভেতরের লোকটি বললো, 'সরি টু ডিস্‌টার্ব্ ইউ। বাট্ ক্যান্ আই স্পিক টু ইউ?'

'ইয়েস্, ইউ ক্যান্। উইল নট্ মেণ্ট্ ইন্‌টু থিন্ এয়ার।' কেট হাসলে।

তখন লোকটি বললো, 'আমি রাজার গড়ে যেতে চেয়েছিলাম। এক ভদ্রলোক এই পথটি দেখিয়ে দিলেন। আধ-ঘণ্টা ধ'রে চ'লেও বন শেষ হ'লো না। আমরা কি ভুল পথে যাচ্ছি?'

'না, এইটেই রাজার গড়। আপনি কি অতীত কাল থেকে হঠাৎ

এ-যুগে এসে পড়েছেন ? অতীত কালের কোনো রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যাচ্ছিলেন ?'

'না ম্যাডাম, আমি বর্তমানের, আমি বর্তমানের রানীসাহেবার কাছে যাচ্ছি।'

'তা হ'লে এটা ভুল পথ। বর্তমানে রাজার গড় নেই, রাজবাড়ি আছে।'

'ফিরে যেতে বলেন ?'

'না, সিধে চ'লে যান, বনের শেষ পাবেন।'

আরোহীর ইঙ্গিতে পালকি হৈ-হৈ ক'রে ছুটে চললো প্রাণপণ ক'রে। বলা বাহুল্য, কেটের সঙ্গে ভদ্রলোকটির কথা ইংরেজিতে হয়েছিলো।

পালকি এগিয়ে যেতে রাজু হোহো ক'রে হেসে উঠলো।

'আঃ, ও কী ?'

'আমি কি অসভ্যের মতো হাসলাম ?'

'না, না, দেবতার মতো। কিন্তু ও-লোকটি আমাদের কী ভাবলো কে জানে !'

কেট ইতিমধ্যে রাজুর কোট কুড়িয়ে নিয়ে বগলদাবা করেছিলো। আর কিছুদূর গিয়ে টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় দিলো রাজু। জ্যাকেটটা কেটের হাতে দিয়ে বললো, 'এবার জামাটা পরো।'

কেট জ্যাকেট পরতে-পরতে বললো, 'হ্যাঁ, অনেক বিদ্রোহ হয়েছে।'

'তুমি খুশি হয়েছো, কেট ?'

'আজকের এই ক্লান্তিটার মতো সুখ আমি কোনোদিনই আর পাই নি।'

বাগচীর বাড়ির দরজায় কেটকে নামিয়ে দিয়ে রাজু ডাকলো, 'মাস্টারমশাই।'

বাগচী বেরিয়ে এলে রাজু বললো, 'এবার যাও কেট, ধীরেসুস্থে রান্না-বান্না করো। আমি গিয়ে দেখি পালকিওয়ালা রাজবাড়িতে কি করছে।'

সেই দৃশ্যটা মনে ক'রে কেট খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো।

সদরে নেমে বাড়ির দিকে যেতে-যেতে রাজু দেখে একটু আশ্চর্য হ'লো, পালকিদার লোকটি কাছারির বারান্দায় একটা চেয়ার চেপে ব'সে আছে এবং দেওয়ান তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে ব'সে তার সঙ্গে আলাপ করছে। রাজুর কাঁধের উপরে কোট, তার শার্টের আস্তিন গুটোনো। জামা-প্যান্টে শুকনো ঘাসের টুকরো এখানে-ওখানে লেগে আছে। রাজু লম্বা-লম্বা পা ফেলে কাছারির চত্বর পার হ'য়ে গেল।

লোকটি হাঁ ক'রে তার দিকে চেয়ে রইলো।

॥ সাতাশ ॥

'আমার মনে হয় কি জানো, নয়ন, এ-ব্যাপারটায় এত হাল্কা একটা মনোভাব যে, তাকে ধরা যায় না, অথচ তা থেকে ধারাবর্ষণ হয়, বিদ্যুদ্দাম-উদ্ভাসিত একখানি মেঘ। কেট বাগচীকে ভালোবাসে, অত্যন্ত উষ্ণ সে-ভালোবাসা। কিন্তু নিজেদের চিরাচরিত জীবনযাত্রায় সে হাঁপিয়ে উঠেছে, এবং তা' বোধ হয় তোমাকে দেখে।'

'রাজু, তোমার কথায়-কথায় কেট ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে হাঁপিয়ে উঠবে কেন? আমরা জানি না, হয়তো এর মূলে তার বিচিত্র জীবনের কোনো গভীর ব্যথা আছে।'

'তোমাকেও তো গল্পটা বলেছে কেটৃ। তোমার কি মনে হয় ওই গল্পটি কেটের আত্মজীবনী থেকে?'

'আমার সন্দেহ হয়, সেই মহিলার পরিত্যক্তা মেয়েটি কেট নিজে। ডান্‌কান যে কলঙ্ক রটনা করেছে তার চাইতে বহুগুণ বেশি গভীর কলঙ্ক ও নিজের পরিবারে দেখতে পেয়ে এত কষ্ট পায়।'

'বাগচী কি এ-সব জানে না?'

'খুব সম্ভব জানে। জেনে ক্ষমা করেছে, সেজন্যই হয়তো বিদ্রোহ কেটের। যদি ক্ষমা না করতো, যদি ঘৃণা করতো, তা হ'লে হয়তো কেটের নিজের মনোভাবের মতো হ'তো ব্যাপারটা।'

একটা ছোটো দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো রাজুর। নয়নতারার কাছে যে-কথা বলতে সে এসেছিলো তা বলার আগেই কেটের কথা উঠে পড়েছিলো। কথাটা সঙ্গোপনে উত্থাপন করেছিলো নয়নতারা। কিছুদিন হ'লো তার চোখে অন্তত রাজুর মুখখানি ক্লিষ্ট ব'লে মনে হয়েছে। কেটের কথায় রাজু সুখী হবে ভেবেছিলো সে।

রাজু বললো, 'আমার কি মনে হয় জানো নয়ন, সেই পাদরি যদি

কেটের বাবা হ'য়ে থাকেন তবে এ-কথা নিশ্চিত যে সে-ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসতেন না।'

নয়নতারা সেলাই করতে লাগলো। একটা সূক্ষ্ম গরদের পাঞ্জাবির পুট ও আস্তিনের সংযোগের সেলাইটার কাছে একটা সূক্ষ্ম লেস বুনছে ঘর গুনে-গুনে। সহসা সে কথা বললো না।

রাজু বললো, 'এখানে এসে আমাদের সমাজের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ পেয়েই কেট ওদের সমাজকে ওজন করতে পেরেছে।'

'তা না হ'লেও হ'তে পারতো। এমন ক্ষোভ মানুষের মনে হয়। যে গভীর পরিতাপের ব্যাপার সেই গল্পটায় ছিলো সেটা ছাড়াও এমন ক্ষোভ হ'তে পারতো। ওদের সমাজে স্বামীপরিত্যক্ত স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। আমার মনে হয় সেটার জন্য কেট আদৌ দুঃখিত নয়, তার জন্য সে নিজের মাকে কলঙ্কিত মনে করে না। মায়ের স্নেহ না পাবার বেদনা আছে ওর মনে। ওর জীবনের উপরে অভিমান বোধ হয় সেইখানে।'

সন্ধ্যার আলো জ্বাললো নয়নতারা। অকালের বর্ষাটা আজ ধরবে ব'লে মনে হয় না। রাজু এদিকে আসবার কিছু পরেই শুরু হয়েছে।

নয়নতারা বললো, 'আজ আহারাদি কি এখানে হ'তে পারে?'

রাজু ভাবছিলো। নয়নতারার কথা সে খেয়াল করলো না। একটু পরে সে বললো, 'ভারী কৌতুকের ব্যাপার, নয়ন। আসলে কেটের বিদ্রোহ সম্ভবত কোনো বিশেষ ঘটনা থেকে নয়। ওদের দেশের এ-যুগের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, নীতি এ সব মিলিয়ে যা, সেটাকে সে সবসময়ে সহ্য করতে পারছে না। আমরা নানা উপায়ে য়ুরোপের সমাজব্যবস্থাকে নিতে যাচ্ছি, কিন্তু সেটার পরেও ক্ষোভের কারণ থাকবে দেখছি।'

'তা থাক্, তুমি কী বলতে এসেছিলে রাজকুমার?'

'সে ভালো নয়, শুনে তোমার কষ্ট হবে।'

নয়ন হেসে বললো, 'রাজবাড়িতে কলকাতা থেকে লোক এসেছিলো?'

'সে-খবরও রাখো দেখছি। তা নয়।' রাজু একটু-সময় ইতস্তত করলো, তারপর হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বললো, 'তোমাকে কথাটা বলবো ভেবেছি অনেক-দিন, বলতে পারি নি। কিছুদিন আগে স্বাধীন রাজা হওয়ার দুঃস্বপ্নের কথা আমরা বলেছিলাম, মনে আছে? তেমনি একটা ব্যাপার ঘ'টে গেছে।' —এই ব'লে রাজু আলি খাঁর বিদ্রোহের কথা নয়নতারাকে বললো।

স্তব্ধ হ'য়ে শুনে নয়নতারা বললো, 'এখনো কি বিদ্রোহ চলছে?'

'প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। ইংরেজরা এখন প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছে। সম্ভবত শত্রুকে তারা ক্ষমা করছে না।'

নয়নতারার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো, 'আমাদের লোকগুলোর কী হ'লো রাজকুমার?'

রাজু বললো, 'এ-কথা প্রকাশ্যে বলার মতো নয়। পিয়েত্রো জানে আর আমি।'

নয়নতারা ভয় পেয়ে বললো, 'তবে থাক্, বোলো না।'

'তোমাকে বলবো নয়ন, তারা একান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। একজন-মাত্র বরকন্দাজ ফিরে এসেছে। চোরের মতো পিয়েত্রোর কুঠিতে লুকিয়ে আছে। গোবর্ধন নেই। আলি খাঁ নেই। তার বরকন্দাজরা নেই।'

নয়নতারার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

যেন অচেনা অজানা লোকের একটি মৃত্যু-ঘটনা বর্ণনা করছে এমন উদাসভাবে রাজু বললো, 'প্রথম আক্রমণেই গোবর্ধনের বুকে গুলি লেগেছিলো। কিন্তু আলি খাঁর মৃত্যু আরও দুঃখের। অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। শুনতে-শুনতে মনে হয়েছিলো, এমন একটি বীর যোদ্ধার এমন হীন মৃত্যু হ'লো কেন?'

'কি হয়েছিলো রাজকুমার?'

'বনের পথে যেতে-যেতে সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে। আমি বর্ণনা করতে পারি না, নয়ন, বনের ভেতরে তার কী দুর্জয় সাহস একদিন দেখবার সুযোগ হয়েছিলো আমার।'

দুঃখ করার মতো কিংবা প্রবোধ দেওয়ার মতো ভাষা সহসা নয়নতারা খুঁজে পেলো না।

রাজু আবার বললো, 'কিন্তু এ-আঘাত বোধ হয় সব চাইতে বেশি লেগেছে পিয়েত্রোর। হঠাৎ যেন পিয়েত্রোকে কেউ নিভিয়ে দিয়েছে। শোকের সঙ্গে যেন আশাভঙ্গেরও কারণ ঘটেছে তার।'

নয়নতারা বললো, 'রাজকুমার, পিয়েত্রোকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয়।'

দুঃখে ও হতাশাতেও মানুষ হাসে। তেমনি হেসে রাজু বললো, 'আচ্ছা, নয়ন, পিয়েত্রো কি স্বপ্ন দেখতো? সেই স্বপ্ন সফল করার সুযোগ এল এমন সময়ে যখন বার্ধক্য ও রোগে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে আর সে পারে না।'

'আমি তাঁকে চিনি না। তোমার নানা কথায় তাঁর যে শান্ত আত্ম-সমাহিত রূপটি কল্পনা ক'রে নিয়েছি—তার সঙ্গে এ-স্বপ্ন যেন মেলে না।'

'তাদের শিকার, তাদের দুঃসাহসিক খেলাধুলোয় যেন একটি গভীরতর সার্থকতার ইঙ্গিত আছে। আমার এখন মনে হচ্ছে, নয়ন, কলঙ্ক ও রাজদণ্ড থেকে তারা আমাকে শুধু ভালোবেসে আড়াল করে নি, একটা বিশিষ্ট পরিকল্পনাও ছিলো তাদের।'

রাজু মনের অস্থিরতায় ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলো। এক-সময়ে থেমে সে বললো, 'এ যেন একটা কাচের কিংবা অভ্রের তৈরি মিনার খান্‌খান্‌ হ'য়ে ভেঙে গেল।'

খানিকটা সময় পরে নয়নতারা বললো, 'রাজু, কাউকে দিয়ে রূপচাঁদকে খবর দেবো পালকি নিয়ে আসতে? পথে কাদা হ'য়ে গেছে।'

'না, থাক্।' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাজু বললো, 'সব চাইতে কৌতুকের হবে যদি সত্যি-সত্যি আমাদের দিক থেকে দেওয়ান ইংরেজকে টাকা দিয়ে এই ব্যাপারে সাহায্য ক'রে থাকে।'

'এ-রকম কথাও আছে নাকি ?'

'একদিন মোটা একটা টাকার অঙ্কে ওরা মায়ের সই নিয়েছে, ডান্‌কান ও হরদয়াল দু-জনে পরামর্শ ক'রে।'

রাজু চ'লে গেল।

সেদিনটা তখনো শেষ হয় নি। রাজু বাড়ি ফিরে দেখলো, কলকাতা থেকে নৌকো ফিরেছে। অনেক জিনিস এসেছে কলকাতা থেকে। কাগজে আর খড়ে মোড়া বড়ো-বড়ো কাচের ঝাড় ও ডোম খুলছে কতকগুলি লোক কাছারির বারান্দায় ব'সে। রাজু তার ঘরে ঢুকে এটাই প্রত্যাশা করেছিলো— একটা কাঠের বড়ো বাক্সের কাছে রূপচাঁদ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। পাহারা দেওয়ার দরকারের চাইতে পাহারার কায়দাটা দর্শনীয়।

'কি রে ?'

'হুজুর, দেওয়ানজি বললেন, খবরদার, রাজকুমারের শখের জিনিস !'

'আচ্ছা, তুই এখন বিশ্রাম কর গে।'

রূপচাঁদ চ'লে গেলে কাঠের বাক্সটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলো রাজু। পিয়েত্রোর চিঠির ফলেই সম্ভব হ'লো। পিয়েত্রোর নিজেরটির চাইতে ছোটো; তা হ'লেও যে কিনেছে সে পিয়েত্রোর নিজের লোক, আধুনিক খেলো জিনিস হবে না।

অনুরূপ আনন্দ দেওয়ান হরদয়ালেরও হয়েছিলো। কলকাতা-ফেরত কর্মচারীটি তার নিজের বাক্সে পুরে এনেছে। এ-সময়ে এ পাওয়া যাবে

কে কল্পনা করতে পেরেছে ? যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে এ পাওয়া যায়, এ-আশা সত্যি করে নি হরদয়াল। বাদামি রঙের কাগজে মোড়া প্যাকেট খুলে হলুদ রঙের কতগুলি পত্রিকা পেলো সে, আর একখানা ঝকঝকে বাঁধানো বই। পত্রিকাগুলি পুরনো। তা হোক, নতুন এদেশে কি ক'রে পাওয়া যাবে ! তবু ভালো, কামান-বন্দুকের জাহাজে এখনো এমন বই আসছে। স্পেক্টেটর কাগজ। উত্তেজিত হ'য়ে দেওয়ান গড়গড়ার নলে ঘন-ঘন টান দিতে লাগলো। বইটির কথা সে লিখে দেয় নি। দোকানদার নিজে থেকেই দিয়েছে। কবিতার বই। হরদয়াল বইটির মলাটে লেখা কবির নামটা পড়লো। নামটা তার অজানা। ব্রাউনিং। হবে হয়তো কোনো-এক অল্পখ্যাত কবির লেখা। তা মন্দ নয়, ভাবলো সে। অল্প-খ্যাত কবিদের লেখায় সাহিত্যের হালের ঝোঁকটা কোনদিকে বোঝা যায়।

হরদয়াল আসন ত্যাগ ক'রে বই ও কাগজগুলি নিয়ে তার ছোটো লাইব্রেরিটাতে উপস্থিত হ'লো। আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে, কাগজগুলি টেবিলে রেখে, কবিতার বইটি নিয়ে শেল্‌ফের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চারিদিকে ঘুরে একটির দ্বিতীয় তাক-এ খানিকটা জায়গা পেলো। ধুলো পড়েছে নাকি ? কোঁচার খুঁট তুলে জায়গাটা ঝেড়ে নিয়ে কবিতার বইটি রাখলো।

হরদয়াল ফিরে এলে বাবুর্চি এসে বললো, 'রসুই কি হবে হুজুর ?'

'হালকা কিছু করো।'

আরামকেদারায় গা ঢেলে দিয়ে গড়গড়ার নলে মুখ রেখে হরদয়াল ভাবতে লাগলো। তার চিন্তাটা মোটামুটি পর্যায়ক্রম-অনুসারে এইরকম ছিলো :

স্কুলগুলি আবাসিক করার একটি মস্ত সুফল চরিত্রগঠন। স্কুলের

আদর্শ ও বাড়ির আদর্শ অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী হয়। তার ফলে অন্তর শিক্ষাটাকে গ্রহণ করে না। স্কুলে যখন আসে তখন স্কুলের মতো কথা বলে, বাড়িতে যখন বাড়ির মতো। স্কুলে ব'সে নিরীশ্বরবাদের কথা চিন্তা করলো, বাড়ি ফিরে মায়ের কথায় নামাবলি গায়ে নারায়ণের শয়ানের ব্যবস্থা করলো, এ-রকম হচ্ছে। তা ছাড়া সব বাপ-মা'ই ছেলেকে মানুষ করার মতো উঁচু-মনের নয়। তাদের ছোটো-ছোটো হিংসা-দ্বেষের উদাহরণগুলি শিশুকে বিপথে নেয়। ফলে কাজ হয় না। ওদিকে ছেলেরা অভিনয় করতে শেখে। মনে-মনে যে পরের জন্য একটুও ভাবে না সে-ও হল্-ঘরে উপাসনার সময়ে হাতজোড় ক'রে অসুস্থ সঙ্গীর জন্য প্রার্থনা করে।

কিন্তু এত বড়ো বাংলা দেশ। আবাসিক স্কুলে কয়টি ছাত্রকে মানুষ করা যাবে? আকাশ-জোড়া অন্ধকারে জোনাকির আলো!

আসল কথা, ভালো মন্দ মিলে মানুষের জীবন। খানিকটা ভালোয় আর খানিকটা মন্দ না মিশলে নিখাদ মানুষ নিয়ে সংসার চলে না। তাদের ভেতরে রস নেই। হয় তারা শুকনো পাথর, নয় নির্বোধ। কাছারির আমলাদের মধ্যে সোনাউল্লার কথা মনে হ'লো। লোকটার দুষ্টুমির শেষ নেই, তবু মধুর রসাল লোকটি। সকলে তাকে ভালোবাসে। সত্যিকারের ক্ষতি সে কারও করে না, কিন্তু খোঁচাখুঁচি করতে ওস্তাদ। হরদয়াল চেয়ারে শুয়ে এমনি সব পুরনো কথা নিজের ক'রে চিন্তা করতে লাগলো। এই দেখ, আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি। হরদয়াল ভৃত্যকে ডাকলো।

'তুই একবার কলকাতা থেকে যে-বাবুটি ফিরেছে তার বাড়িতে যা তো। জিগ্যেস ক'রে আয়, নতুন মাস্টারমশাই-এর কী হ'লো? এ-মাসের মধ্যে কারও আসার সম্ভাবনা হয়েছে কিনা।'

ভৃত্য চ'লে গেলে হরদয়াল স্থির করলো, সদরে খোঁজ করতে হবে কেউ আসে কিনা। কিন্তু সদরের কথায় হরদয়ালের মনে পড়লো, কলকাতার বন্ধুর চিঠি। এ-দেশের সিপাহীরা যেমন ইংরেজ মেরেছিলো, এখন তেমনি ইংরেজরা সিপাই বধ করছে। বিপদোদ্ধারের আনন্দে কালীঘাটে পুজো দিচ্ছে সাহেবরা। এর পর জেলার সদরে-সদরে আনন্দোৎসব হবে। সমাজ-জীবনের একটা আবিলতা দূর হ'লো ব'লে ক্ষণিক আনন্দ বোধ হ'লেও সমগ্র ব্যাপারটাই কুৎসিত। মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করলো হরদয়াল। সিপাহীরা পর্যুদস্ত হয়েছে ব'লে বন্ধু আনন্দিত। সেটাও ভালো নয়।

রাত তখন অনেক হয়েছে। দেওয়ান-ভবন নয় শুধু, রাজবাড়ির সর্বত্রও প্রায় নিস্তব্ধ হ'য়ে এসেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কোথায় যেন একটি-দুটি ভেক মক্‌মক্ করছে। দেওয়ান তার শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলো।

'দেওয়ান!'

হরদয়াল ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলো। রানীর গলা; বিছানার চাদরটা টেনে গায়ে দিয়ে হরদয়াল এগিয়ে বললো, 'কিছু বিপদ হয়েছে রানিমা?'

'না।' রানী হাসলেন। 'ব্যস্ত হবার কিছু নয়। রাজুর বিয়ের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার।'

হরদয়াল চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, 'বসুন। এত রাতে কিনা, তাই বললাম।'

'রাজুর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যে-লোকটি এসেছিলো এখন দেখছি সে মেয়ের কাকা। তুমি শুনলে অবাক হবে, লোকটি উচ্চশিক্ষিত এবং একজন অধ্যাপক।'

'টোলের ?'

'না, কলকাতার কাছে কোন কলেজের।'

'তা হ'লে একেবারে অকরণীয় ঘর নয়।'

'এই চিঠিটা পড়ো। এটা আমাকে লিখেছে, কিন্তু তোমার পড়া দরকার।'

'আপনার চিঠি আমি পড়বো ?'

'তোমাকে আমি পড়তে দিচ্ছি।'

হরদয়াল চিঠি পড়তে-পড়তে ভ্রূ কুঞ্চিত করলো। সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে তা বোঝা গেল।

সে বললে, 'যদি অনুমতি করেন এর যথোচিত জবাব আমি দিয়ে দেবো।'

'যে লিখেছে সে আমার ভগ্নীস্থানীয়া।'

'তা হ'লে আমার কিছু বক্তব্য নেই, নতুবা লেখক বা লেখিকার রুচি সম্বন্ধে আমার মত ভালো নয়।'

'কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারো রাজু কেটের সঙ্গে অত্যন্ত বেশি মেলামেশা করছে আজকাল ? তারা প্রকাশ্য পথে রাজবাড়ির হাতিতে একসঙ্গে যাওয়া-আসা করেছে ?'

'অত্যন্ত বেশি কিনা জানি না। তবে রাজকুমারের এবং কেটের পরিচয় আছে। কে কাকে শিখিয়েছেন জানি না, কিন্তু এর মধ্যে পিয়ানো শেখার ব্যাপার আছে।'

'মেয়ের কাকা তাদের গড়ের জঙ্গলে একা-একা বেড়াতে দেখে গেছে।'

'রানিমা, একে কি আপনি কুৎসিত ব'লে মনে করেন ? আমি তো বুঝতে পারি না।'

'হরদয়াল, কাকে কুৎসিত বলে সে-আলোচনা আমি করতে আসি নি। তুমি কি জানো কেট তাদের নিজের সমাজে অচল ব'লেই বাগচীর ঘরে এসেছে?'

'শুনেছি ডান্‌কান এ-রকম একটা কী রটিয়ে বেড়ায় বটে।'

'সেটা কি মিথ্যা?'

'না, ডান্‌কানের জানা থাকলে ওর চাইতেও বেশি রটনা করার অবকাশ ছিলো। যথা, কেটের মা গৃহত্যাগ ক'রে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন।'

'ছি-ছি, এ তুমি জানো?'

'কিন্তু তার সঙ্গে এ-বিবাহের কী সম্বন্ধ? মেয়ের বাপেরবাড়ি শুনছি উচ্চশিক্ষিত—'

'আছে বৈকি? উচ্চশিক্ষিত হ'লেই সকলে সমাজত্যাগী হয় না। আমি শুনতে পাচ্ছি তোমার স্কুলে উপাসনার মন্দিরও হয়েছে।'

'ঈশ্বরের প্রার্থনা খারাপ নয়, রানিমা।'

'কিন্তু পদ্ধতি নিয়ে বহুপ্রকার বাদানুবাদ হয়েছে, অনেক যুদ্ধ হয়েছে, এ-ও তোমার অজানা নেই। তোমার উপাসনা-মন্দিরের মতো কলকাতাতেও অনেক উপাসনা-মন্দির হয়েছে।— তুমি তা হ'লে চিঠিতে লিখিত অভিযোগগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছো না?'

'ওগুলো তো ঠিক অভিযোগ নয়; এ-পক্ষকে নিন্দা করা হয়েছে। তা ছাড়া স্কুলের উপাসনা-মন্দির ও কলকাতার ব্রাহ্মমন্দিরগুলি এক নয়। কিন্তু এর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হলেন কেন রানিমা? যদিও আমি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নই, সে-মেয়ের বিবাহ-উপযুক্ত বয়েস হয়েছে কিনা আমি জানি না, তথাপি এ-বিবাহেই যদি আপনার মত হ'য়ে থাকে, আপনি হুকুম করুন, এ-বিবাহ আমি ঘটিয়ে দেবো।'

'কিন্তু সেজন্য আমি আসি নি। আমি চাই না, বাগচী বা কেউ রাজবাড়ির কারও সঙ্গে কোনো ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকে। তারা কি এ-গ্রাম ত্যাগ করতে পারে না?'

'স্কুল ভেঙে যাবে। বাগচীর মতো মাস্টার কোথায় পাবো? সে তো কারও অপকার করে নি।'

'তুমি আর-একবার ভেবে ছাখো। এটা আমি তোমাকে করতে বাধ্য করেছি তা লোকে জানুক এ আমি চাই নি ব'লেই এত গোপনে এসেছি। তোমাকে হীনমান করা আমার ইচ্ছা নয়।'

'কিন্তু তা আমি কি ক'রে করবো? এ কি কখনো সম্ভব? বিনা দোষে তাদের তাড়িয়ে দেবো? এ তো অন্যায়।'

'তোমাকে আরও চিন্তা করার সময় দিতে আমি প্রস্তুত আছি।'

'চিন্তা করার সময় পেলে এ-প্রস্তাবকে আমার আরও অন্যায় ব'লে মনে হবে। বাগচীমাস্টার ও তার স্ত্রী এমন কিছুই করে নি যাকে অন্যায় বলা চলে।'

'তারা অন্যায় করেছে এ আমার বক্তব্য নয়, তারা রাজবাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এ আমি চাই না।'

হরদয়ালের ডান-হাতের নখগুলো তার বাঁ-হাতের তেলোয় কেটে বসার মতো হ'লো। সে বললো, 'তাই বা কী ক'রে জড়াবে?'

'তুমি বোধ হয় জানো না, তুমি যা-কিছু করো সাধারণ প্রজা সেটাকে রাজবাড়ির মোহর সংযুক্ত ব'লে মনে করে।'

'সেটা তাদের দোষ।'

'হ'তে পারে। কিন্তু তারা তা মনে করে আমি চাই না। এ যদি তোমার শেষ কথা হয়—'

'শেষ কথা নয় রানিমা, কিন্তু এই আমার মত।'

রানী একটু থামলেন। তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুচ্চ গলায় বললেন, 'তোমাকে বরখাস্ত করা হ'লো।'

'রানিমা!'

রানী ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছেন; হরদয়াল তাঁর পাশে গিয়ে বললো, 'রানী, আমার স্কুল!'

'তোমাকে গ্রাম থেকে তাড়ানো হয় নি। সাধারণ প্রজার মতো তোমার স্কুল সম্বন্ধে যা বলার আছে পেশ কোরো।'

হরদয়ালের ঘরের লণ্ঠনটি ফট্‌ফট্‌ ক'রে শব্দ করছে। হরদয়াল ফিরে এসে আলোটি নিভিয়ে দিলো। টেবিলে জল ঢাকা ছিলো, জল খেলো হরদয়াল। অপমান ও বেদনায় তার কান্নার মতো একটু অনুভব হ'তে লাগলো। তার ব্যক্তিগত দাস-দাসী, চাকর-বাবুর্চি, এরা কাল সকালে কি করবে এটাই যেন তার সব চাইতে পীড়াদায়ক চিন্তা হ'লো।

খবরটা রাষ্ট্র হয় নি। দেওয়ানের খাস-কামরায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে, দেওয়ান তার ভবন থেকে বার হয় না। আমলারা এটুকুই জেনেছে। সদর-নায়েব কতকগুলি কাগজে সই করাতে গিয়েছিলো। দেওয়ান বলেছে, 'রাজকুমারের বয়স হয়েছে, তাঁর সই নিন।'

হরদয়াল জানে, নতুন দেওয়ান নিযুক্ত হবার আগেই এ-ভবন তাকে ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু এত জঞ্জাল সে জমিয়েছে এ ক'বছরে তা সে নিজেও ভাবতে পারে নি। আর বেশির ভাগই রানীর দেওয়া। মাইনের টাকা থেকে কেনা জিনিস খুব বেশি নয়। হরদয়ালের আর-একটি সমস্যা হয়েছে, পদচ্যুতির পর এই উপহারগুলির ব্যবহার সে করতে পারে কিনা, না এগুলিও নতুন দেওয়ানের জন্যই রেখে দেওয়া উচিত।

টাকার প্রয়োজনে বাগচী এসেছিলো। এ-টাকাটা প্রথা অনুসারে

ও রানীর হুকুমে কাছারি থেকেই নেওয়া যায়। হরদয়ালের কামরা তালাবন্ধ দেখে বাগচী তার ভবনে এসেছিলো। হরদয়াল তাকে রানীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ফিরতি-পথে বাগচী এল।

'টাকা পেয়েছেন ?'

'পেয়েছি।'

'আপনার শরীর ভালো ?'

'ভালোই আছি।'

হরদয়াল সদর-নায়েবকে সদরে পাঠিয়েছে উকিল-বাড়িতে। শিলমোহর-করা খামে সে উকিলকে লিখেছে, তার নামে রাজকুমারের যে-আম-মোক্তারনামা আছে সেটা যেন নাকচ করার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর সব কাগজে রাজকুমার সই করবেন, যতদিন-না নতুন আমমোক্তার স্থির হয়।

হরদয়াল সদর-নায়েবকে বলবে ভেবেছিলো, পারে নি।

॥ আঠাশ ॥

দুপুরের পর রাজু ঘরে ব'সে পিয়ানো বাজাচ্ছিলো। সে-ও যেন ব্যাপারটায় সংকুচিত হ'য়ে পড়েছে। বাগচীদের সঙ্গেও দেখা করে নি। হরদয়াল পুরনো লোক ব'লেই নয়, রাজু তার নিজের অন্তরে যে-বিদ্বেষ অনুভব করছিলো হরদয়ালের প্রতি, তার পদচ্যুতি যেন তারই বহিঃপ্রকাশ। রাজুর দু-একবার মনে হয়েছে, একটি অস্পষ্ট দ্বন্দ্বে হরদয়ালকে এক অতিমানবীয় শক্তি মুহূর্তে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছে। রাজু নিজে যেন কোথায় খুশি হ'য়ে উঠেছিলো, এবং এ খুশি হওয়াটাই যেন তার কুণ্ঠারও কারণ। ভালোই হয়েছে, কিন্তু এর চাইতেও ভালো ছিলো যদি হরদয়ালের মতির পরিবর্তন হ'তো।

ঝিরঝিরে একটা ভিজে হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। আজও বর্ষা হ'তে পারে। এই অকালের বর্ষা কতদিন ভোগাবে কে জানে। কোনো-কোনো বছর পুজোর দিন কয়েকটিও এ-বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে যায়।

সহসা কয়েকটি দরজা-জানলা সশব্দে আঘাত ক'রে জোরে বাতাস এল। রাজকুমারের ঘরে উঠতে যে-বারান্দাটা, তার গায়ে বসানো লতার কতকগুলো শুকনো পাতা উড়ে পড়লো। রাজু উঠে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে যাবে এমন সময়ে নয়নতারা ঘরে ঢুকলো।

'সে কি, এ-সময়ে কি ব'লে বেরুলে বাড়ি থেকে? ঝড়-জল হ'তে পারে।' চমকিত আনন্দে রাজু ব'লে ফেললো।

'রানিমা ডেকেছিলেন পরামর্শ করতে।'

'পালকির কথা ব'লে দেবো?'

'না, পালকি ঠিক করাই আছে, চলি।'

রাজুকে কথার সুযোগ না দিয়ে নয়নতারা দরজা দিয়ে বেরুতে গেল

কিন্তু তখুনি পিছু হঠতে হ'লো তাকে চোখে-মুখে ধুলো-কুটো নিয়ে। বাতাসের ঝাপটাটা বেশ জোরেই এসেছিলো আবার।

দরজা বন্ধ ক'রে রাজু দেখলো, নয়নতারা চোখ ডলছে।

'কি হ'লো, এদিকে এসো দেখি।'

নয়নতারার চোখে ময়লা পড়েছিলো। তার আঁচল তুলে নিয়ে রাজু বের ক'রে দিলো। তার পরে বিস্মিত হ'লো।

অনবদ্যাঙ্গী নয়নতারার সর্বাঙ্গে অলংকার ঝলমল করছে। মাথায় সিঁথি, কোমরে চন্দ্রহার, কানে দুটি নীলাভ হীরা ঝল্‌সে উঠছে।

'এ কি বিস্ময়?' রাজু বললো।

'রানিমার উপহার। শুধু তাই নয়, তাঁর হুকুম।'

'আর কোথায় কে অজেয় আছে?'

দু-জনে বসা যায় এমন একটা সোফা জানলার ধারে টেনে নিয়ে রাজু বসলো। নয়নতারা পাশে বসলো, দু-জনে জানলা দিয়ে বাইরে চাইলো।

'আজ একটা ঝড় না হ'য়ে যায় না।' নয়নতারা বললো।

জানলা দিয়ে, সদরের সামনে দিয়ে যে-পথটা গেছে তার অনেকটা চোখে পড়ে। একজন অশ্বারোহী দূর থেকে সদরের দিকে এগোচ্ছে দেখতে পাওয়া গেল। ধুলোর ঝাপটায় তারও কষ্ট হচ্ছে। পাগড়ির ঝোলানো অংশটুকু দিয়ে মাঝে-মাঝে সে নিজের নাকমুখ ঢাকছে।

রাজু বললো, 'লোকটার সাহস আছে, ঘোড়া ধাপেই রেখেছে।'

লোকটি সদরের কাছেও থামলো না। কাছারির গাড়ি-বারান্দার নিচে ঘোড়াসুদ্ধ ঢুকে পড়লো।

রাজু নয়নতারাকে বললো, 'কি পরামর্শ হ'লো, বিয়ের?'

'শুধু তা নয়, গ্রামের কথাও হ'লো।'

রাজু পরিহাসের সুরে বললো, 'ইতিহাসে শুনেছি রানী ও সুলতানা পাওয়া যায়, মন্ত্রিণীর নাম শুনি নি।'

নয়নতারা ঝিকমিকিয়ে উঠলো, 'আমি কি করতে পারি যদি তোমার নূরজাঁহার কথা জানা না থাকে।'

হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন রানী— 'রাজু!'

নয়নতারা ও রাজু লজ্জিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো।

'রাজু, এইমাত্র একটি লোক এসেছিলো। বাগচী জানিয়েছে পিয়েত্রোর শেষ অবস্থা। হঠাৎ এ-রকম হ'লো, জানিস কিছু? তুই যাস নি বোধ হয় কিছুদিন? পিয়েত্রো নিজেই নাকি বলেছে রাজবাড়িতে একটা খবর দিতে।'

'আমার এখুনি একবার যাওয়া দরকার, মা।'

'যাবি? ঝড় উঠতে পারে।'

রানী চ'লে গেলেন। রাজু জানলা দিয়ে ডেকে বললো, 'রূপচাঁদ, হাতি। জয়নালকেই বল, ছুটতে হবে।'

গায়ে মেরজাইয়ের উপর চাদর জড়িয়ে রাজু বললো, 'নয়ন, তুমি যেন বেরিয়ো না। রূপচাঁদ আকাশের অবস্থাটা দেখে তোমাকে পৌঁছে দেবে।'

রাজু বেরিয়ে যেতে না যেতেই একজন দাসী এসে নয়নতারাকে বললো, 'রানিমা ডাকছেন।'

নিজের ঘরের মাঝখানে রানী দাঁড়িয়ে ছিলেন। নয়নতারা যেতেই বললেন, 'নয়নতারা, তোমার তো খুব সাহস আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে পালকিতে ক'রে পিয়েত্রোর বাড়ি যেতে পারো? অবশ্য ঝড় উঠবে এমন কোনো কথা নেই।'

নয়নতারা অত্যন্ত বিস্মিত হ'লো

পরদুঃখকাতরা রানীর চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ ক'রে অশ্রু ঝরতে লাগলো। নয়নতারা দেরি না ক'রে নিচে গিয়ে রূপচাঁদকেই পেলো। সে তখন রাজুকে হাতিতে তুলে দিয়ে ফিরছে।

নয়নতারা বললে, 'দু-জনে যাবার মতো পালকি চাই।'

'একটু দেরি হবে, মা।'

'যতটুকু হবার হবে, তার চাইতে বেশি না হয়।'

নয়নতারা ফিরে এসে রানীকে খবর দিলো, পালকি ডাকা হয়েছে।

আধ-ঘণ্টা পরে রানী ও নয়নতারাকে নিয়ে রাজবাড়ির সবচাইতে বড়ো পালকিটা পিয়েত্রোর আবাদের দিকে ছুটলো। ঝড় প্রচণ্ড হ'য়ে উঠলো না। কিন্তু ওরই মধ্যে একবার পালকি থামলো। একটা ছোটো গাছের শুকনো ডাল ভেঙে প'ড়ে সামনের একটি বেহারার কপালের চামড়া খানিকটা কেটে গেল। বৃষ্টিও পড়ছে।

॥ উনত্রিশ ॥

পিয়েত্রোর শোবার ঘরে বাগচী আর রাজু। দরজার কাছে পিয়েত্রোর খাটের পাশে অনেকগুলি চাকর-বরকন্দাজ। বাগচী তার বাক্স থেকে কি-একটা ওষুধ ঢালছে। তার হাত কাঁপছে, তার চোখ লাল। রাজু স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে খাটের পাশে।

পিয়েত্রোর লম্বা শাদা চুল বাবরির মতো বালিশের উপরে ছড়ানো। দাড়ির যত্ন আর হয় না, সেগুলো বেড়ে-বেড়ে বুক পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। সারা দেহ যেন নীলে রঙানো।

রানীর ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপলো। তিনি বললেন, 'নয়নতারা, খাটে গিয়ে বোসো। ওঁর কপালে একটু হাত রাখো। এ-সময়ে বোধ হয় মেয়েদের ছোঁয়ার চাইতে বড়ো স্নিগ্ধতা আর কিছুতেই দেয় না।'

নয়নতারা খাটের একপ্রান্তে ব'সে পিয়েত্রোর কপালে হাত রাখলো। পুরনো হাতির দাঁতের মতো, তেমনি ঠাণ্ডা কপাল। রানী শিয়রের দিকে খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পিয়েত্রো চোখ মেলে চাইলো। দৃষ্টিশক্তি তাতে অবশিষ্ট ছিলো কিনা কে জানে।

বাগচীডাক্তার দু-একবিন্দু জলে একবিন্দু ওষুধ মিশিয়ে পিয়েত্রোর ঈষৎমুক্ত ঠোঁট দুটির মাঝখানে দিলো। বোধ হয় সেটাকে গ্রহণ করার চেষ্টায় হাসির মতো কেঁপে উঠলো ঠোঁট। নিশ্বাসের প্রয়াসে পিয়েত্রোর সারা গা কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো, সহসা অস্ফুট একটা শব্দ হ'লো। বাগচী হুহু ক'রে কেঁদে ফেলে মাটিতে ব'সে পড়লো।

রাজু বোধ হয় এ-মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত নয়। সে ঝুঁকে প'ড়ে পিয়েত্রোকে দেখবার চেষ্টা করলো। রানী কম্পমান ঠোঁট দুটি দাঁতে চেপে ধ'রে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে নয়নতারা বেরিয়ে এসে দেখলো রানীর পালকি চ'লে গেছে। বারান্দার কাঠের রেলিং-এ একটু ভর দিয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন বোধ করলো নয়নতারা।

পদ্মার উপরে যে-আকাশটুকু তাতে মেঘ আছে। হাল্কা, মৃদু-সঞ্চরণশীল। দিন শেষ হ'য়ে আসছে, এই পশ্চাদপটের গায়ে মৌন গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কোনো জীবের মতো চোখে পড়ছে পিয়েত্রোর হাওয়াঘর। নয়নতারা অনুমানেই বুঝলো।

রাজুর মুখে শুনে-শুনে পিয়েত্রো-বুজরুকের সঙ্গে অতিবাহিত বহু দিনের ছোটো-বড়ো ঘটনার কথা তার জানা ছিলো, কিন্তু আজ সেগুলি যেন চোখের সম্মুখে ঘটছে, এমন স্পষ্ট হ'লো।

একটি মৃত্যু চোখের সম্মুখে ঘটতে দেখা যথেষ্ট দুঃখের। কিন্তু নয়নতারার যে-অনুভবটি হ'লো সেটা একটি শূন্যতার। গভীর একটি পূর্ব-অভ্যস্ত বিষণ্ণ পরিসমাপ্তি। নয়নতারা নিজে বুঝতে পারলো না, কিশোর বয়সে যাত্রাগানে ভীষ্মের শরশয্যার পর গভীর অনুভব হয়েছিলো তার। আজ এখানে দাঁড়িয়ে অর্ধ-জাগ্রত স্মৃতিতে তার মন আচ্ছন্ন হ'লো। সে অনুভব করলো, পিয়েত্রোর পক্ষই তার পক্ষ।

মৃত্যুর পরও মানুষের কর্তব্য থাকে।

বাগচী বললো, 'রাজকুমার, আপনি বাড়ি যান ওঁকে নিয়ে। আমি এখানে রইলাম। দাহ-ই হবে, কিন্তু খ্রীস্টানদের কতকগুলি আচার আছে, সেগুলিও পালন করা দরকার। যদি সম্ভব হয় দু-একজন লোক পাঠিয়ে দেবেন।'

মাহুতকে হাতি নিয়ে চ'লে যেতে ব'লে নয়নতারা ও রাজু হেঁটে চললো। অনেক দূর যাবার পর রাজু বললো, 'নয়ন, রাজবাড়ির বাইরে আমার এমন আপন আর কেউ ছিলো না।'

স্কুলবাড়িটার কাছে এলে পথে নামা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিটা থামলো। বাতাসটা প'ড়ে গেল। এ-দিকের মাটি অল্প বৃষ্টিতে পিছল হ'য়ে যায়। অবলম্বনের জন্য মাঝে-মাঝে নয়নতারাকে রাজুর হাত ধ'রে ফিরতে হ'লো।

তখনো সূর্য ডুবে যায় নি। আকাশভরা ছাই-নীল রঙের জলভরা মেঘ। একজাতীয় মেঘ চুঁইয়ে এলে যেমন কনে-দেখা আলো হয়, এ নীল মেঘ চুঁইয়ে তেমনি নীল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। স্কুলের হল্-ঘরটার কাচের জানলাগুলিতে সেই আলো এসে পড়েছে। শিসার তৈরি একটা অপ্রাকৃত প্রাসাদের মতো দেখাচ্ছে।

সুরকি-তৈরির লোহার চাকটা কাত হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে আছে। মনে হ'লো কে একজন তার উপরে ব'সে আছে, স্কুলের দিকেই মুখ। তবু ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

রাজু বললে, 'কে ওখানে?'

'আমি, হরদয়াল।' স্বপ্নোত্থিতের মতো লোকটি উঠে দাঁড়ালো।

রাজু ও নয়নতারা হাঁটতে লাগলো। রাজুর মনে হ'লো স্কুলটার সঙ্গেও পিয়েত্রোর যোগ আছে। তার মনে হ'তে লাগলো, পিয়েত্রো-বুজরুকের সঙ্গে-সঙ্গে একটা পর্ব শেষ হ'লো তার জীবনের।

একদল লোক আসছিলো। তাদের দলের আগে রূপচাঁদ। রাজু চিনতে পারলো রূপচাঁদের পাশে যাচ্ছে রাজপুরোহিতের ছেলে। পেছনে কয়েকটি লোক সৎকারের উপকরণ ব'য়ে চলেছে। আতর-চন্দনের গন্ধ পাওয়া গেল। রানীর ব্যবস্থা, বুঝতে পারলো রাজু।

ঝিঁঝিঁ ডাকছে। অকালের বৃষ্টি হ'লেও ভেকরা ঠিক খবর পেয়েছে, তারা পরম উল্লাসে কোলাহল করছে। একেবারে পথের উপরেও তাদের দেখা গেল, নয়নতারা ও রাজুকে তারা গ্রাহ্যই করলো না।

রাজবাড়ির হাতায় বিদেশী গাছটায় সব্জে হলুদ রঙের কচি পল্লব বৃষ্টি পেয়ে দুলছে।

সহসা রাজুর দৃষ্টি আবিল হ'য়ে অজস্র অশ্রু নেমে এল। কি-একটা বলার এবং সেটাকে গোপন করার চেষ্টায় তার ঠোঁট দুটি থরথর কেঁপে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।